লেটলতিফ পুজো ইস্পিশাল

২০১৭

একটি গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশনা

পুজো ইস্পিশাল ২০১৭

একটি গুরুচণ্ডা৯ প্রকাশনা

www.guruchandali.com

guruchandali@gmail.com

সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রচ্ছদ: দেবরাজ গোস্বামী

অক্ষরবিন্যাস ও অন্যান্য: টিমগুরু

সূচীতে লেখকের নামে ক্লিক করলে সেই পাতায় পৌঁছে যাবেন, আবার যে কোনো পাতার নীচে সূচীপত্রে ক্লিক করলে সূচীপত্রে ফিরে আসবেন।

আমাদের লেটলতিফ পুজো ইস্পিশাল

পৃথিবীতে বাঙালির সংখ্যা নাকি বিশ কোটির বেশি। কিন্তু ভাষাটা আছে বলেই মালুম হয়না। ইংরিজি ওয়েবসাইট, প্রথম দশটা ভাষার তালিকা বানাতে গিয়ে, 'অ্যাঁ এত লোক বাংলা বলে নাকি?' বলে আশ্চর্য হয়ে পড়ে। বাঙালির মারকাটারি খ্যাতনামারা টিভির পর্দায় 'বাটিয়া' (অর্থাৎ কিনা বাট ইয়াহ) দিয়ে বাক্য শুরু করে 'কেন কী' দিয়ে শেষ করেন। তেত্রিশটা মাল্টিপ্লেক্সে তিন সপ্তাহ চললেই বাংলা সিনেমা নাকি সুপারহিট হয়। বাঙালি প্রকাশক বছরে এক হাজার বই বিক্রি হলেই উদ্বাহু হয়ে লেখককে মিষ্টি খাওয়াতে দৌড়ন। বাংলা বইয়ের বাজার যেন ছোটো ছোটো দ্বীপ। কলকাতায় ছাপা বই কোনোক্রমে শিলিগুড়িতে দু-চার কপি পোঁছয়। ঢাকার বই এক আধখানা কলকাতায় টপকে পড়ে। আর উত্তরপূর্বে, আসাম কিংবা ত্রিপুরায় কী ছাপা হয় খোদায় মালুম। কলকাতা বা ঢাকাবাসী তার খবরই রাখেননা।

এই কুয়োসদৃশ অদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে বিজ্ঞজনেরা যতই 'লোকে আর বই পড়েনা শুধু টিভি দেখে' বলে হাহাকার করুন, পরিস্থিতির দায় পুরোটাই পাঠকের না। দায় বন্টনব্যবস্থারও। অর্থনীতিরও। কলকাতা কিংবা আগরতলা বইমেলায় পাঠক এখনও হামলে পড়েন। বিমুদ্রাকরণের মোক্ষম সময়ে সে উদ্দীপনায় তেমন টান ধরেনি। টিভি চ্যানেল আর ইন্টারনেটের রিয়েলিটি শোর চক্করে পাঠক নিশ্চয়ই কিছু কমেছে, কিন্তু সেটা অন্য সমস্যা। এই মুহূর্তেও কুড়ি কোটি মানুষের মধ্যে অন্তত দুকোটি মানুষ ছাপা অক্ষর পড়েননা, পড়তে চাননা, এ কথা ভাবার কোনো কারণ নেই। যদি সর্বগ্রাসী অডিও-ভিশুয়ালের বিকল্প হিসেবে বইকে দাঁড় করাতেও হয়, তাহলে আশু সমস্যাটা হল সম্ভাব্য পাঠকদের কাছে বই পৌঁছে দেবার। সমস্যাটা এক অন্তহীন গোলচক্করের।

বিলিবন্টন ব্যবস্থা ভালো নয় বলে প্রকাশকরা বেশি বই ছাপিয়ে শহরের বাইরে বেচার সাহস পাননা। আর শহরের বাইরে বই যায়না বলে বন্টনব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনা। ছোট্টো একটা পাঠক এলাকার দখল দিয়ে চলে কামড়াকামড়ি। টিভি বা ইন্টারনেটের এই সমস্যা নেই। প্রত্যন্ত এলাকার কোনে কোনেও তাদের সদর্প উপস্থিতি।

এই অন্তহীন গোলচক্কর ভাঙার জন্যই গুরুচন্ডা৯র এই ই-বই এর উদ্যোগ। পাঠক আছেন সর্বত্র। পৃথিবীর অগম্য বিচ্ছিরি সব কোনায় কোনায়। ছাপা বইয়ের বিলিবন্টনের ব্যবস্থা দিয়ে তাঁদের কাছে পৌঁছনো অসম্ভব। পরিবর্তে, যদি বিনামূল্যে বা অতি সামান্য মূল্যে তাঁদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় ছাপা অক্ষরমালা, বাংলা বইয়ের দুরবস্থার কিছুটা সুরাহা হলেও হতে পারে। আর লেখক-পাঠকের সরাসরি সংযোগভিত্তিক একটি গ্রাহক-প্রকাশক সম্পর্ক যদি গড়ে তোলা যায়, তাহলে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিকেই এগিয়ে যাওয়া যায়।

এই ই-বইটি আমাদের প্রথম উদ্যোগ মাত্র। এরপর আসবে আরও নতুন ই-বইয়ের সম্ভার। গুরুচন্ডা৯র প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল লেখক-পাঠক সমবায় তৈরি, যেখানে বাজারের ধরাবাঁধা খাদ্যখাদক সম্পর্কের বাইরে বেরিয়ে লেখকই পাঠক হবে, পাঠকই লেখক। তৈরি হবে অক্ষরভিত্তিক মিথোজীবিতা, নতুনতর এক বাস্তুতন্ত্র। এই ই-বইয়ের উদ্যোগ সেই দিগন্ত খুলে দেবে, আশা তেমনই।

সূচীপত্র

গপ্পো

রবিশংকর বল...৩

বিপুল দাস..১২

মাহবুব লীলেন...২০

মুরাদুল ইসলাম..২৭

দীপ্তেন...৪৬

প্রতিভা সরকার..৭০

শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়......................................৮৪

শক্তি দত্তরায় করভৌমিক................................৯৫

ইন্দ্রাণী...১০৪

মোজাফফর হোসেন......................................১১২

সোনালী সেনগুপ্ত.......................................১২০

আহমেদ খান হীরক.....................................১৪৩

কৌশিক দত্ত ১৫২

রুখসানা কাজল..১৭১

অমর মিত্র ১৮৪

সম্বুদ্ধ আচার্য...১৯০

স্বকৃত নোমান.. ১৯৮

নলিনী বেরা... ২১২

তিতাস বেরা.. ২২৯

রুমা মোদক...২৪৪

একক... ২৫৪

সোমেন বসু... ২৫৯

দীপেন ভট্টাচার্য ২৬৯

জয়ন্তী অধিকারী.. ২৮৩

কবিতা

সোমনাথ রায় ২৯৬

আর্যনীল মুখোপাধ্যায় ২৯৮

মিতুল দত্ত ৩০০

শমিত রায়..৩০১

সাম্যব্রত জোয়ারদার ৩০৩

সুমন মান্না ৩০৫

যশোধরা রায়চৌধুরী................................ ৩০৭

রোশনারা মিশ্র ৩০৯

অংশুমান কর ৩১১

কল্লর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৩

অয়ন চক্রবর্তী ৩১৫

পারমিতা মুন্সী ৩১৭

শান্তনু রায় ৩১৯

হিন্দোল ভট্টাচার্য ৩২১

প্রসূন ভৌমিক ৩২৩

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ৩২৫

সায়ন করভৌমিক ৩২৭

সার্থক রায়চৌধুরী ৩৩০

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য ৩৩৩

পুজোর ছবি, পদ্য

ঋতুপর্ণ ৩৩৯

ফরিদা ৩৩৯

বাড়তি কোচ

সুমন্ত ৩৪৫

ঋতেন মিত্র ৩৫৪

সোমনাথ রায় ৩৫৯

ইন্দ্রনীল ঘোষদস্তিদার.................................. ৩৬২

দীপ্তেন ৩৬৬

সম্বিত বসু.. ৩৭০

পারমিতা চ্যাটার্জী...................................... ৩৭৩

জারিফা জাহান..৩৯১

মুহাম্মদ সাদেকুজ্জামান শরীফ.................... ৩৯৫

গল্প

মৃত্যুর পরের দিন

রবিশংকর বল

আজ রাতেই আমার মৃত্যু হবে।

কীভাবে, কোথা থেকে জানলাম- এসব কথা জিজ্ঞেস করবেন না। সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না, আমিও পারব না।

এর মধ্যে কোনো দার্শনিকতা নেই। মৃত্যু নিয়ে দর্শন কপচানো আমার ভালো লাগে না। সত্যি বলতে কী, মৃত্যু এমন এক ঘটনা- যার পরে আর কিছু নেই- এই ঘটনা দর্শনের বাইরে থেকে যায়। শুধু টের পাওয়া যায়, কীভাবে আমি জানি না, শরীরের ভিতরে মৃত্যুর বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে, এবার সে ডালপালা মেলবে, শিকড় ছড়াবে শরীর জুড়ে।

সেই অ্যাকসিডেন্টের পর থেকে আমি বিছানাতেই বন্দি। অনেকদিন হাসপাতালে থাকার পর, বেশ কয়েকটা অপারেশনের যন্ত্রণা সহ্য ক'রে, ডাক্তাররা যখন হাত তুলে দিয়েছে, বাড়িতে ফিরে এসে বিছানাই হয়ে ওঠে আমার শেষ আশ্রয়। ডাক্তাররা বলেছিলেন, 'এবার ভগবানের হাত। আমাদের কিছু করার নেই।'

ফলে আমার আর ভরসার জায়গা রইল না, যেহেতু ভগবানের হাত আমার কল্পনার বাইরে। এইরকম সময়ে অনেকেই ভগবানের ভূমিকায় নির্ভরতা খুঁজে। কিন্তু ষাট বছর বয়স পেরিয়ে আসার পর ভগবানকে আমার আর প্রয়োজন নেই। ভগবান যারা মানে তাদের আমি কখনও বিদ্রুপ করিনি, খাটো করে দেখিনি। আমার কথা হল, যে যেভাবে সুখে থাকে, বোরডম্ না এলেই হল। বোরডম্ তখনই আসে, যখন মানুষ নিজের ভূমিকায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে।

আমাকে সারাদিন দেখার জন্য দু'জন আয়া আছে। বারো ঘণ্টা ক'রে তাদের ডিউটি। একজন আসে শ্যামনগর থেকে, তার নাম আশা। আর নিয়তি আসে সুভাষগ্রাম থেকে। ওদের মুখে গ্রামের এবং ট্রেনে আসার পথের টুকরো টুকরো গল্প যেমন শুনি, তেমনই আমিও ওদের গল্প বলি। তবে আশা ও নিয়তির গল্পে দৈনন্দিনের যে উত্তাপ থাকে, আমার গল্পে তা পাওয়া যায় না। বইতে পড়া নানা গল্পই আমি ওদের শোনাই।

নিয়তি একটু বেশি কথা বলে আর আশার কাজ শুধু শোনা ও মাঝে মাঝে মুচকি হাসা; তখন ওর গালে টোল পড়ে। আমি তাই আশাকে হাসির গল্পই বলি, শুধু ওই টোল দেখার জন্য। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি জানো, হাসলে তোমার গালে টোল পড়ে।'

আশা মুচকি হেসে মাথা নিচু করে; তার মানে ও জানে। আমি আশাকে টোল-এর ইংরেজি শব্দটা বলি- ডিমপল্।

- ডিমপল্ কাপাডিয়া?

- তারও গালে টোল পড়ে। ওইজন্যই তো নাম ডিমপল্। তুমি ববি দেখেছ?

- না।

- ববি-তে ডিমপল্ আমাদের পাগল করে দিয়েছিল। আমি উত্তেজিত হয়ে বলি। তোমার বর তোমাকে কিছু বলেনি?

- কী?

- টোল দেখে?

- সে কিছু দেখেই না। গাঁজা পেলেই ওর মস্তি।

একদিন নিয়তি এসে বলল, 'আজ দোলাকে রাস্তায় দেখলাম।'

- দোলা কে?

- ও, আপনাকে বলিনি বুঝি?

নিয়তি তার মেয়ে দোলার কথা বলতে-বলতে ফুঁপিয়ে, বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে। দোলা হিজরে, তা সে মানতে পারে না; দোলা তার কাছে মেয়ে। জন্মের সময়েই নিয়তি বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু মেয়েদের মত দেখতে ব'লে দোলাকে সে ফ্রক পরিয়ে রাখত। বাড়ির বাইরে যেতে দিত না। হিজরেরা যদি দেখে ফেলে। কিন্তু বয়স একটু বাড়তেই দোলার শরীরে পুরুষালি ভাব দেখা দিতে শুরু করল। খবর পেয়ে গেল হিজরেরাও। একদিন তারা এসে টানাহেঁচড়া করে দোলাকে নিয়ে গেল।

- কতদিন পরে দোলাকে দেখলাম। নিয়তি বলে,- ট্যাক্সিতে, পেরাইভেট গাড়িতে গাইছে। হাততালি দিচ্ছে।

- তুমি ডাকলে না?

- কী হবে! ও তো আর আমাদের কাছে ফিরতে পারবে না। হয়তো এখন আর ফিরতে চাইবেও না।

আমিও আজ মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরতে চাই না। আজ আমাকে নিয়ে যাবে ব'লে সে অপেক্ষা করছে। দিনের বেলা আশার ডিউটি ছিল। নিয়তি এলে ওদের বললাম, 'আজ তোমরা এখানেই থেকে যাও।'

- কেন?

- আজ রাতে আমি মারা যাব।

- এ কী অলুক্ষুণে কথা! নিয়তি মুখ ঝামটা দেয়। - কে বলল আপনাকে এই কথা?

- কেউ না। আমি হেসে বলি।- নিজেই বুঝতে পারছি। তোমরা থেকে গেলে আমার শেষ গল্পটা দুজনকেই বলা যেত। তার ওপর সকালে একজন মরা মানুষের ঝক্কি সামলাতে পারবে না।

নিয়তি ও আশা আর কোনো কথা না বলে থেকে গেল।

আসলে বনিকে কাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখিনি। চল্লিশ

বছর আগে বনির আত্মহত্যার খবর জানার পর থেকে ও রোজ রাতে আমার স্বপ্নে এসেছে, একটা দিনের জন্যও অনুপস্থিত থাকেনি। বনি আসবে, আমরা ওদের বাড়ির গন্ধরাজ গাছের নিচে অন্ধকারে শুয়ে- আমাদের বয়স তখন নয়-দশ হবে- আমরা এলোমেলো গল্প ক'রে যাব, এই অপেক্ষাতেই আমি রোজ রাতে শুতে গিয়েছি, বেঁচে থাকার নানা জটিলতা সহ্য করে নিয়েছি। কিন্তু কাল রাতে বনি স্বপ্নে এল না, আর আমার মনে হয়েছিল, চিরদিনের মতো ও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমি অনেক চেষ্টা করেও আর বনির মুখ মনে করতে পারলাম না। নিয়তি যেমন রাস্তায় দোলাকে দেখতে পেয়েও ডাকতে পারেনি, আমিও কাল সারা রাত অন্ধকারে জেগে থেকে বুঝেছি, বনি আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

খাওয়াদাওয়ার পর ওরা এল, নিয়তি ও আশা। আমার শেষ গল্পটা শুনতে।

আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা প্রতাপ ও শৈবলিনীর নাম শুনেছ? ওরা একে অন্যের দিকে তাকাল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের কথা ওদের বলি। প্রতাপ কিশোর আর শৈবলিনী সাত আট বছরের বালিকা। একদিন দু'জনে গঙ্গায় সাঁতার কাটতে-কাটতে প্রতাপ ডুবে গেল। শৈবলিনী সাঁতরে কূলে ফিরে এল।

বঙ্কিম রচনাবলী থেকে 'চন্দ্রশেখর'-এর সেই অংশটা পড়ে শোনালাম নিয়তি ও আশাকে। বঙ্কিমচন্দ্র কী লিখেছেন শোনো: 'বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে। যাহাদের বাল্যকালে ভালবাসিয়াছ, তাহাদের কয়জনের সঙ্গে যৌবনে দেখা সাক্ষাৎ হয়? কয়জন বাঁচিয়া থাকে? কয়জন ভালবাসার যোগ্য থাকে? বার্ধক্যে বাল্যপ্রণয়ের স্মৃতিমাত্র থাকে, আর সকল বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সেই স্মৃতি কত মধুর।'

পড়তে পড়তে আমি হেসে ফেলি।

- হাসছেন কেন? আশা বলে।

- স্মৃতি কত মধুর! বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন। এতবড় মিথ্যে আর হয় না!

- কেন?

স্মৃতি সবচেয়ে বড় প্রতারক। আশাকে এ-কথা বলার কোনও মানে হয় না। স্মৃতির সুতো দিয়ে আমরা এমন এক নকশা বুনে তুলি, যা আমাদের জীবনে কখনও আসেইনি। যেমন, বনি। কেন আমার স্বপ্নে চল্লিশ বছর ধরে এসেছে? বনি তো আমার জন্য আত্মহত্যা করেনি। অনেকদিন দেখা না-হওয়ার পর আমি খবরটা শুনেছিলাম মাত্র। অথচ বনি স্বপ্নে এমন ভাবে এসেছে, গল্প করেছে, হেসেছে যে মনে হয়, আমাকে ছাড়া বেঁচে থাকা ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। স্মৃতি নয়, জীবনই আসলে প্রতারণাময়; স্মৃতি মধুর নয়, তিক্তও নয়। তা শুধু একটা ঘটনা, যার শরীরে আমরা নিজেদের ইচ্ছে মতো রং লাগাই।

হাই তুলে নিয়তি বলে, 'চা খাবেন?'

আমি একটু ভেবে বলি, 'তোমাদের জন্য করো। আমাকে একটু হুইস্কি দাও।'

- এখন আবার ছাইপাঁশ খাবেন?

- ওভাবে বলো না। এটাই আমার শেষ পানপর্ব। লাস্ট সাপারও বলতে পারো।

নিয়তি আমাকে হুইস্কি দিয়ে দু'জনের জন্য চা বানিয়ে আনে। -'গল্প তো শুরুই করলেন না। সারা রাত বলবেন না কি?'

- সারা রাত তো আর আমার হাতে নেই। এমনও হতে পারে, গল্পটার মাঝপথেই আমি মরে গেলাম।

নিয়তি ও আশা দু'জনেই হেসে ওঠে। আশা বলে, 'আজ আপনাকে ছেলেমানুষিতে পেয়েছে।'

- কেন?

- সারাক্ষণ মরার কথা বলেই চলেছেন।

- সত্যি বলছি।

আশা চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, 'তা মরে গেলে যাবেন। এত কথা ব'লে লাভ আছে?'

আমি কোনো কথা বলি না। আশা আমার বেলুনটা পিন ফুটিয়ে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। সে বলে, 'গপ্পোটা শুরু করুন। সকাল থেকে আবার অনেক কাজ। একটু গড়িয়ে নিতে হবে তো। আপনার মতো সকালে তো ঘুমিয়ে থাকতে পারব না।'

বনির চেয়ে কয়েক বছরের বড়ই ছিলাম আমি। যেমন প্রতাপ আর শৈবলিনী। ওর ভালো নাম ছিল বনানী, সেই থেকে বনি। পঞ্চাশ বছর আগে তো ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক তৈরি হত না; দূর থেকে দেখা মুগ্ধতাই ছিল সম্বল। বনি সুন্দরী ছিল না, কিন্তু আমি একে দেখলে চোখ ফেরাতে পারতাম না। ওর কথা বলা, হাত নাড়া, গ্রীবাভঙ্গিতে এমন আশ্চর্য কিছু ছিল, যা চুম্বকের মতো টানত। একদিন সাহস করে ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলাম। তারপর থেকে ও আমাকে বাড়িতে নিয়ে যেত, ওর বাবা-মায়ের আপত্তি ছিল না, তারা আমাদের মেশামেশি খেলা হিসেবেই দেখতেন। কিন্তু আমরা যে টান-ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়েছিলাম, তা কারোর মনেও হয়নি।

বনিদের বাড়ির ভিতরে বেশ চওড়া বারান্দা ছিল; বারান্দার পাশে নিম, গন্ধরাজ গাছ, রঙ্গনের ঝাড়। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসত। আমরা গন্ধরাজ ফুলের গাছের নিচে বসে গল্প করতে করতে শুয়ে পড়তাম। গরমকালে গাছ জুড়ে নক্ষত্রের মতো সাদা ফুল আর তার গন্ধের নেশা। আমি বনির হাতে, গলায় নাক ঘষতাম; ওর শরীরের গন্ধ ছড়িয়ে যেত আমার ভিতরে। বনি খিলখিল করে হাসত; ওর শরীর তখনও জাগেনি, কিন্তু কেঁপে কেঁপে উঠত। আমার কাছে ঘন হয়ে আসত, আমাকে জড়িয়ে

ধরত।

কিছুদিন পর আমরা ও-পাড়া থেকে চলে গেলাম। একসময় বনিকেও ভুলে গেলাম। আমার বাল্যপ্রেম প্রতাপের মতোই সময়ের গর্ভে ডুবে গেল। অনেকদিন পর পুরনো পাড়ায় ফিরতেই বনির কথা মনে হল। ওদের বাড়িতে খোঁজ করতে যাওয়ার আগেই জানতে পারলাম, বনি আত্মহত্যা করেছে। একটি ছেলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তাকে বনির বাবা-মা মেনে নিতে পারেনি। তারপর থেকে বনিকে খুব কমই বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া হত। বনি ওর বাবা-মায়ের ওপর শোধ তুলল ঘুমের ওষুধ খেয়ে; হাসপাতাল থেকে আর বাড়িতে ফিরে এল না।

তারপর থেকেই চল্লিশ বছর ধরে রোজ রাতের স্বপ্নে বনি এসেছে। ওকে কখনও স্বপ্নে বিষণ্ণ দেখিনি; ফিরে এসেছে গন্ধরাজ গাছ, আমাদের গল্প, বনির খিলখিল করে হাসি, আমাকে জড়িয়ে ধরা। কিন্তু কাল রাতে ও যখন এল না, আমি বুঝতে পারলাম, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কেন যে আমার মৃত্যুর কথাই মনে হল, তা বলতে পারব না। আমার শুধু মনে হয়েছিল, বনি আর কখনও আসবে না, আমারও অপেক্ষার দিন শেষ। অপেক্ষা শেষ মানেই তো-।

বনি আসেনি। আমি সারাদিন ধরে সেই উপন্যাসটার একটা অংশই বারবার পড়েছি: 'সেই বনলতা- আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে। কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক পৃথিবীতে; বাবার তার লম্বা চেহারা, মাঝ-গড়নের মানুষ- সাদা দাড়ি, স্নিগ্ধ মুসলমান ফকিরের মতো দেখতে; বহুদিন হয় তিনিও এ পৃথিবীতে নেই আর; কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই ঘরখানাও নেই তাদের আজ; বছর পনের আগে দেখেছি, মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য, লেবু ফুল ফোটে, ঝরে যায়, হোগলার বেড়াগুলো উইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালের ওপর হেমন্তের বিকেলে শালিখ আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশ্যহীন কলরব করে। গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় লক্ষ্মীপেঁচা ঝুপ করে উড়ে

আসে। খানিকটা খড় আর ধুলো ছড়িয়ে যায়। উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর দু-তিন মুহূর্ত ছটফট করে। তারপরেই বনধুঁধুল, মাকাল, বঁইচি, হাতিশুঁড়ার অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

'বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলল সে। তারপর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নত মুখে মাঝ পথে গেল থেমে, তারপর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে, শামুক-গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নিচে একবার দাঁড়াল, তারপর পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

'তারপর তাকে আর আমি দেখিনি।'

- উঠুন, উঠুন, চা খাবেন না?

আশার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে মেঝেতে। বেশ বেলা হয়েছে। আজ আর ভোরবেলা শালিখ-চড়াইদের ঝগড়া শোনা হল না। শুধু পায়রাগুলোর বকবকম্ শোনা যায়।

- এত বেলা অব্দি কোনোদিন ঘুমোন না। আশা হেসে বলল।

- ডাকলে না কেন?

- রোজই তো সেই ভোরে উঠে পড়েন। ভাবলাম, থাক্ আজ একটু ঘুমোন।

দিব্যি বেঁচেবর্তে আছি। আশার দিকে তাকিয়ে একটু অস্বস্তিই লাগছিল। ও নিশ্চয়ই মনে মনে হেসেছে। কাল রাতে মৃত্যুর কথা বহুবার বলেও আমি আবার সকালে জেগে উঠেছি।

- আশা-। আমি ডাকলাম।

- বলুন।

- আমাকে একটু সোজা করে বসিয়ে দাও।

আশা আমার পিঠের দিকে বালিশ দিয়ে বসিয়ে দেয়, সামনের বারান্দায় কয়েকটা চড়ুই কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। একটা শামুক ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে।

আরও একটা দিন শুরু হয়ে গেল।

আমপাতা জোড়াজোড়া

বিপুল দাস

এক

এই দৃশ্য তার চোখের সামনে একটা উজ্জ্বল কার্বন-ল্যাম্প জ্বেলে মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছবিগুলো প্রক্ষেপিত করে চলেছে। তার বুকের ভেতরে একটা ছটফটানি শুরু হয়েছিল। প্রথমে কিছুটা এলোমেলো হলেও, আস্তে আস্তে একটা ছন্দ পাচ্ছিল টগবগ শব্দটা। ক্রমশ, সে বুঝতে পারছিল, এটা আসলে একটা মার্চিং-সং-এর সুর। ঠিকঠাক তালে বাজতে শুরু করেছে। তার প্রথমে মনে হ'ল কদম কদম বঢ়হায়ে যা। লয় আরও একটু দ্রুত হলে, সেটা হয়ে গেল হও ধর মেতে ধীর(অমিত অনেক পরে জানতে পারে যে, ওটা আসলে হও ধর্মেতে ধীর।)

কানের দু'পাশে সুড়সুড়ি লাগছে। হাত দিয়ে দেখল, ঘাড়ের দু'পাশে শরতের কাশফুলের মত কেশর গজিয়েছে। শরীরের রক্তকণিকাগুলো চনমন করে উঠল অমিতের। এখন অপেক্ষা করতে হবে। একটা সংকেতের জন্য এ সময়ে অপেক্ষা করতে হয়। বেশি ছটফট করতে নেই। রূপান্তরের এই সময় একটা ক্রান্তিকারী লগ্ন। মানুষের জীবনে ঐতিহাসিক মুহূর্ত। তখন ভুল করতে নেই। তা'হলে সেটা ঐতিহাসিক ভুল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

অমিতের ঘাড়ের দু'পাশে ঝলমলে কেশর। মাটিতে দু'বার পা ঠুকল অমিত। পাথুরে মাটির সঙ্গে খুরের ঘষায় খটখট শব্দ উঠল। এই খুর এখনও স্বাধীন। এখনও চালাক মানুষ কাঁটা মারতে পারেনি এই খুরের তলায়। মুখে লাগাম পরাতে পারেনি।

শীত-শীত করে উঠল অমিতের। তার মনে হ'ল, সাইবেরিয়ার তুষারঢাকা অঞ্চল থেকে উড়ে আসছে প্রাচীন বাতাস। এখানে এক ধুসর উপত্যকার মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে ফেলে এসেছে তুন্দ্রা অঞ্চল। সামনে রয়েছে গ্রানাইট পাথরের পাহাড়। এই পাহাড় ডিঙিয়ে তার দৌড় শুরু হবে। আদিম পৃথিবীর ঘোড়া অমিত দত্ত, উন্নত-নাসা আর্যদের বিস্মিত নীল চোখের সামনে দিয়ে দৌড়তে শুরু করল। এখনও পৃথিবীর বেশির ভাগ অংশই নির্জন। কুমারী অরণ্যের ঘন সবুজ তাকে ঢেকে রেখেছে। আর্যরা এখনও শেখেনি ঘোড়ার ব্যবহার। মুক্ত ঝর্ণার মত ছুটে চলে জানে শুধু এই ঘোড়া। অমিতের চারপাশে ধূর্ত মানুষের কোনও ছায়া নেই। অমিতের বুকের ভেতরে আদিম সঙ্গীতের অবিশ্রান্ত লয়। ঘনপল্লবযুক্ত গাছের ভেতর দিয়ে তুষারঝটিকা বয়ে গেলে যে শনশন শব্দ ওঠে, সেই শব্দ স্পষ্টই শুনতে পেল অমিত।

অমিতের সামনে অনন্ত পৃথিবী। প্রাচীন এই পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে তার দৌড় শুরু হবে। কোনও দায় নেই, কোনও পিছুটান নেই, পিঠের ওপর ভার নেই, লাগাম নেই। নেই কোনও দিকনির্দেশক কাষ্ঠফলক। লাফাতে শুরু করল অমিত। প্রথমে ধীরস্থির কদম চাল। আস্তে আস্তে গতি বাড়ায়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার পশমের মত কেশর উড়ছে। পায়ের নিচে, এতকালের অনাহত পাথরের টুকরো ছিটকে যাচ্ছে তার পায়ের আঘাতে। মুক্ত ছন্দে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকে অমিত দত্ত। কখনও বা ভূমধ্যসাগরের নোনা বাতাসে তার কেশর দোলে, কখনও বা কুমারী বরফ তার পায়ের নিচে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। স্বপ্নের মত নতুন নতুন দেশ আর অচেনা পাখির ডাক শুনতে শুনতে ঘোড়া-হয়ে-যাওয়া অমিত দত্ত ছুটছিল। বন্ধনহীন, স্বাধীন অমিত কাউকে তোয়াক্কা না করে ক্লপ ক্লপ শব্দে ছুটে যাচ্ছে। এই ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, যতটা বনভূমি সে পার হবে, সবটুকু অরণ্যে তার সার্বভৌম অধিকার।

ঘামে তার শরীর চিকচিক করছিল। ঠোঁটের কষে ফেনা জমে উঠেছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলেও অমিত থামে

না। মনে হয় এবার বুঝি তার হৃদপিণ্ড শতটুকরো হয়ে ফেটে পড়বে। শক্তি কি নিঃশেষ হয়ে এল?! কিছুতেই গতি কমানো চলবে না। প্রতিটি পেশীতে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে এই গতি বজায় রাখতে হবে। দুরন্ত গতির নেশায় অমিত তার দৌড় চালিয়ে যায়। পাথরের সঙ্গে তার খুরের ঘষায়। আজ নিয়ম ভাঙার খেলা। ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম অগ্রাহ্য করে মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তার পায়ের ছাপ ফেলে ঘোষণা করবে গতিময় আর ভারহীন, লাগামহীন প্রাণের কথা।

দুই

সামনে দু'পা তুলে ঘোড়াটা ভয় দেখাতে চাইছে ছেলেগুলোকে। মজা দেখতে এত রাতেও অনেক লোক জুটেছে। অবশ্য অষ্টমীর রাত। এই আধা-গঞ্জ-আধা-মফস্সলেও লোকজন আজকাল রাত জেগে পুজো দেখে বেড়ায়। রাত দু'টোর সময় ভুজঙ্গর দোকানের সামনেও কিছু লোক রয়েছে। এমনিতে বারোমেসে চায়ের দোকান। ক'বছর ধরে ভুজঙ্গ পুজোর ক'টা দিন জিলিপি, গজা আর বোঁদে রাখছে। পুজোর মুখে কারিগর পাচ্ছিল না। বাইপাসের মোড়ে লোকনাথ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কারিগরের অ্যাসিস্ট্যান্ট সনাতনকে ভুজুং দিয়ে টেনে এনেছে। দোকানের সামনে বেশ চুড়ো করে সাজানো থালা। তার ওপর হলুদ সেলোফেন। দিনের বেলায় হলুদ সেলোফেনের জন্য ভেতরের পিঁপড়ে এবং মাছিগুলোকে অচেনা কোনও পোকা মনে হয়।

অলীক কোনও দৃশ্য নয়। তা ছাড়া, অমিতের এমন কিছু নেশা হয়নি যে, জেগে জেগেই এমন খোয়াব দেখবে। মহাষ্টমীর রাত -- সে বাবদ আজ কোটার বেশি খেয়েছে বটে, কিন্তু মাথা দিব্যি সাফ আছে। ঘরে ফিরে পোশাক পালটে লুঙ্গি পরেছে। মালের সঙ্গে যা চাট খেয়েছে আজ, ওতেই তার রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছিল। মাথার দিকের জানালা খুলে শুয়ে পড়েছিল।

তার জানালার পাশেই পিচঢালা পথ, আর ঠিক উল্টো দিকেই ভুজঙ্গর দোকান। মাঝে মাঝে হাঁক দিয়ে দোকানের বাচ্চাটাকে চা-এর অর্ডার দেয়। দোকানের বাইরে রাস্তার ওপর ভুজঙ্গ একটা বেঞ্চ পেতে দিয়েছে। পাড়ার ছেলেরা ওখানেই সময় কাটায়। প্রাইভেট টিউটরের মতো কিছুক্ষণ পরপর বেঞ্চে ব্যাচ পাল্টাতে থাকে। বুড়ো, স্কুল-কাটিং ছেলে, গা-ম্যাজম্যাজ-করা তরুণ, মাঝবয়সি – ভুজঙ্গর চা নিয়ে ওরা কালাধন থেকে রামরহিম, বিদ্যা বালান থেকে বিমল গুরুং – সব কিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে থাকে। সন্ধ্যা একটু গড়ালে ওরা কয়েকজন মিলে বেঞ্চটাকে একটু আড়ালে নিয়ে যায়। অমিত এখানে বসে না। বাড়ির সামনের ঠেকে সুখ কম, এই বিশ্বাসে সে যায় অন্য ঠেকে। এখানে যারা আড্ডা মারে, তাদের সঙ্গে অমিতের পোষায় না। যারা দিনরাত ভুজঙ্গর দোকান আলো করে বসে থাকে, আজ অষ্টমীর রাতে তারা একটা ঘোড়াকে ধরবে বলে উঠেপড়ে লেগেছে।

ঘোড়ায় চড়ার শখ অমিতের বহুদিনের। ঝংকার হলে একবার মর্নিং-শো দেখেছিল। ইংরেজি সিনেমা। ও সব ভাষা বোঝা যায় না বলে অমিত যেতে চায়নি। দীপক জোর করে নিয়ে গিয়েছিল। নাকি হেবি গরম সিন আছে। গরম সিন ছিল। কিন্তু তার চেয়েও অমিতের ভালো লেগেছিল পায়ের কাছে প্যান্টের ওপর দিয়ে কালো চামড়ার মোটা মোজা, রুপালি বোতাম বসানো(পরে জানা যায় যে, ওগুলোকে ব্রিচেস বলে)। পিঠে রাইফেল ঝুলিয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটে যাওয়া। একটা ইংরেজি গানের সুর শিস দিতে দিতে। ইচ্ছেটা নিশ্চয় তার মনের ভেতরে এতদিন ধরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল। নইলে, এখন কেন তার লুঙ্গির নিচে পুরুষাঙ্গ ফুলে উঠবে?! ঘোড়াটা হতে হবে দুরন্ত তেজী ঘোড়া। আরবি হলেই ভালো হয়। নইলে অন্তত অস্ট্রেলিয়ার। মাথায় থাকবে লম্বা বারান্দাওয়ালা টুপি। দারুণ একটা ব্যাপার হ'ত।

তিন

শরীর শিরশির করছে অমিতের। বিছানা ছেড়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এখন। তেজ আছে বটে ঘোড়াটার। অতগুলো ছেলের ঘাম ছুটিয়ে ছাড়ছে। প্রথমে তো ওটাকে ধরতে যেতেই – হয়তো ভয় পেয়ে, সামনে দু'পা তুলে এমন চিৎকার ছেড়েছে, ছেলেগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই অমিতের মনে পড়েছে শোলে সিনেমার কথা। ঠিক এ রকমই ছিল ঘোড়ার ডাক। ছেলেগুলো আবার একটু এগিয়েছে, ঘোড়াটা আবার ও ভাবেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। উত্তেজিত অমিত লুঙ্গিটায় কষে গিঁট মারল। দরজা খুলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালে ব্যাপারটা, মানে ঘোড়াটাকে আরও ভালো করে দেখা যেত। লুঙ্গির নিচে লিঙ্গ এখনও দপদপ করছে।

একটা ছেলে কোথা থেকে একটা দড়ি এনে মাথায় একটা ফাঁস বানিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে ঘোড়ার গলায় পরানোর চেষ্টা করল। অত সস্তা নয়, আনাড়ি হাতে এসব হয় না। এবার ঘোড়াটাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে ছেলেগুলো। ঘোড়াটা কয়েক সেকেন্ড স্থির কী যেন ভাবল, তারপর মারল আচমকা দৌড়। সামনের ছেলেটা মাটিতে শুয়ে পড়েছে। তলপেটের নিচে চেপে ধরায় বোঝা যায় অণ্ডকোষে চোট পেতে পারে। অন্য ছেলেগুলো হই হই করে ওটার পেছনে ছুটল। তারপর কোথায় যেন হারিয়ে গেল ঘোড়াটা।

চার

ভোর তখন চার, সাড়ে চার হবে। পুব আকাশের থকথকে কালো দিগন্তের নিচে থিতিয়ে পড়ায় ওপরে কিছুটা স্বচ্ছতা বোঝা যায়। ঘোলাজলে মাছ ধরা সমাপন হলে যেমন কাদা তলায় থিতিয়ে পড়ে, ওপরের জল আবার স্বচ্ছ হয়ে ওঠে, তেমনই পুবের আকাশ এখন। অমিত স্বপ্ন দেখছিল, প্রাইমারি স্কুলের পেছনের মাঠে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করছে। আবার ঘুমের ভেতরেই টের পাচ্ছিল এখনই বাথরুমে যেতে হবে, নইলে লুঙ্গি, বিছানা নষ্ট হয়ে যাবে। স্বপ্নটা বাস্তবে টার্ন নেবে।

রাতভর জেগে-থাকা মাইক আর ঢাকের শব্দ এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। বাথরুম সেরে ফেরার পথে তার নাকে একটা আজব গন্ধ এলো। একটু আগেই তার ইউরিন থেকে ঝাঁঝালো পেচ্ছাপের গন্ধ ছাড়াও মদের গন্ধ বাষ্প হয়ে তার নাকে এসেছিল। সে তো প্রায় দিনই হয়। মল, মূত্র, ঘাম, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস, হয়তো চোখের জল, এমন কী বীর্য থেকেও হয়তো মদের গন্ধ বেরোয়। কিন্তু এই গন্ধটায় অজানা কোনও বুনো গন্ধ পাচ্ছিল অমিত। তখনই তার মোবাইল বাজল। ঘরে এসে অমিত দেখল অচেনা নম্বর।

-"হ্যালো" – ঘুমজড়ানো গলায় অমিত কথা বলল।

-"নমস্কার। আমি দেগঙ্গা থেকে শাহিদুল বলছি। শাহিদুল ইসলাম।"

-"নমস্কার, বলুন।"

-"গন্ধটা পাচ্ছেন ? ফেরোমেনের।"

-"হ্যাঁ, মানে ... আপনি কেমন করে বুঝলেন ? কীসের গন্ধ বললেন ?"

-"ফেরোমেন। জীবজন্তুরা গন্ধের নিশান পুঁতে দেয়। এরিয়া দখলের নোটিস। পাচ্ছেন না ?"

-"আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। এখন আমার ঘরে কোথা থেকে জীবজন্তু আসবে। আর, সে কেন আমার ঘর দখল করতে চাইবে।"

-"আহা, সবসময় কি আর বাইরে থেকে আসে। বেশির ভাগ সময় ভেতরেই থাকে। কোনও অকেশনটকেশন হলে বাইরে থেকেও আসতে পারে। ধরুন পুজো, ইলেকশন, ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের ফাইন্যাল।"

কিরকির শব্দ করে ফোনটা কেটে গেল। নাকের পাটা ফুলিয়ে জোরে বাতাস টানল অমিত। আরও উগ্র হয়েছে গন্ধটা। তার ঘরে

আলো জ্বালিয়েই বাথরুমে গিয়েছিল। তবু কেমন যেন অন্ধকার হয়ে আছে ঘরটা। অক্টোবরের মাঝামাঝি। ভোরের দিকে সামান্য ঠাণ্ডা পড়ে বটে, কিন্তু একটু বেশিই শীত করল অমিতের। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস এসে ফরফর করে উড়িয়ে দিল দি নিউ লোকনাথ বস্ত্রালয়ের ক্যালেন্ডার। কে যে ফোন করল কে জানে। পাগল বা মাতাল হবে। খামোখা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। কোনও জন্তু এসে তার ঘর দখল করে নেবে – বললেই হ'ল। তখনই আবার ফোন এল। অমিত দেখল অচেনা, কিন্তু অন্য নম্বর। আগেরটা নয়। আবার কে। বড় রহস্যময় ব্যাপার ঘটছে কাল রাত থেকে।

-"হ্যালো, কে বলছেন ?"

-"আমি ময়নাগুড়ি থেকে পরেশ বর্মণ বলছি। গন্ধটা পৌঁছেছে ? আপনার শরীর কেমন আছে ?"

কথা বলতে পারছিল না অমিত। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা আশ্চর্য হয়ে তার গলায় কিছু অদৃশ্য কফ জমা হয়ে ছিল। একরকম ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোলো তার গলা দিয়ে।

-"বাঃ, চমৎকার হচ্ছে। চালিয়ে যাও গুরু। আমরা তোমার সঙ্গে আছি।"

-"কে আপনারা ?" অনেক কষ্টে কুঁথে কুঁথে বলল অমিত। ঘর এখন আরও অন্ধকার। খুব ঠাণ্ডা বাতাস আসছে, যেন বাইরে তুষার-ঝড় শুরু হয়েছে। আর সেই গন্ধে ভরে গেছে অমিতের ঘরদুয়ার। বিছানা, বালিশ, চাদর, লুঙি, মশারি, দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো জামা ও প্যান্ট।

-"আমরা এজেন্সির লোক। কাস্টমার চিনতে আমাদের কষ্ট হয় না। আমাদের আলাদা টাওয়ার, আলাদা প্রোভাইডার আছে।"

-"কীসের এজেন্সি ? কী নাম ?"

-"যাদের খুব চড়ার হাউশ, এই ধরুন ডবকা মেয়েছেলের

ওপর, বি এম ডাব্লিউ, নাগরদোলা বা কিছু না পেলে পাশবালিশের ওপর – হাউশ বোঝেন তো, আমাদের নর্থবেঙ্গলে শখ বোঝাতে হাউশ বলি, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের এজেন্সি। 'গন্ধবণিক' নামে একটা সফট্‌ওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে।"

কেটে গেল ফোনটা। তৃতীয় ফোনটা ফালতু তার ঘরে বেজে যাচ্ছিল। অমিত তখন আদিম পৃথিবীর কুমারী বরফ ভেঙে ভেঙে এগোচ্ছিল। পথের দু'পাশেই সে তার উচ্ছ্রিত লিঙ্গ থেকে ফোঁটা ফোঁটা গন্ধ রেখে যাচ্ছিল। হতে পারে সেটা তার এরিয়া দখলের নোটিশ, আবার বিপরীত লিঙ্গের জন্য সংকেতও হতে পারে।

চলতি আগামী

মাহবুব লীলেন

হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। ঠেলতে ঠেলতে আমাকে একটা বাথরুমে ঢোকাল তারা। বাথরুমটা বেশ বড়োসড়ো। ফ্লোরে একটা কমোড। আমাকে চিৎ করে শুইয়ে কমোডের প্যানের মধ্যে একজন পা দিয়ে আমার মাথা চেপে ধরল। কপালটা গিয়ে আটকে গেল প্যানের ভেতরের খাঁজে...

একজন পা দিয়ে আমার বুকে চেপে ধরল। আর দুইজন চেপে ধরল দুই পায়ে। ঘাড়টা পড়েছে কমোডের একটা পা-দানির উপর। মাথাটা নিচের দিকে চেপে দেয়ায় গলাটা একেবারে টানটান হয়ে আছে। টানটান গলায় একজন বটি দাওটা চালিয়ে দিল...

দাওটা মোটেও ধারালো না। আর ওই লোকটার বোধহয় মুরগি কাটার অভিজ্ঞতাও নেই। না হলে চামড়ার ইলাস্টিসিটি; চামড়ার নিচে শ্বাসনালী আর কণ্ঠনালীর মতো দুইটা পিছলা পাইপ; ছোট বড় অনেকগুলো শিরা উপশিরা; এগুলোর চাকু ফিরিয়ে দেবার কৌশল এবং তা এড়ানোর তরিকা তার জানা থাকত...

কাটছে না দেখে সে যত চাপ দেয় শ্বাসনালী ভেতরে তত থেঁতলে যায় কিন্তু কাটে খুবই কম। লোকটা বোকার মতো একবার দাওয়ের দিকে আর আরেকবার আমার গলার দিকে তাকায়। এই অবস্থা দেখে লিডার আমার মাথা চেপে ধরার দায়িত্ব দাওটা-ওয়ালাকে দিয়ে নিজেই দাওটা বাগিয়ে ধরে বটির চোখা মাথা দিয়ে টানটান গলায় একটা কোপ বসিয়ে দিল কুড়ালের মতো। বটির পুরো মাথাটা ঢুকে গেল গলার ভেতর, এবার বটির

মাথায় কাটা গর্ত ধরে দিল প্রথম পোঁচটা। খসখসের সঙ্গে সামান্য কিছু কটকট শব্দ করে কয়েক পোঁচের মধ্যেই বটি দাওটা গিয়ে ঘাড়ের হাড়ে লাগল। সে উঠে দাঁড়াতেই একজন বলল, "টুকরা করে ফেল।"

এখন টুকরা করলে বডি থেকে সব রক্ত বেরোবে না। রক্ত বের হোক, পরে আলাদা করা যাবে।

যে দুইজন আমার দুই পা চেপে ধরেছিল, মনে হলো, তারা শূন্যে লাফাচ্ছে আমার পায়ের সাথে। বুকে চেপে থাকা পাবলিকের কয়েকবার পড়তে পড়তে ঠেসে চেপে ধরতে হচ্ছে আমার বুক।

রক্ত এত স্পিডে বের হয় জানা ছিল না। শরীরের অংশ থেকে রক্ত বের হয়ে গিয়ে বাড়ি খাচ্ছে মাথার সাথে লেগে থাকা গলার অংশে। তারপর গলার কাটা অংশের খাদ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে কমোডে। মূল স্রোতের পাশাপাশি আরো কিছু ছোটখাট স্রোত গিয়ে উড়ে পড়ছে এদিক সেদিক। কোনোটা দেওয়ালে। কোনোটা মাথা চেপে রাখা ছেলেটার পায়ে।

আস্তে আস্তে পা দু'টো থেমে গেল। তারপর থামল বুকের মোচড়। এবার সবাই ধরাধরি করে আমার পা দুটো এনে দেওয়ালে তুলে দিয়ে চেপে ধরে রাখল, যাতে রক্ত সব নিচের দিকে নেমে এসে কমোডে পড়ে।

এর মধ্যেই ছিটিয়ে থাকা রক্ত ধোয়ার কাজে লেগে গেল একজন। রক্ত পড়া যখন প্রায় শেষ, তখন আমাকে আবার তুলে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল বাথরুমের ফ্লোরে। শরীর থেকে জামা কাপড় খুলে একটা গাছের গুঁড়ি পায়ের নিচে ঢুকিয়ে একজন হাড়ের মধ্যে কোপ লাগাল। কিন্তু স্প্রিংয়ের মতো ফিরে গেলো দাওটা।

লিডার হাসল, "ছাগলের বাচ্চা। হাড্ডি কাটতে হয় আড়াআড়ি কোপে।"

এবার ছেলেটা আড়াআড়ি কোপ মারায় কাজ হল। কিন্তু

টুকরোটাকে আলাদা করে নিতে তাকে মারতে হল প্রায় দশটা কোপ।

বাম পায়ের টুকরোটা আলাদা করে হাঁটুর কাছে কোপ বাগিয়ে ধরতেই লিডার তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে বটি দাওটা ঘষে ঘষে আমার হাঁটুর জোড়ার চারপাশের চামড়া মাংস আর রগ কেটে দাওয়ের মাথা ঢুকিয়ে একটা চাড় দিতেই হাঁটুর অংশটা আলাদা হয়ে এল। একইভাবে শরীর থেকে রানের অংশটা আলাদা করে একজনকে বলল, আরেকটা দাওটা এনে ওটাকে দুই টুকরো করার জন্য।

সিম্পলি বটি দাওয়ের মাথা দিয়ে ঠুকে ঠুকে জোড়ায় জোড়ায় সে খুলে ফেলতে লাগল বেশ দ্রুত। আর টুকরোগুলোকে মুগুরের উপর রেখে অন্য একটা দাও দিয়ে ছোট টুকরো করতে লাগল সেই আনাড়ি লোকটা।

পায়ের দিক শেষ করে ঘাড়টা মুগুরের উপর রেখে এক পা বুকের উপর তুলে আরেক পায়ে একটা চাপ দিলো মাথায়। মট করে শব্দ হলো। তারপর বটিদাও ঘষে ঘষে মাথাটাও আলাদা করে আমাকে উপুড় করে নিল। হাত দুটোকে খুলে বটি দাওয়ের মুখ দিয়ে মেরুদণ্ডের জোড়ার ফাঁকে ফাঁকে টোকা দিয়ে পাঁচ জায়গায় জোড়া খুলে ফেলে উঠে দাঁড়াল, "একটা ঝামেলা হবে।"

- "কী ঝামেলা?"

- "পেটের ভেতরের জিনিসগুলা এইখানেই ফেলে যেতে হবে না হলে গুঁতাগাতি লেগে ভুঁড়ি ফেটে গেলে পানি পড়বে চুঁইয়ে চুঁইয়ে।"

এবার আমাকে ধরাধরি করে পেটের দিকটা কমোডের কাছে নিয়ে লোকটা এক কোপে বটি দাওয়ের মাথা আমার নাভির একটু উপরে ঢুকিয়ে একটা মোচড় দিলো। সাথে সাথে পেট থেকে বেশ কিছু তরল বের হয়ে পড়ল কমোডে। এবার আমাকে সরিয়ে নিয়ে এসে আলাদা করা মেরুদণ্ডের খণ্ডগুলো দেখে দেখে

বটি দাওয়ের মাথা ঢুকিয়ে পিঠ থেকে পেট পর্যন্ত পাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে বটি ঘষতে ঘষতে পুরো পাঁচ টুকরো করে ফেলল শরীরটাকে।

নাড়িভুঁড়িগুলো টুকরো না করে শুধু শরীর থেকে কেটে আলাদা করে রাখল এক জায়গায়। দু'তিনটা নাড়ির মুখে গিঁট দিয়ে রাখল, যাতে ভেতর থেকে আর কোনো তরল বের হতে না পারে।

কতগুলো পলিথিনের প্যাকেট নিয়ে এল এবার একজন। খণ্ড খণ্ড আমাকে পলিথিনে ভরে বাথরুম থেকে বের করে নিয়ে এল। এখানে কয়েকটা টিভির কার্টন রাখা। প্যাকেটগুলো কার্টনে প্যাক করে ধরাধরি করে নিয়ে একটা ভ্যানে তুলে তারা রওনা দিল।

রক্তের সঙ্গে পানি, তার সঙ্গে ওদের জুতার ধুলোবালি। একটা খসখসের সাথে থলথলে ভাব। তার উপর পিছলা পলিথিন। যত টাইট করেই পলিথিন বাঁধুক না কেন এক ধরনের পিছলা দোলা কোনোমতেই থামছিল না। পলিথিন খামচে ধরে যে একটু স্থির হব তারও উপায় নেই। হাত দুইটা আলাদা আলাদা প্যাকেটে। মাথার সাথে একই প্যাকেটে রেখেছে নাড়িভুঁড়িগুলা। এগুলো এমনিতেই বেহুদা লটরপটর করে। এইদিকে দোলে তো ওই দিকে দোলে।

ওরা আমাকে কাটার পর পুরা শরীরে পানি মারলেও মাথায় কোনো পানি মারেনি। জুতা দিয়ে মাথা চেপে রাখার সময় অনেকগুলো বালি ঢুকে গিয়েছিল চোখের মধ্যে। সেগুলো এখনও আছে।

গাড়িটাকে একটা ক্যুরিয়ার সার্ভিসের অফিসের সামনে থামিয়ে হইচই শুরু করে দিল লিডার, "লোক কই! আস্তে ধরো। ভেতরে নিয়ে একপাশে রাখবে।"

গাড়ি থেকে আর কেউ নামল না। ক্যুরিয়ারের কামলারা প্যাকেটগুলো তুলে নিয়ে কাউন্টারের সামনে সাজিয়ে রাখল।

মোট ছয়টা টিভির প্যাকেট।

কাউন্টার থেকে একজন আওয়াজ দিল, "কী জিনিস?"

- "কী জিনিস তা তো দেখবেনই। তার আগে তো ঠিকানা লিখতে হবে।"

- "মার্কার লাগবে?"

- "না, ঠিকানা লেখা কাগজ সাথে আছে। শুধু একটু টেপ বা গাম লাগবে। আছে?"

- "হ্যাঁ আছে।"

- "তাইলে খাড়ান, আমি ঠিকানার কাগজগুলা নিয়ে আসি।"

কাউন্টারের লোকটা একটা টেপ বের করে কাউন্টারের উপর রাখল। লিডার বের হয়ে গেল, ঠিকানার কাগজ আনতে।

অনেকক্ষণ পরে তাদের খেয়াল হল, ঠিকানা আনতে গিয়ে কেউ আর ফিরে আসেনি এবং প্যাকেটগুলোও পোস্ট করেনি কুরিয়ারে। যারা প্যাকেটগুলো গাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসছিল, তাদের একজন গিয়ে দেখে রাস্তায় সেই গাড়ির কোনো নাম গন্ধ নেই।

প্রথমে প্যাকেটগুলো ঠেলা ধাক্কা। তারপর তুলে একটু আছাড়। তারপরে হইচই ফোন এবং পুলিশ এবং প্যাকেটের মুখ কাটা।

প্যাকেট কাটার আগে যারা এনে রেখেছিল, তাদেরকে পুলিশের কিছু প্রশ্ন এবং প্যাকেট খোলার পরে আরোও কিছু প্রশ্ন। তারপর আবার প্যাকেটের মুখ বন্ধ করে ফেলা। তারপর আরো অনেকক্ষণ ওয়াকিটকি প্রশ্ন এবং আবার প্যাকেটের মুখ খোলা এবং একটা একটা করে টুকরা বের করে তার বর্ণনা লেখা।

- "সামনের দুইটা দাঁত ভাঙা। মনে হয় আগে কিছু ঘুসাঘুসি হইছিল।"

- "চোখের মধ্যে বালি। মনে হয় চোখে বালি দিয়া আন্ধা বানাইয়া কাবু করছিল।"

- "মাথার পেছন দিকে পুরানা গু। মনে হয় গুয়ের স্থানে কুস্তি হইছিল কিছু।"

কোন টুকরা কতটুকু উত্তর দিকে আর কতটুকু দক্ষিণ দিকে। কোন প্যাকেটের উপর কোন প্যাকেট। প্যাকেটগুলো কীসের। পলিথিন কীভাবে গিঁট মেরে রাখা, সব লিখে-টিখে আমাকে আবার প্যাকেট করে তোলা হল পুলিশ ভ্যানে। সঙ্গে ক্যুরিয়ারের লোক। তবে এবার প্যাকেটগুলো করা হয়েছে যাচ্ছেতাইভাবে। নিজের মাংসের সাথে নিজে ধাক্কা খেয়ে বিরক্তি লাগছে। আর মাংসগুলোও কেমন যেন পিছলা।

পুলিশ ভ্যান গিয়ে থামল হাসপাতালের মর্গে। টপাটপ লোকগুলো গাড়ি থেকে নেমে অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে বাক্সগুলো নিয়ে গেলো মর্গের ভেতরে।

ডোমটা বেশ কাজের। সে সবগুলো প্যাকেট খুলে শুরু করল মাথা থেকে। মাথাটা টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে একটা কাঠি দিয়ে কাটা অংশগুলো নেড়েচেড়ে কী কী যেন বলে গেলো আর একজন পাশে দাঁড়িয়ে লিখে গেলো বর্ণনা, শ্বাসনালী থেঁতলান। কণ্ঠনালী ধারালো কিছু দিয়ে কাটা। শিরদাঁড়া চাপ দিয়ে জোড়া খোলা।

সিরিয়ালি সে আমার অংশগুলো টেবিলের উপর সাজিয়ে খচাখচ সুঁই সুতা চালিয়ে আমাকে আবার পুরোটা বানিয়ে ফেলল। তবে পেটের চামড়া জোড়া দেবার আগে পেটের মধ্যে সে নাড়িভুঁড়ির সাথে হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুসটাও ঢুকিয়ে সেলাই মেরে দিল।

আমি আবার অখণ্ড হয়ে গেলাম। শুধু পার্থক্য হল, আমার হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস দু'টোই এখন পাকস্থলীতে।

ছবি: চিরঞ্জিত সামন্ত

তকদির

মুরাদুল ইসলাম

অবশ্যই আপনারে জিম টিম ইত্যাদি করতে হবে, একজন মানুষের সুস্থতার জন্য এটা দরকার। যখন আপনি সারাদিন বসে বসে কাজ করেন, তখন শরীরে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলের জন্যও তো ব্যায়ামের প্রয়োজন আছে। এছাড়া দার্শনিক ভাবে দেখতে গেলে, আমরা সক্রেটিসের কথাটা দেখতে পারি। তিনি বিষয়ে যা বলে গেছেন তা ইংরাজিতে এমন, “নো ম্যান হ্যাজ দ্য রাইট টু বি এন এমেচার ইন দ্য মেটার অব ফিজিক্যাল ট্রেইনিং। ইট ইজ এ শেইম ফর এ ম্যান টু গ্রো অল্ড উইদাউট সিয়িং দ্য বিউটি এন্ড স্ট্রেংথ অফ হুইচ হিজ বডি ইজ ক্যাপাবল”; তো এখানে আবার অনেকে সন্দেহ করতে পারেন ও প্রশ্ন করতে পারেন এই বলে যে, “সক্রেটিস যেই কনটেক্সটে কথাটি বলেছিলেন সেই কনটেক্সট কি আর আছে?” (আবার এই বলেও দুর্বোধ্য দার্শনিক খোঁচা দিতে পারেন যে দেরিদা বলে গেছেন কনটেক্সটের বাইরে টেক্সট এর কোন অর্থ নাই!) এখন আমাদের শহর এথেন্সকে বাঁচাতে যুদ্ধ করতে হবে এবং এর জন্য ফিট থাকার দরকার আছে?! অর্থাৎ, প্রশ্ন করার নিয়েত থাকলে প্রশ্ন করাই যায় তথাপি এই কথা ধ্রুব সত্য আপনাকে ফিট থাকতেই হবে এবং তাই বুদ্ধিমানের মত চিন্তা।

আপনাকে কিন্তু খালি বাইসেপ বাড়ানর চিন্তা করলে হবে না, বাইসেপ, ট্রাইসেপ, লেগ, চেস্ট, ফোর আর্ম, শোল্ডার, ব্যাক সব দিকেই খেয়াল দিতে হবে। খেতে হবে সেই অনুপাতে। পাউন্ডে যত ওজন আপনার, প্রতি পাউন্ডে একগ্রাম করে প্রোটিন খাইবেন, আর বেশি হাল্কা শরীর থাকলে, কত ক্যালরি আপনার লাগে, তা

বয়স উচ্চতা এক্টিভিটি ইত্যাদি তথ্য দিয়ে অনলাইন ক্যালকুলেটরে হিসাব করে বের করবেন এবং এর চাইতে পাঁচশ বা এক হাজার ক্যালরি বেশি খেতে থাকবেন। তাহলে ইনশাআল্লাহ, আপনার মাসল হতে শুরু করবে। সাধারণত এমনই হয়। তবে নিউট্রিশন বা পুষ্টিবিদ্যা বিষয়টি বেশ বিতর্কিত তাও মাথায় রাখতে হবে এবং আরেকটা কথা মনে রাখবেন, সমস্ত ব্যাপারটা খুব ধীর। আহমদ ছফা লিখেছিলেন, বিপ্লব হল কৃষ্ণের গরু চড়ানোর মত। মাসল গেইনও একইরকম। ফলে কুইক রেজাল্টের আশা না করে লেগে থাকুন, এবং লেগেই থাকুন কারণ আপনি ছাড়তে আর পারবেন না, কারণ এটি একটি লাইফস্টাইল বা সুন্দর করে বললে বলতে পারেন জীবনদর্শন।

গল্প বলতে এসে আমি এসব কেন বলছি তা আপনি ভাবতে পারেন, এবং এতে বিরক্ত হওয়াও স্বাভাবিক, তবে খুব যে সম্পর্কহীন কথাবার্তা বলেছি তা মনে হয় না, কারণ আমি এই গল্পের কথক ও প্রধান চরিত্র; ফলে আমার চরিত্রের নানা বাঁক ও দিক আপনার বুঝার জরুরত আছে। তাতে গল্প বুঝতে সুবিধা।

সেইদিন রাত এগারোটার দিকে আমি কিছু বেঞ্চ প্রেস, ডাম্বেল প্রেস, ডাম্বেল ফ্লাই মেরে বের হয়েছি জিম থেকে। মনে হচ্ছে, বুকের ছাতি কয়েক ইঞ্চি ফুলে গেছে।হেঁটে হেঁটে আসছি বাসায়। পাশে ফলের দোকান, কমলা আপেল আনারস ইত্যাদি ফল সাজানো। ঠেলাগাড়িতে করে কিছু লোক বিক্রি করে হলুদ পাকা কলা। আরও আছে, রাস্তার পাশে বিভিন্ন ভ্যারাইটিজ স্টোর। বেডিং স্টোর যেখানে, লেপ তোষক ইত্যাদি বিক্রি করে: নাম মৌরী এন্ড মিতা বেডিং। সামনে এগিয়ে গিয়ে রাস্তার একপাশে একটা ছোট মাজার। ইনি সুদূর ইয়ামন দেশ হতে হযরত শাহজালালের সাথে এসেছিলেন এই বঙ্গদেশে, এমনই লেখা আছে ফলকে; তবে তার পাওয়ার সম্ভবত খুব একটা বেশি ছিল না, তাই তার মাজারের শান তেমন নাই, কেবল চারকোণায় জরির কিছু কাপড় লাগানো আর উপরে টানানো শালু, যার কাপড় পুরনো হয়ে উঠেছে। মাজার পেরিয়েই আমি দেখতে পেলাম,

ছোট একটি জটলা মানুষের। কিছু রিকশাওলা এবং এইমত শ্রেণীর লোক ঘিরে কিছু একটা দেখছে। আমি একটু এগিয়ে গেলাম ও দেখলাম যে পুরনো প্যান্ট শার্ট পরা (শার্ট ইন করা) একজন লোক একটি বাচ্চা ছেলের কলার চেপে ধরে আছে। ছেলেটির বয়স হবে তেরো বা চৌদ্দ বছর, ছেলেটির মুখে ভয়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে।

আমি দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কী হয়, বুঝে গিয়েছিলাম যে চুরি টাইপের কিছু একটা হয়েছে এখানে কিন্তু এই ছোট ছেলে কীভাবে চুরিকার্য সমাধা করল তা জানতে বড় আগ্রহ হলো। তাই একজন রিকশাওলার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করলাম ঘটনা কী? রিকশাওলা জানাল, “এই পোলারে ঐ লোক তার দোকানে রাখছিল। দোকানে একজন কাস্টমার আইছেন। একহাজার টাকা দিছেন। এক হাজার টাকার ভাংতি নাই। তিনি তখন ঐ পোলারে বললেন ভাংতি আনার জন্য কিন্তু পোলা টাকা নিয়া ভাইগা আসছে।”

এই কথা শুনে আমি ছেলেটির দিকে আবার তাকালাম, এবার তার ভয়ার্ত ছাপ আমাকে স্পর্শ করল না বেশী, তার চাইতে অধিক আমার মনে হলো তার দুঃসাহসিক চুরি কর্মটার কথা, এমন গর্দভী চুরি কেউ করে!

আমি দেখলাম ছেলেটির বাপ চলে এলো, বাপের মুখে কালো দাঁড়ি এবং পরনে খালি লুঙ্গি, বাপকে প্যান্ট শার্ট পরা ভদ্রলোক বলছিলেন কীভাবে তার ছেলে টাকা নিয়ে ভেগে এসেছে, বাপ উত্তেজিত হয়ে ছেলেকে দিল এক চড় এবং ছেলেটি শব্দ করে কেঁদে উঠল আর আমার মানবিক সত্তা জেগে উঠল। আমি দুই ইঞ্চি বেড়ে যাওয়া বুকের ছাতি সামনে রেখে এগিয়ে গিয়ে বললাম, “এই কী হইছে এইখানে? মারামারি কেন?”

প্যান্ট শার্ট পরা বললেন, “দেখেন ভাই, এই পোলা কাজ করে আমার দোকানে কিন্তু করছে কী দেখেন, আমার দোকানে আইছেন এক কাস্টমার, তাও মহিলা কাস্টমার, দিছেন এক

হাজার টাকা, ভাংতি নাই, আমি দিলাম ওরে ভাংতি আনার জন্য, কিন্তু সে টাকা নিয়ে পলাইয়া আসছে? এইটা হয়, বলেন?”

আমি বললাম, “ঠিক আছে, কিন্তু এখন ওরে মারলে তো আর ঘটনা বদলাইয়া যাইব না।”

ছেলের বাপের দিকে তাকিয়ে বললাম, “আপনে কি ওর বাপ?”

ছেলের বাপ বলল, “জি।”

আমি বললাম, “ওরে মারবেন না। উনারে উনার টাকা ফেরত দেয়া কি হইছে?”

প্যান্ট শার্ট পরা ভদ্রলোক বললেন, “আমার টাকা আমি নিয়া নিছি ওর কাছ থেকে।”

আমি বললাম, “তাইলে তো মামলা শেষ। এখন আপনি কি ওরে আর দোকানে রাখবেন?”

প্যান্ট শার্ট পরা বললেন, “না, ও তো একটা চোর।”

আমি বললাম, “ঠিক আছে। সব মিইটা গেল। চুরির দায়ে আপনি ওরে বাইর কইরা দিলেন। এইটা ওর শাস্তি। চুরির মাল ফেরত পাইলেন।”

ছেলের বাপের দিকে তাকিয়ে বললাম, “আপনার পোলারে শিক্ষা দেন যাতে চুরি না করে। কিন্তু মাইরেন না, মাইরা কেউ কাউরে কিছু শিখাইতে পারে না।”

উপস্থিত সবাই দেখলাম আমার কথা মেনে নিচ্ছে, এটা আমার আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে কথা বলা না বুকের ছাতি কয়েক ইঞ্চি বেড়ে যাবার দরুন তা ঠিক বলতে পারি না। আমি একবার ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চোখে তার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি; এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন আমি ওকে সাক্ষাৎ যমদূতের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলাম। আমি ওখানে মামলা ডিশমিশ করে

বাসার দিকে হাঁটা দিলাম। ঘটনাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হেঁটে আসছিলাম বাসায়, একটা গল্পের প্লট হতে পারে, বেশ মানবিক ব্যাপার আছে, আর মানবিক ব্যাপারে আবেগ টাবেগ মিলিয়ে মিশিয়ে এক খিচুড়ি যদি করা যায় তাহলে মিডলক্লাস পাঠক বড় আনন্দ নিয়ে পড়বে। এইভাবেই তো হয় আসলে, টুকটাক মানবিক জিনিস ধরে ফেলতে হয় আর বালতি বালতি আবেগ মিশাতে হয়, ঠিক যেমন গরুর দুগ্ধের ব্যবসায়ীরা করে থাকে, আসল মাল অল্প এক বালতি দুধ, আর তাতে পানি দুই বালতি।

আনমনে হেঁটে আসছি, আর যেইমাত্র বাঁশফুল অভিজাত ফুড কনফেকশনারির (মিষ্টি জগতে এক ধাপ এগিয়ে) সামনে এসেছি, ঠিক তখনই আমার এক বন্ধু তুষার চক্রবর্তীর আগমন। সে আমার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অবাক হবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল আর আমার বিরক্তি এবং অস্বস্তি বাড়তে লাগল কারণ আমার এই বন্ধু এক জীবন্ত উৎপাত।

কিয়ৎক্ষণ দাঁড়িয়ে সে মুখ খুলল, “আরে ব্যাটা, বডি তো বানাইয়া ফেলছস, আমি ত চিনতেই পারি নাই, জিমে যাছ নাকি?”

“হ, এই কয়দিন ধইরা যাই।”

“কস কী! কয়দিনেই এই অবস্থা হালায় করছস কী! খাস নি কিছু?”

“আরে কী খামু?”

“আছে না কীসব পাউডার টাউডার ট্যাবলেট।”

“আরে না! ওইগুলা খাওয়ার টাইম আছে নাকি! এমনিতেই যাই আসি আর কী।”

“তাইলে বন্ধু চল, তরে কিছু খাওয়াই আইজ।”

তুষার আমার হাত ধরে বলল একথা, আমার অস্বস্তি আরো বাড়ল, কারণ তার সাথে গেলে কিছু পরনিন্দা পরচর্চা শুনতে হবে। এখানে আমি বলছি না যে আমি দুগ্ধে ধৌত তুলসী পাতা

যে পরনিন্দা করে না বা শুনে না, দুটাই আমি করে থাকি কিন্তু সময় স্থান ও মুড সাপেক্ষে। এখন যেই অবস্থা, সারা গায়ে ঘাম, বর্তমান অবস্থা প্রেক্ষিতে আমার মূল কাজ হলো বাসায় গিয়ে গোছল করা এবং কিছু খাওয়া। এই অবস্থায় পরনিন্দা শুনব কোন দুঃখে?!

আমি তুষাররে বললাম, "বন্ধু মাফ কইরা দে, এই অবস্থায়, এই ঘাম গুম লইয়া আমি কি খাইতে পারি? অন্যদিন কথা হবে, আইজ যাই।"

"আরে যাই কী রে ব্যাটা, বহুত জরুরি কথা আছে তর লগে, আমি ত মনে মনে তরেই খুঁজতেছিলাম।"

"ভাই, মাফ কইরা দে, দেখতেছস তো আমার কী অবস্থা। এই অবস্থায় খাই কেমনে?! এখন গিয়া গোছল করতে হইব।"

"আরে ব্যাটা, বইয়া ঠান্ডা খাবি। তেষ্টা পাইছে না? কুক টুক খাবি, ফান্টা খাবি, চল।"

"না দোস্ত আমি কুক টুক খাওয়া ছাইড়া দিছি, সুগার বেশী, ফ্যাট বাড়ে।"

"তাইলে দই খাবি, চল। জরিরে নিয়া কথা আছে, আইজ জরির বিয়া।"

আমি বুঝলাম যে তুষারের হাত থেকে আজ আমার নিস্তার নাই ও বাসায় আগামী এক ঘন্টার মধ্যে যাবার কোন উপায় নাই যেহেতু তুষারের গল্পের মুখরোচক আইটেম আছে আজ। জরি একটা মেয়ে যার ভালো নাম জেরিন। সে দেখতে খুবই মায়াময় হওয়ার কারণে আমাদের বন্ধুকূলের সবাই তার প্রতি দুর্বল ছিলাম অল্পস্বল্প এবং তার সম্পর্কিত আলাপ আমাদের মধ্যে প্রায়ই হতো। সবাই দুর্বল আবার সবাই যে একসাথে আলাপ করতে পারতাম তার সম্পর্কে; এর কারণ ছিল জরির সাথে আমাদের কারোরই কিছু হবার সম্ভাবনা নাই এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। ফলে তার প্রতি আমাদের প্রত্যেকের অল্পবিস্তর

সূচীপত্র

দুর্বলতা নিজেদের মধ্যে কোন ধরনের বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি কখনো। তবে জরির সাথে কিছু হবার সম্ভাবনা থাকলে অর্থাৎ সে যদি নাগালের ভেতরে থাকত তখন এমন হতো না নিশ্চিত। যাইহোক, তুষার যে জরির বিয়ের কথা বলেছিল তা শুনে কারো মনে হতে পারে বোধহয় জরির বিয়ে আজ কিন্তু তা নয়। সে হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসের নামটি বলেছিল এবং আমার জন্য তা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেনি কারণ আজ জরির বিয়ে উপন্যাসটি আমি পড়েছিলাম। ঐ উপন্যাসে যেমন জরির বিয়ে আর শেষপর্যন্ত হয় না তেমনি তুষারের মজা করে বলা কথাটার মধ্যেই ছিল আসলে জরির বিয়ে হয় নি কিন্তু ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিস হয়েছে।

তুষার আমাকে টেনে নিয়ে গেল বাঁশফুলের ভেতরে। প্রায় ঘন্টা খানেক বকবক করে গেল এবং সে অতি অসাধারণ একজন বাকপটু লোক। আমি শুনেছি অনেক অনেক কাল আগে, যখন ছাপাখানা আবিষ্কার হয় নি, মানুষ গাছের ছাল বাকলে লিখে রাখত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী। তখন লোকে কৃষিকাজ করত, আর দিনান্তে পরিশ্রম শেষে এক বুড়ো জটাধারী বট গাছের নিচে জড়ো হতো সবাই। আকাশে চাঁদ উঠত এবং সহস্র তারকারাজি অজুত ঈশ্বরের নিযুত চোখ হয়ে তাকিয়ে থাকত ধরিত্রীর দিকে। সেই সময়ে মৃদুমন্দ বাতাস বইত উত্তর দিক হতে, উত্তরে ঘন জঙ্গল, জঙ্গলের সকল সবুজ বৃক্ষের পত্রপল্লব ছুঁয়ে আসত সে মধুর গা শীতল করে দেওয়া বাতাস আর বটগাছের নিচে বসা বৃদ্ধ লোকটির সাদা দাঁড়ি উড়ত সে বাতাসে। লোকটির চোখ জ্বলজ্বল করে উঠত। বটগাছের পাশে যেসব মশাল রাখা হত, তাতে আগুনের শিখাগুলি অদ্ভুত ভাবে কেঁপে কেঁপে উঠত আর সে কম্পমান অগ্নিশিখা দেখা যেত বৃদ্ধের দু'চোখে এবং বৃদ্ধ গল্প বলে যেতেন; মায়াবী জাদুবিস্তারী এক গল্প। তাতে সমস্ত জনপদ যেন স্তব্ধ হয়ে যেত। আমার মনে হয় সেই বৃদ্ধ লোকটির গল্প বলার গুণ কিছু কিছু মানুষের মাঝে অল্প অল্প করে ছড়িয়ে পড়েছে। যুগে যুগে প্রজন্মান্তরে তা চলে এসেছে এবং আমার

মনে হয় তুষারও তার ছিটেফোঁটা পেয়ে থাকতে পারে; ফলে গল্প শুনতে শুনতে আমার যে বিরক্তি লেগেছিল তা বলছি না, এমন বললে মিথ্যে বলা হয়।

তুষারকে বিদায় দিয়ে আমি বাসায় ফিরে আসি। এসে গোছল করি এবং খাই। অতঃপর কম্পিউটার অন করে ইউটিউবে গিয়ে গান শুনতে শুনতে ভাবছিলাম কিছু একটা করা দরকার। এমন সময়ে কলিংবেল এর শব্দ আমার কানে আসে এবং আমি ঘড়িতে তাকিয়ে দেখতে পাই ঘড়ি বাজে একটা একুশ মিনিট। এমন সময়ে কে আসতে পারে ভেবে আমি কিঞ্চিৎ অবাক হই এবং হেঁটে গিয়ে দরজা খুলি এবং বের হয়ে গেটের কাছে গিয়ে দেখি গ্রিলের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে ঐ ছেলেটি, যাকে চুরি করার অপরাধে ঐ প্যান্ট শার্ট পরা লোকটি কলার চেপে ধরেছিল এবং তার বাবা জোরের সাথে একটি চড় মেরেছিল। আমি ছেলেটিকে দেখে অবাক হলাম ও জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, কী ব্যাপার? এখানে কেন তুই?"

ছেলেটি মুখ কাচুমাচু করে বলল, "বাপ আমারে বাইর কইরা দিছে।"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "বাইর কইরা দিছে তো এখানে কী?"

ছেলেটি মাথা নিচু করে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "নাম কী তর?"

ছেলেটি মুখ তুলে বলল, "তকদির।"

এমন নাম আমি আগে শুনি নি, জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে এসেছিস কেন?"

"স্যার, আমার যাওয়ার কুনু জাগা নাই।"

"জাগা নাই তাই বইলা এখানে চইলা আসবি? এইটা কোন কথা হইল? তাছাড়া তর ক্যারেক্টারও তো ভালো না, হাতটানের অভ্যাস আছে। হাতটান মানে কী বুঝস?"

ছেলেটি মাথা দুদিকে নাড়িয়ে জানিয়ে দিল সে জানে না। সম্ভবত স্কুলে যায় না তাই বাংলা ব্যাকরণের বাগধারা পড়তে হয় নি।

আমি বললাম, "হাতটান মানে হইল চুরির অভ্যাস। তর এই অভ্যাস আছে, বাজে অভ্যাস।"

ছেলেটি বলল, "এখন আর নাই স্যার।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ঠিক আছে, অন্য কোথাও যা।"

"স্যার, আমি আপনার এইখানে থাকতে আসি নাই।"

"তাইলে কীজন্যে আসছিস?"

"আমি আমার কথা আপনারে বলতে চাই। আমার মনে হইছে আপনারে বললে শুনবেন। এমন আর একজন মানুষও আমার চেনাজানা নাই।"

ছেলেটার এই কথা আমাকে তীব্র আকর্ষণ করল। আমার চোখ চকচক করে উঠেছিল নিশ্চয়ই। যে কাজটা আমি করে থাকি, নেশায় সেই কাজের উপকরণ হাতের কাছে এসে এমনি ধরা দিলে মনে আনন্দ জাগে। আমার নেশাটা অতি অবশ্যই কুৎসিত: গল্প লেখা। অন্যের জীবন অল্প অল্প চুরি করে গল্পে নিয়ে আসা- অবশ্যই কদর্যতম কাজগুলির একটি। স্বার্থপর কাজ এবং এই কাজের কর্মী হিসেবে অবশ্যই আমি স্বার্থপর। গল্পের ধান্দা পেলে মানুষের সাথে কথা বলতে থাকি। মানুষের বাচন ভঙ্গি খেয়াল করতে থাকি এবং মানুষগুলিকে নিজের লেখার উপকরণ হিসেবে দেখতে থাকি কেবলই।

ছেলেটিকে আমি বললাম, "ঠিক আছে।"

আমি গেট খুললাম। ছেলেটি ভেতরে এল। আমি তাকে নিয়ে এলাম ঘরে। ছেলেটির পরনে একটি ময়লা পুরনো শার্ট ও পুরনো প্যান্ট। আমার রুমে সে মেঝেতে বসে পড়ল। ঠিক তখনই আমার মনে পড়ল যে আমি অনেকবার লিখেছি মধ্যবিত্তরা

কাজের লোকদের বসার চেয়ারে বা খাটে বসতে দেয় না ইত্যাদি ফলে আমার ভেতরে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছিল। আমি ছেলেটিকে বললাম, "তুই খাটে বস।"

ছেলেটি বলল, "না স্যার, এইখানেই বসি। অসুবিধা নাই।"

তাঁর যখন অসুবিধা নাই তখন আর আমি জোরাজোরি করলাম না। ছেলেটার নাক ছিল খাড়া এবং তাতে আলো পড়ে যেন চকচক করছে, আমি লক্ষ করলাম।

আমি আমার কম্পিউটারের সামনে গিয়ে বসলাম। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ওপেন করলাম। মোবাইলের রেকর্ডার অন করলাম এবং ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললাম, "কী বলবি? বলতে থাক।"

ছেলেটি ইতস্তত করছিল।

আমি বললাম, "তুই সত্যিই ঐ দোকান থেকে চুরি করছস?"

ছেলেটি বলল, "জি স্যার করছি। উনি আমারে বেতন দেয় নাই, আমি বেতনের কথা বলছি সন্ধ্যায়, উনি দেয় নাই। তাই টাকা নিয়া আমি আসছিলাম।"

"তর বেতন কত?"

"এক হাজার টাকা।"

"তাইলে কি এই মাসের বেতন আর পাস নাই? লোকটা ত টাকা নিয়া গেল?"

"জি পাই নাই।"

"তর বাপে কী করে?"

"রিশকা চালায়।"

"মায় কী করে?"

"মায় নাই।"

“ভাই বইন আছে?”

“আপনা ভাইবোন নাই। সৎ বইন আছে, দুই বছর বয়স।”

“তর সৎ মা আছে?”

“জি আছে।”

“ইস্কুলে যাস তুই?”

“আগে যাইতাম, দুই কেলাস পড়ছি।”

“ছাইড়া দিলি কেন?”

“সৎ মা ছাড়াই দিছে, বাপে স্কুল ছাড়াইয়া দিল।”

“সৎ মা কি তরে দেখতে পারে না?”

ছেলেটি নিরব হয়ে রইল, তার নিরবতা হ্যাঁ বোধক উত্তর দিয়ে গেল।

আমি বললাম, “আমার ধারণা তুই আমারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে আইছস কিন্তু সেইটা কী?”

ছেলেটি বলল, “স্যার, আমি আইজ চুরি করি নাই, কিন্তু আগে কিছু চুরি করছি।”

“ধরা পড়ছ নাই?”

“জি না।”

“চুরি করছ কেন?”

“আমার বাপের বউ আমারে খাইতে দেয় না, মারে, আমারে বাইরে বাইরে থাকতে হইত, চুরি করতে হইত।”

“তর আসল মায়ের কী হইছে?”

“আরেক বেটার সাথে ভাইগা গেছে, আমার তখন দুই বছর।”

“হুম। কাহিনী কী তর? এইগুলা বলতেই কি আইছস?”

“জি, আমরার যে লাইফ, কোন কিছুই নাই স্যার।”

আমি দেখলাম ছেলেটার মুখে হতাশা, আমি তাকে অনুপ্রেরণা দিতে গিয়ে বললাম, “এইভাবে ভাবতে হয় না, সবার লাইফই এইরকম, কিছুই নাই। এই আমারে দেখ, লেইখ্যা টেইক্কা কিছু করমু বইলা আইছিলাম এই শহরে, কিন্তু নাথিং। তাও চলতে হয় আর কী।”

“আপনেরা বড় মানুষ।”

“বড় মানুষ আর ছোট মানুষ ব্যাপার না। ঘটনা হইল কত লোক ফকিন্নি অবস্থা থেকে বড়লোক হইছে। হইছে না?”

“জি।”

“তুই ও চেষ্টা করলে পারবি। চেষ্টায় কী না হয়।”

ছেলেটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, “আর কী আছে তর গল্প বইলা যা।”

ছেলেটা বলল, “আমার বাপের দুই নাম্বার বউয়ের লাইন আছে আরেকটা লোকের লগে। আমরার বস্তিতে থাকে। আমি তা জাইনা ফেলি।”

“এইজন্যই কি তরে দেখতে পারে না?”

“জি।”

“জানলি ক্যামনে?”

“একদিন রাইতে দেখছি। বাপ ছিল না ঘরে। তখন কাশেইম্যা আইসা পুটকি মারে।”

“নিজে দেখছস তুই?”

“হ, ভাবছে ঘুমাইছি। আমি জাগনা ছিলাম।”

“এরপর?”

"এরপর বাপ আইলে বাপরে বইলা দেই। বাপে পিটায়।"

"কারে?"

"তার বউরে।"

"তর বাপে বউরে ছাড়ে নাই?"

"না, আমার বাপ হইল আকাইম্মা। ছাড়ে নাই। উলটা আমারে লাত্থি মাইরা বাইর কইরা দিত।"

"তুই ঐ দোকানে কাজ পাইলি ক্যামনে?"

"ঐ দোকানের মালিক বস্তির লগের বাসায় থাকে। একদিন আমারে দেইখা কইল দোকানে কাজ করবি? আমি রাজী হই। কিন্তু মাস যায় বেতন দেয় না।"

"আর?"

"বিশ্বাস করেন স্যার ঐটা চুরি না। নিজের পাওনা টেকা নেয়া কি চুরি?"

"না।"

"আমি সেইটাই করছি।"

"তা এত লোক থাকতে তুই এইসব আমারে বলতে আইলি কেন?"

"স্যার, সবাই আমারে চোর মনে করছে। খালি আপনার চউখে চাইয়া আমি দেখছি ঐরকম কিছু নাই। আপনার চউখে মায়া ছিল, যেইটা আমি এর আগে কোনদিন দেখি নাই। তাই মনে হইল আপনারে এইসব বইলা যাই।"

ছেলেটার এই কথা শুনে আমি ভিন্নভাবে ওর দিকে তাকালাম এবং ওর প্রতি এক ধরনের মমতা কাজ করল।

আমি বললাম, "তুই আমার এইখানে থাইকা যা, টুকটাক কাজ করলি।"

নতমস্তকে ছেলেটি জানাল, “না স্যার।”

আমি পাশের আলনায় ঝুলানো প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলাম। মানিব্যাগের ভেতর থেকে একটি একশো টাকার নোট বের করে ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে ধরে বললাম, “এইটা রাখ।”

ছেলেটি দৃঢ়ভাবে বলল, “নিমু না স্যার।”

তার দৃঢ় উত্তর শুনে আমি আর নিতে বললাম না; সে উঠে দাঁড়াল ও আমাকে বলল, “কথা শেষ, এইবার যাব স্যার।”

“এখন যাবি কই?”

ছেলেটি নীরব রইল। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল তাকে আবার বলি থাকার জন্য কিন্তু এটা বুঝতে পারছিলাম যে সে রাজি হবে না। এই অল্প বয়েসের জীবনেই সে কঠিন বাস্তবতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ফলে তার মধ্যে দৃঢ়তা চলে এসেছে এবং ছেলেটির আচরণ অদ্ভুত কিছুটা আমার মনে হচ্ছিল।

আমি দরজা খুলে দিলাম। সে এগিয়ে গেল। আমি গেট খুলে দিলে সে বেরিয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। তার চলে যাওয়া কেমন যেন বিষাদময় মনে হচ্ছিল আমার কাছে। রাতের আকাশে তখন বেশ বড় চাঁদ। এদিকে ল্যাম্পপোস্টগুলিতেও বাতি জ্বলছে। রাস্তার দু'পাশের বয়স্ক গাছগুলি চাঁদের আলোকে ছিঁড়ে ভাগ ভাগ করে নিচে ফেলে দিচ্ছে আর তার ভেতর দিয়ে কেমন অশরীরী ভাবে চলে গেল তকদির। আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

জিম থেকে এসে ক্লান্ত ছিলাম। রাত জাগা পোষায় না। সকালে যেতে হয় কাজে। ফলে বিছানায় শুয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে যাই সম্ভবত এবং সেই ঘুমের মধ্যে হয়ত অদ্ভুত কিছু স্বপ্ন দেখেছিলাম, তার কিছুই মনে ছিল না যখন সকাল ন'টার এলার্মে ঘুম ভাঙে।

রেডি হয়ে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হই এবং সকাল সকালই আমাদের বিল্ডিং এর কেয়ারটেকার হালিম সরকারের সাথে দেখা হয়। সে পান খাওয়া লাল দাঁতগুলি বের করে হেসে নিয়ে বলে, “কই যান ভাই?”

আমি বলি, “অফিসে যাই।”

হালিম সরকার বলে, “আপনার বাসার লাইট ফাইট কমোডের ফ্ল্যাশ টাশ ভালো তো সব?”

উত্তর দেই, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো।”

এই সময়ে, এইসব কথাবার্তার ফাঁকে আমার চোখ যায় আমাদের সামনের বিল্ডিং এর বারান্দায়। সেখানে দেখতে পাই এস আলম সাহেবের সুন্দরী স্ত্রী বারান্দার টবে লাগানো গাছগুলিতে পানি দিচ্ছেন। তার পরনে ম্যাক্সি জাতীয় পোশাক, লম্বা চুল গড়িয়ে পড়ছে হয়ত কোমরে আর বিশাল নিতম্ব, যাকে চটি স্টাইলে বলা যায় তানপুরার মত।

আমার চোখ লক্ষ করে তাকায় হালিম সরকার, এবং এস আলম সাহেবের স্ত্রীকে বারান্দায় সেও দেখতে পায় এবং আমি বিব্রত হই ও হালিম সরকারের দিকে তাকিয়ে কথায় ফিরে আসি কিন্তু হালিম সরকার আর কথায় নাই, সে বেশ বিকৃত ইঙ্গিত করে আমার দিকে এবং হালকা স্বরে গায়, “গলায় রশি দিয়া আমায় আলগা তাকি টানেরে, আমার বন্ধু মহা যাদু জানে।”

আমি হালিম সরকারকে পিছনে ফেলে দ্রুত হাঁটতে থাকি। কিছু দূর যাবার পর একবার পিছনে ফিরে তাকাই ও দেখতে পাই হালিম সরকার লোভাতুর দৃষ্টিতে এস আলম সাহেবের বারান্দার দিকে তাকিয়ে আছে এবং এস আলম সাহেবের স্ত্রী টবে পানি দেয়া শেষ করে এসে বারান্দার রেলিঙে হেলান দিয়ে সকালের পরিবেশ দেখছেন। আমি বিরক্ত হই মহিলার আচরণে, আমার মনে হয় প্রভাত পরিবেশের চাইতে পরপুরুষের দৃষ্টি তিনি বেশি উপভোগ করেন।

আমি সামনে একটু এগিয়ে যাই আর কাকতালীয়ভাবেই যেন এস আলম সাহেবের সাথে দেখা হয়ে যায়। জগিং করতে বেরিয়েছিলেন, ফিরে আসছেন। ভুঁড়িওয়ালা এস আলম সাহেব। সরকারি এঞ্জিনিয়ার এবং যার বউ ভাগ্য ঈর্ষণীয় বলেই মনে করেন এলাকার পুরুষকূল।

এস আলম সাহেব হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে আসেন। বাঁ হাতের তোয়ালে দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ডান হাত বাড়িয়ে দেন। হাত মেলান ও কুশল জিজ্ঞাসা করেন। কুশলাদি বিনিময়ের পর আমি হঠাৎ মুখ ফসকে উনাকে জিজ্ঞেস করে ফেলি, "আপনি কি তানপুরা বাজাতে পারেন?"

এস আলম সাহেব জানান, "না, আমি খালি বাঁশি বাজাতে পারি। তবে ঘটনা হচ্ছে আপনার ভাবি গিটার শিখতে চায়। এখানে যে গানের স্কুল আছে ওখানে কি গিটার শেখায়?"

আমি বলি, "হ্যা, ওখানে শেখায়। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন কেমন ব্যবস্থা।"

এস আলম সাহেব বললেন, "যাব- যাচ্ছি করে যাওয়া হচ্ছে না। তবে আপনার সাথে যেহেতু আজ কথা বলেই ফেললাম তাহলে আজ আর মিস দেব না। অবশ্যই যাব।"

এস আলম সাহেব বিদায় জানিয়ে চললেন তার বাসার দিকে। আমি চললাম অফিসের দিকে। যাচ্ছিলাম সেই রাস্তা দিয়ে, যে রাস্তায় কাল রাতে ঐ ছেলেটির চুরির বিচার হচ্ছিল। আজ এখানে তেমন কোন জটলা নেই। অল্প দূরে অবস্থিত একটি চায়ের দোকান। আমি যেহেতু অফিসে যাচ্ছিলাম তাই ওদিকে বা অন্য কোন পাশে সচেতন চোখ ছিল না তাই প্রথম ডাকটা শুনতে পারি নি। দ্বিতীয় ডাকটা এলো বেশ জোরের সাথে,

"ভাই, ভাই, একটু দাঁড়ান ভাই!"

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি চেনা নেই জানা নেই এমন একটি লোক। আমার চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ছিল কিন্তু জিজ্ঞাসার আর সময়

সূচীপত্র

পাই নি, তার আগেই লোকটি বলল, "স্যার, আপনারে ডাকে।"

লোকটি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করল চায়ের দোকানটার দিকে। আমি ওদিকে তাকিয়ে দেখি একজন পুলিশের ইউনিফর্ম পরা লোক। কালো চশমা চোখে, খুব ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমি এগিয়ে গেলাম। পুলিশ লোকটি আমার দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালেন বলে মনে হলো। এরপর তিনি চশমা খুললেন ও জিজ্ঞেস করলেন, "কাল রাত আনুমানিক এগারোটার দিকে এখানে একটা ছেলেকে চুরির অভিযোগে ধরা হয়। তার বিচার হয়। তার উপর নির্যাতন হয়। আপনি তো দেখেছেন?"

প্রশ্নের ধরণ দেখে আমি একটু থতমত খেয়ে যাই, আমার মনে হয় গলা শুকিয়ে আসছে, কেন এমন মনে হয়েছিল বলতে পারি না, হয়ত আমি ভয় পেয়েছিলাম।

উত্তরে বললাম, "জি।"

"আপনি কী দেখেছেন বলুন।"

"আমি দেখেছিলাম একটা লোক ছেলেটাকে ধরে রেখেছে। চুরির কথা বলছে। পরে ছেলেটির বাবা এসে ওকে চড় মারে।"

"আপনার সামনেই মেরেছে?"

"জি।"

"দোকানের মালিক লোকটা কি মেরেছিল?"

"আমার সামনে মারে নি। আমি পাঁচ দশ মিনিট ছিলাম। এরপর চলে যাই।"

পুলিশের লোকটি একটি নোটবুক এগিয়ে দিয়ে বলল, "এখানে আপনার নাম ঠিকানা কনটাক্ট নাম্বার লিখে দিন।"

আমি কথামত লিখে দিলাম ও দেওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে আসলে?"

পুলিশের লোকটি আমার প্রশ্নকে পাত্তাই দিলনা। হাত দিয়ে ধুলো ঝাড়ার মত ভঙ্গি করল এবং চায়ের দোকানটাতে গিয়ে একটা সিগারেট নিল, ধরাল এবং সিগারেট টানতে টানতে চলে গেল। লোকটি চলে যাবার সময় আমি ওর ইউনিফর্মে থাকা নেইমপ্লেট দেখলাম, নাম রবিউল ইসলাম তরফদার।

আমি বেশ অবাক হয়েছিলাম। চায়ের দোকানে কয়েকটি লোক জড়ো হয়েছিল এবং পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ তারা দেখছিল। সেখানে যে লোকটি আমাকে ডেকেছিল সেও ছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে লোকটি বললাম, "কী ব্যাপার?"

লোকটি বলল, "স্যার আমাদের জিগাইতেছিলেন কাইলকার ঘটনা নিয়া। কাইল আমি আপনারে দেখছি ঐ জায়গায়। আপনি যাইতেছেন দেইখা চিইন্না ফেলি ও স্যাররে বলি, আপনে শিক্ষিত মানুষ বুঝাইয়া বলতে পারবেন। আমরা অশিক্ষিত লোক, কী বলি না বলি তার নাই ঠিক।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে। কিন্তু কাইল হইছেটা কী?"

লোকটা বলে, "ক্যান? আপনে জানেন না?"

আমি বলি, "না"

লোকটা বলে, "আপনে যাওয়ার পরে বাপ আর দোকানের লোকটা পোলাটারে বেদম পেটায়। আর একসময় ও হাত ছুটাইয়া দৌড়াইয়া গিয়া ট্র্যাকের নিচে ঝাঁপ দেয়। সব শ্যাষ জায়গাতেই।"

লোকটার কথায় আমি যুগপৎ হতবাক ও বিস্মিত হই এবং কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কালক্ষেপণ করার পরমুহূর্তে প্যান্টের ডান পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করি। দ্রুত রেকর্ডিং ফাইলগুলি দেখতে থাকি। গত রাতের ফাইলটিও সেখানে আছে। আমি তা বাজাই এবং অবাক হয়ে লক্ষ করি যে কেবল আমার কণ্ঠই শোনা যাচ্ছে, অন্য কোন কণ্ঠ নয়....।

এই গল্পটি অনেকেরই মনে হতে পারে মিথ্যা কিন্তু তা

সূচীপত্র

কখনোই নয়। শপথ সমগ্র কল্পিত দেবতাকূলের, শপথ এই ধরিত্রীর, আলো বাতাস এবং বয়ে যাওয়া সব নদীসমূহের। আমি যা বর্ণনা করলাম তা অতিশয় সত্য এবং তাতে কণামাত্রও মিথ্যার কোন অবকাশ নাই। সমগ্র ঘটনা, ছেলেটির মুখভঙ্গি, কথাবার্তা এবং তার বিষাদবিস্তার চলে যাওয়া: সকল কিছু আমার স্পষ্ট মনে আছে। এমন স্পষ্ট যে চোখ বন্ধ করলেই আমি এখনো তা দেখতে পাই।

গুরুজীবন

দীপ্তেন

"মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা। কেন যে বললাম। কিন্তু বললাম।” তোর আজ ভোগান্তি আছে রে। বললাম আর মন খুঁত খুঁত করতে লাগল।

"আপনি সর্বজ্ঞ। আপনি সব জানেন, ঠাকুর।"

"আমার আর স্বস্তি হয় না, স্বস্তি হয় না। শেষে ওকে আবার ফোন করি। তখন প্রায় রাত আটটা। বলি সুজন, তুমি বাড়ি ফির না। রাতটা অন্য কারুর বাড়ি কাটাও।"

"সবই ঠাকুরের কৃপা"

সুজন বললো, ওর দাদার বাড়ি যোধপুর পার্কে। সেখানে যাবে। আমি বললাম, “যাও।”

"ঠাকুরের আশীর্বাদ"

তো আমি বললাম “যাও। দাদার বাড়িতেই যাও। আর ও তখনই গাড়ি ঘুরিয়ে দাদার বাড়িতে চলে গেল।"

"সুজন আপনাকে বড্ড মান্যি করে, ঠাকুর মানে।"

"আর দ্যাখ, সে রাত্রেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সুজনের বাড়ি পুরো ভাসছে আর সেই শেষ রাত থেকেই সুজনের বউ মিতার পেটে ব্যাথা। একেবারে আছারি পিছারি। অ্যাপেনডিক্স না কী জানি বলে? "

"আর সুজনের দাদার বাড়ির পাশেই তো নার্সিং হোম। ডাক্তার শশী চৌধুরী থাকেন তিনতলায়। হা হা হা। পাঁচ মিনিটে ডাক্তার

সূচীপত্র

নার্স সব হাজির।অক্সিজেন,ওষুধ।"

সুজন পরে এসে পা জড়িয়ে ধরল। বললো,"ঠাকুর,আপনিই বাঁচালেন মিতাকে।" আরে! আমি বলি, "আমি কী রে? বিশ্ব জুড়ে দাবানল জ্বলছে, আগ্নেয়গিরি আর আমি একটা পুঁচকে মোমবাতি মাত্র।"

"একটা ঘাসও নড়ে না, ঠাকুর। একটা পাতাও নড়ে না। তোমার অনুমতি ছাড়া ঘাসও নড়ে না।"

সবাই খুব খুশি খুশি মুখে বসে থাকে। ঠাকুরের প্রসাদ আসে। কাগজের প্লেটে হালুয়া,নকুল দানা।

মোটা মতন মহিলা ছটফট করতেই থাকেন। তার পাশে বসা শ্যামলা রঙের মেয়েটিকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে এগিয়ে আসে। আর্ত স্বরে বলেন "ঠাকুর"।

ঠাকুর বরাভয় মুদ্রা দেন। "সমস্যা তো? মেয়ের? ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে।" জড়োসড়ো মেয়েটির মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন।

"আপনি তো সবই জানেন বাবা। ঠাকুর। আমাকে পাঠিয়েছেন অধিকারীদা। দীপক অধিকারী। গড়িয়ার।"

"ও হো। দীপক তো ? আমাদের বিল্টু।"

"হ্যাঁ বাবা। শ্যামল দত্ত আমার ভাই। পুলিশের এ সি, সাউথ ক্যালকাটা।" ঠাকুর স্নিগ্ধ হাসেন,"সবাই আসে। কত বড় বড় লোকেরা। পন্ডিতেরা। কেন যে আসেন? আমি আর কীই বা দিতে পারি?"

"বাবা, আমার জামাইএর একটা কিছু করুন। মেয়েটার যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে।" মহিলা বেশ উচ্চগ্রামে কথা বলেন। ঘরের সবাই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। মেয়েটির দিকে তাকায়। বয়স তো বেশি না। সমস্যাটা কী? নিশ্চয়ই ড্রাগ।

ঠাকুর মাথা নাড়েন। "আরে, সব তিনিই করেন। কিন্তু তোমার ভাই,শ্যামল, কিছু করতে পারল না?"

এবারে মেয়েটি কথা বলে, "ওকে সবাই মিলে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। ও একেবারে ছেলেমানুষ। ইনোসেন্ট। বাবা, খুবই সরল। ও কিছু করে নি, কিছু না।" বলতে গিয়ে মেয়েটির গলা বুঁজে আসে।সে ফোঁপায়। তাহলে ড্রাগ নয়। টাকা পয়সার ব্যাপার ? ধরা পড়ে এখন ইনোসেন্ট সাজছে। না কি কোনো মেয়ে রয়েছে? তো পুলিশে কিছু করতে পারলো না? নিশ্চয়ই পোলিটিকাল ব্যাকিং আছে। আজকাল তো সবতেই পলিটিক্স। সবাই বোঝে।

ঠাকুর খুব বিষণ্ণ হন। তার মুখ ম্লান হয়ে আসে। তিনিও ছলছলে চোখে মেয়েটির দিকে তাকান। নাতি সুশ্রী। নিশ্চয়ই ভালোবেসে বিয়ে। পাড়ার কোনো বখাটে ছোকরা। সম্পত্তি টম্পত্তি আছে কি? নাঃ! পোষাক তো সাদামাটা।

ঠাকুরের চোখে জল। সেই দেখে মেয়েটি হাউ হাউ করে কাঁদে। ঠাকুরের পা জড়িয়ে ধরে। "মিলন কিছু করে নি ঠাকুর।ও দোষী নয়। আমার গা ছুঁয়ে বলেছে। ও আমাকে মিছে বলে না"। মেয়েটি বলে আর কাঁদে।

বিজন বলে, “ঠাকুর। ও কে তড়িয়ে দিন। আহা, বড় দুঃখ।”

"হাঃ! আমি তাড়ানোর কে? কে?! যার তরী তিনিই তাড়াবেন। ও মেয়ে, অমন কেঁদো না। সাঁঝ বেলাতে কাঁদতে নেই। ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বিজন হৈ হৈ করে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, "আর কীসের চিন্তা? ঠাকুর বলেছেন ঠিক হয়ে যাবে। ব্যাস,ব্যাস।সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মা আর মেয়ে দুজনের মুখেই হাসি ফোটে।"সব ঠিক হয়ে যাবে?"

"হবে রে হবে"। ঘরে বসা ভক্তেরা জয়ধ্বনি দেয়। বিজন

বলে, “একটু আস্তে, মাধ্যমিক চলছে না?”

উঠবার আগে মেয়েটি একটু হাসে। ঠাকুরও হাসেন। "তোর নাম কীরে মেয়ে?'

"বন্যা।

ভজনের পর সবাই ওঠে। বিজন বসে থাকে। সে ঠাকুরের ডান হাত। তার অনেক কথা থাকে। "ঠাকুর, ঐ বন্যার হাজবেন্ড, মানস চিটিংএর কেসে একেবারে ফেঁসে গেছে। এমনই হাঁদার মতন কাজ করেছে শ্যামল দত্তও কিছুটি করতে পারছে না। ব্যাটা ইডিয়ট।"

"মানস? মানস মিত্র ? মানে ঐ কল্পতরুর কেসটা নাকি? কাগজে তো খুব দিচ্ছে। তারপর ঐ বুড়োটা সুইসাইড করল, সর্বস্বান্ত হয়ে। সেই কেস তো? কঠিন কেস, কঠিন কেস।"ঠাকুর বলেন "আমি বলব, মাকে বলব। বলব একেবারে ছেলেমানুষ। ভুল করে ফেলেছে। ও কে একটা চান্স দে মাগো"।

বিজন বলে,"আজ প্রণামীটা খুব কম আসল। এইভাবে চললে রোজ আর হালুয়া খাওয়ান যাবে না। হ্যাঁ"।

ঠাকুর একটু দমে যান। মাকে কতোবার বলা যায়। এতো লোকে আসে। তাদের বসার জায়গা চাই। তবলাটা ফেঁসে গেছে। শতরঞ্চিটাও পাল্টান দরকার। রোজ রোজ কাগজের কাপ প্লেট। সবতেই পয়সা লাগে। আরে শুকনো ভক্তিতে কি সংসার চলে?

রাত্রে খাবার টেবিলে শুভ্রা বলে,"মালা ধরেছে বন্ধুদের সাথে এক্সকারশনে যাবে। বুলু, টুম্পা, সুদত্তা, ওরা সবাই যাবে। চার হাজার টাকা তো লাগবেই। আর গীজারটাও তো আর ফেলে রাখা যায় না। শীত তো এলো বলে। "

" মাকে তো বলি। তো মা বলে, বেশ তো আছিস। খাচ্ছিস দাচ্ছিস। কীসের অভাব তোর?'

"বাবা,আমি এবার যাবই। আমি ছাড়া সব বন্ধুরা বেড়াতে

যায়। এক আমিই কলকাতা ছাড়া আর কিছু দেখি নি। কোত্থাও না" বলতে গিয়ে মালার কান্না পায়।

মনোজ ঠাকুর মুষড়ে পড়েন। মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে রেলওয়ের চাকরি ছাড়লেন। শুভ্রা তো কতবার বলেছিলো, আরো তিন বছর টেনে যাও, কুড়ি বছরের কোটাটা কমপ্লিট কর। তবে তো পেনশন মিলবে। কিন্তু কী ঘোরের মধ্যে থাকতো ঠাকুর। মনে হত যেন বন্দীশালায় আছেন। দমবন্ধ হয়ে আসত। সহকর্মীদের বিদ্রুপ বেশিদিন চলে নি। সবাই একটু ভয়ই পেত। মা কালীর ভক্ত। তো মাকালী ঠাকুরটি তো তেমন সাদাসিধে কিছু নন। রক্তখেকো। তখনো কিছুটা ফিসফাস,সন্দেহ, কানের বাইরে ঠাট্টা, কিন্তু অফিসে ছুটির পর নিরিবিলিতে জাঁদরেল অফিসার থেকে গোঁড়া বামপন্থী নেতা, সবাই আসতেন, চুপিচুপি।

"এই যে মনোজ বাবু, আপনার মাকে জিজ্ঞেস করবেন ? আপনি তো প্রত্যেক শনিবারই - ইয়ে - কী বলে, মায়ের সাথে কথা বলেন। তো একবার আমার মেয়ের কথাটাও -হ্যাঁ,জিজ্ঞেস করে নেবেন? কেমন? আফটার অল বিদেশে বিয়ে দিচ্ছি। আর, এই পুজোটুজো লাগলে বলবেন। খরচা-টরচা তো আছেই।"

এমনি করে সবাই। কত সমস্যা লোকের।

ইউনিয়ন নেতা সুবীরদা কড়া মার্কসবাদীই শুধু নন, দারুণ আঁতেল। সিনেমা, নাটক, সাহিত্য। এক বিকেলে উনিও এলেন। বেশ যেন তাচ্ছিল্য করে বসলেন। মনোজ হাসল, "মা বলেছিলেন"

"কী বলেছিলেন?" থতমত খায় সুবীর।

বলেছিলেন, “একজন আসবে। তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ভালো নেই। সে আসবে।"

একেবারে হতভম্ব হয়ে যায় সুবীর। তার মুখে আর কথা সড়ে না। পকেট থেকে একশো এক টাকা বার করে দেয়। কাঁপা হাতে মনোজের হাতে গুঁজে দেয়,"পুজো দেবেন। আর জানতে চাইবেন। মানে কী দাঁড়াবে। শেষ পর্যন্ত।"

২

পোশাকি নাম মনোজ, সেই থেকে কালী মনোজ আর শেষে শুধুই ঠাকুর।

ছোটোবেলার থেকেই একটু আনমনা। খুব পড়তে ভালোবাসতেন ধর্মগ্রন্থ। একেবারে বুঁদ হয়ে থাকতেন। কিন্তু ধর্মভীরু বা আচারী মানুষ তেমন ছিলেন না। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সুর্য্যস্ত দেখতেন। কখনো কখনো তার মনে হয়েছে পশ্চিমের অস্তাচলগামী সুর্য্যসাক্ষী বকের দল তাঁকেও মুর্ছিত করবে, কিন্তু তেমন কিছুই হয় নি।

বিয়ে করলেন। দুটি ছেলে মেয়ে। মল্লিকা আর সার্থক। এই ছেলের জন্মের পর থেকেই যেমন তার ধর্ম ভাব আরো জোরালো হয়ে উঠলো। ক্রমশই তাঁর মনে হতে থাকলো কালী যেন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। দিনে রাতে শয়ন স্বপনে এক নিশির ডাকের মতন। মাঝ রাতে ঘুম ভাঙিয়ে কালী ডাকতেন "আয় আয়"।

পাশে শুয়ে শুভ্রা। পাশের ঘরে মালা আর টুবলু। মাথার উপরে ঘড়ির অবিরাম টিক টিক।রাস্তার ধারেই শোবার ঘর। শুনতে পান গভীর রাতেও কাদের কথা বার্তা।গাড়ী যাওয়ার শব্দ। টের পান খুব তীক্ষ্ণ ভাবে জেগে আছেন, সব ইন্দ্রিয় টান টান সজাগ। চোখে ঘুমের রেশ পর্যন্ত নেই। নিশুতি রাতের সব শব্দ স্পর্শ গন্ধ রূপ টের পান।খাট থেকে উঠে বারান্দায় দাঁড়ান।বড় রাস্তার থেকে সামান্য দূরে তাদের বাড়ী। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেন ঝম ঝম করছে মধ্য রাত। সামনের ল্যাম্প পোস্টের পাঁশুটে হলুদ আলো পড়ে আছে বন্ধ দোকানের পাশে।

শিবুর পানের দোকান। তার পাশে ছোটো দোকানে রুটি আর মাংস তৈরি হয়। রাত বারোটা পর্যন্ত কী ভীড় কী ভীড়! তারপরেই হঠাৎ করে নিঝুম হয়ে ওঠে পাড়া। মাতালেরা ঘরে ঢোকে। শুধু মাঝে মধ্যে শোঁশোঁ করে রাতের ট্যাক্সি ছুটে চলে। দুঃস্বপ্ন দেখে মাঝে মাঝে ভুক ভুক করে ওঠে নেড়ি কুকুর।

সিগারেট ধরাবেন কি না ভাবছেন মনোজ আর তখন সেই সময়েই ঘটনাটা ঘটে গেল।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালেন মনোজ আর তখনই আকাশের নিশ্ছিদ্র কালো তাকে গিলে ফেলল। চরাচর জুড়ে এক অসীম আঁধার তাকে ডুবিয়ে দিতে লাগল অতল কালো সাগরে।

ভয়ার্ত মনোজ প্রাণপণ চাইছিলেন সেই কালোর বন্যার থেকে মুক্তি পেতে, কিন্তু তার চোখ মুখ নাক দিয়ে গল গল করে ঢুকে পড়ছিল সেই কালো। তার রক্তে। তার কোষে। তিনি টের পাচ্ছিলেন সেই অবিরাম কালো তার মগজের সব কটি কোষকে আচ্ছন্ন করছে।তার জিভেও সেই কালোস্বাদ। তার শরীরে চামড়ায়,চামড়ার নিচে পেশী,ধমনী শিরা,সর্বত্র বয়ে চলেছে কালোর স্রোত। বিশ্বজগত থেকে আর নিজেকে আলাদা করে ভাবতে পারছিল না মনোজ। সেই চূড়ান্ত মোহের মাঝেও খুব ক্ষীণ একটা আলো ছিল,আলোর সূক্ষতম বিন্দু, তার মনের গহীন। এই বিন্দুতম আলোই টিকিয়ে রেখেছিলো মনোজের অস্তিত্ব, মনোজের চেতনা। অনুভব করলেন কেউ তাকে স্পষ্ট আদেশ করলেন "আয়"।

তারপরেই নিমেষে আর এক ম্যাজিক। পলকে সম্বিত ফিরে পেলেন মনোজ। আবার সে ফিরে এল তার পরিচিত দুনিয়ায়। দেখলো নিঃসাড় রাজপথে কিছুটা দূরে থামল একটা ট্যাক্সি। কে যেন নামল হাতে স্যুটকেস নিয়ে। ঘটাং করে ট্যাক্সির মিটার বদলের আওয়াজ। শুনল, ঘুম ভেঙে উঠে বসা সজাগ কুকুরের জিজ্ঞাসু ঘেউ ঘেউ। সামনের বাড়ির তিন তলার বাথরুমে আলো জ্বলে উঠল। আর একটা প্যাঁচা উড়ে গেল নিঃশব্দ ডানায়।

মনোজ আবার শুনলেন সেই অমোঘ নির্দেশ "আয়"।

মনোজ প্রতিশ্রুত হন। আসব মা। আসব। তোমার কাছেই থাকব।

৩

না, প্রথম দিকে কেউই খুব একটা পাত্তা দিত না, তবে ইয়ার্কি মেরে উড়িয়েও দিত না। এক তো মনোজের সততা নিয়ে কারুর সন্দেহ ছিল না, তায় সকলেরই তো ছেলেপুলে নিয়ে সংসার। না জেনে বুঝে কখন কোথায় অপরাধ হয়ে যাবে। ঘাঁটিয়ে লাভ নেই রে বাবা। তাই মনোজের সারাদিন কালী নিয়ে মেতে থাকা খুব একটা বাধা পায় নি। পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়, সহকর্মী। শুভ্রাও মেনে নিয়েছিল। এমনিতে অসুবিধে তো কিছু নেই। সংসার তো ঠিকই চলছে। পে কমিশনের রিপোর্টে মায়না যথেষ্ট বেড়েছে। সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা জীবন। মদ,গাঁজা বা রেসের মাঠ নয়। কোন অভব্য পাগলামি নয়। শুধু পুজোই তো করে আর ধ্যান। আর কালী ঠাকুর বলেও কথা। একটু সমীহ করে চলাই তো উচিৎ। না?

আর বিজন? সে ঘর সংসার করে নি। অথবা করেছিল। প্রশ্ন করলে একেক দিন একেক উত্তর দেয়। কখনো বলে বউ মরে গেছে,কখনো বলে কোনোদিন বিয়েই করে নি। একদিন বলেছিলো মাওবাদী রাজনীতি করতে গিয়ে বহুদিন জেলে ছিল। আসলে সত্যি আর মিথ্যে,কল্পনা আর বাস্তবে মিলিয়ে বিজনের খাপছাড়া বাউন্ডুলে জীবন ঠিক ধরাবাঁধা অতীত,বর্তমান,ভবিষ্যতের নামতা ধরে চলতো না। সরকারি কাজ করে, তাই সময়ের অভাব নেই। মনোজের অফিসে প্রায়ই আসত। কোন সূত্রে? কার বন্ধু ছিলো? বিজনও জানতো কি না বা মনে রেখেছিলো কি না কে জানে।

মনোজের উপর প্রতি শুক্রবার রাতে কালীর ভর হয়ে শুনেই লাফিয়ে চলে এলো। "দাদা,সত্যি?"চোখ দুটো চক চক করে ওঠে উৎসাহে।"এই তোমার পা ধরে রইলাম। তোমাকে আর ছাড়ছি না"।

বিজন সেই থেকে নিত্যসঙ্গী। বলে, “রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ছিলেন বিবেকানন্দ, আর আমি হলাম তোমার।”

অফিসের বিশ্বাসদা খুব চুপচাপ নির্বিকার মানুষ। পড়াশুনা

করেন। তার কাছে গিয়ে মনোজ জানতে চাইত দেবীকথা। মার্কেন্ডেয় পুরাণ, দেবী ভাগবত। কালিকা পুরাণ। কী ভাবে অমিত শক্তিধারী মাতৃদেবীকে শিবঠাকুরের সাথে বিয়ে দিয়ে সংসারী গৃহিণী করা হল। রুদ্রাণী অসুরদলনী লোলজিহ্ব শক্তিমূর্তি হল ঘরের মেয়ে। বাপের বাড়িতে আসছেন। নবমীর দিন কান্নাকাটি। অভিমান। গিরি এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না।

বিশ্বাসদা বলেন অমন ভয়ংকরী মূর্তি আমাদের হজম করা মুশকিল। তাই আস্তে আস্তে আমরা তাঁকে সংসারে বেঁধে ফেললাম। বেশ একটা গিন্নিবান্নি রূপ।

তারপর মনোজের দিকে তাকিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলায় বলেন "আপনিই খুব লাকি মশাই, ভাগ্যবান। এমন কিছুর উপর এতটা বিশ্বাস রাখতে পারেন!"

মনোজ সায় দেয়, “কালী আমার সব। তাঁর চরণে সব দিয়েছি। যেখানে পারিনি সেইখানে এখনো হয়ে ওঠেনি। সেটা আমার দুর্বলতা। চেষ্টা করি। আরো কাছে যেতে। আরো। মায়ের কোলে বসতে। এ জন্মে না হোক, কোনো এক জন্মে তো পারবোই"।

"তাহলে আপনি পরজন্মও বিশ্বাস করেন"?

"না। ভাবতে ইচ্ছে করে। তাই বিশ্বাস করি। আসলে আমি কালী ছাড়া আর কিছুতেই বিশ্বাস করি না"।

৪

বিজন বলে "আমারে দীক্ষা দেন"।

মনোজ অবাক হয়ে যান। সে কী কথা? আমি কী গুরু নাকি? আমি তো একজন ভক্ত। তুমিও তাই। কিন্তু বিজন নাছোড়বান্দা। না, আপনাকেই গুরু মানি। শেষে হাউ হাউ করে কাঁদে। সাতান্ন বছর বয়স হল। কোথাও শিকড় নাই। কিছু নাই। বাড়ি আছে, ঘর নাই। ঘর আছে তো সংসার নাই। বাঁচতেই ইচ্ছা করে না। গুরুমন্ত্র পেলে তরে যাই।

"দাঁড়াও। রাত্রে মাকে জিজ্ঞেস করে দেখি।" বলে মনোজ আর তখনই চোখ পড়ে দেওয়ালে সাঁটা নীল রঙের ছাঁচের মাটির কালীর মুখের উপর। নিতান্ত ঘর সাজানোর উপকরণ। কালো রংটা ঠিক অতটা জমে না। একটু উগ্র লাগে। তাই নীল রং। ফুটপাথে ঢেলে বিক্রি হয় আরো ছাঁচের মূর্তির সাথে।

শিউড়ে উঠলেন মনোজ। স্পষ্ট দেখলেন, দুই চোখ ভরে স্পষ্ট দেখলেন মনোজ। দেখলেন মাটির তৈরি মায়ের মুখে স্মিত সম্মতির হাসি, চোখ দুটোয় ঝিলিক দিলো কৌতূক আর স্নেহ। মিলিয়ে গেল মুহূর্তেই। মনোজের সারা শরীরে যেন বিদ্যুতের এক হলকা বয়ে গেল। সময় স্থির হয়ে আছে। রুদ্ধশ্বাস মনোজ বিস্ফারিত নয়নে আবার দেখে মাটির ঠোঁট স্ফুরিত হল। অস্ফুট স্বরে বলল "আচ্ছা"।

বিজন চোখ বুঁজে তার পায়ের কাছে বসে। সে কিছু দেখেনি। সে কিছু টের পায় নি, কীভাবে মনোজের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব থর থর করে কেঁপে উঠল। হৃৎপিন্ডের গহীন থেকে রক্তোচ্ছ্বাস উঠে আসল, ধমনীতে বয়ে গেলো অবিশ্বাস্য তরঙ্গ।

সেদিন সারা রাত মনোজ জেগে রইলেন। মনের মধ্য থেকে ক্রমাগত চিৎকার করে প্রশ্ন করে গেলেন, "আমার চোখের ভুল? না কি তুমি সত্যিই দেখা দিলে? আমি ভুলে দেখি নি তো? সত্যিই কি এসেছেলে? এসেছিলে?"

কিন্তু আর কোনো উত্তর পান নি তিনি।

৫

শুভ্রা ক্লান্ত বোধ করে। "একবার সংসারের দিকে তাকাও। ছেলেটার তো লেখাপড়ায় কোনো মন নেই। আর টাকাও তো কিছু আসছে না"।

"এটা তো আমার কেরিয়ার নয়। প্রফেশন নয়। বিশ্বাস করি। তাই করি। আর টুবাইএর তো এখন খেলারই বয়স। আরেকটু

বড় হতে দাও। দেখবে পড়ায় ঠিক মন আসবে"।

“আর পাঁচটা বাড়ির মতন স্বাভাবিক বাড়ি তো আমাদের নয়। আমাকে একা একাই সব করতে হয়। ঘরের, বাইরের। সব কাজই। মালার পেরেন্ট টিচার মিটিং’এ প্রিন্সিপাল তো সরাসরি বললেন, আপনার স্বামীর যতই প্যাশন থাকুক ধর্ম কর্মে, নিজের মেয়ের প্রতি দায়িত্বও তো রয়েছে"।

”প্যাশন?" আত্মগ্লানিতে মুখ বেঁকে যায় মনোজের। এই অজানা অচেনা নেশার টানে সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়ে মাঝ দরিয়ায় ঝাঁপিয়েছেন। সুখের চাকরি,স্বস্তির জীবন, সবই ছেড়েছেন অক্লেশে। এখন মেয়ে ক্লাস টুয়েলভে, ছেলে সেভেনে। মেয়ে যদি ফাইন্যাল দিয়ে ব্যাঙ্গালোরে পড়তে যেতে চায় বা পুণেয়, তাকে কী বলবেন মনোজ? টাকা নেই? এডুকেশন লোন'ও নেবার ক্ষমতা নেই?

কালীকে প্রশ্ন করলে উনি বলেন, “কেনো রে? এতো লোভ কীসের?আমি তো রয়েছি তোর আপদে বিপদে। আটকাচ্ছে কি কোনো কিছু?”

জীবন মানেই তো লোভ। ভায়ের থেকে ভালো করব, বাবার থেকে উঁচুতে উঠব, সবাইকে ছাপিয়ে যাব। এই সব লোভ। এই সব আকাঙ্খা। কালী মায়ের চরণে ঠাঁই নিলে লোভ লালসা বর্জন করতে হয়। হয়তো। কিন্তু মনোজ যে সংসারের আঠায় আটকে আছে।

সন্ন্যাসীর তো নয়, মনোজের তো শহুরে জীবন। লোকে ভক্তি করুক, শ্রদ্ধা করুক, ইলেকট্রিসিটির বিল ঠিক সময়ে না মেটালে লাইন কাটা যাবে। গ্যাসের দোকানে তাগাদা না দিলে গ্যাস মিলবে না। বাড়ির জিনিস খারাপ হলে ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার আসতেই চায় না। দোকান থেকে প্রায় টেনে নিয়ে আসতে হয়। ভক্তেরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মনোজের মোবাইলের নাম্বার চায়। একান্তে প্রশ্ন করবে।

শেষ রাতে এখনো ঘুম ভেঙে যায় মনোজের। আতংক। আজ জুটেছে, কাল কী হবে, ভাবের ঘরে শনি। ছেলে মেয়েরা বড় হচ্ছে, তাদের চাহিদার আর শেষ নেই। সূয্যি উঠবার আগেই উঠে পড়েন মনোজ। ঠাকুর নমস্কার করে একবার ঘুমন্ত ছেলে মেয়ের মুখ দেখেন তিনি। টুলটুল করছে দুটি ফুল যেন। মনটা প্রশান্তিতে ভরে যায়। সব সময়েই অসহায় মনে হয় নিজেকে, "পারবো তো ওদের সুখী রাখতে? জীবনের পথে দাঁড় করিয়ে দিতে?" তারপর ছুটি,ছুটি।

ছেলে, মেয়েকে ছাড়া নিঃশ্বাস নিতে পারে না মনোজ। বার বার মনে হয় কী মায়ার বাঁধনে ফেলেছেন কালী তাকে। অনুযোগ করলে মনে হয়, এই তো মায়ের পরীক্ষা।বলছেন বেছে নে। একদিকে আমি আর অন্যদিকে সব কিছু। আমার হাত ধরলে তোকে সোনা হীরে সব দিতে পারি আবার কিছুটিও না দিতে পারি। তাও, অহেতুকি ভালোবাসায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবি? সেই সাহস আছে? আমাকে ভালোবাসার বিশ্বাস ? দেখি তোর ভালোবাসার জোর।

আবার মা বলেন, তোকে আমি রক্ষা করি। তুই আমার সন্তান। তোর কীসের ভয় ? আমার ভক্ত পিশাচেরা তোর পাশেই থাকে সর্বক্ষণ।

মনোজ জানেন। টের পান। গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে তিনি দেখেন তার দুই পাধে সুবিশাল দেহের দুই পার্শ্বরক্ষী। এও ও জানেন, তাদের কেউ দেখতে ভায়। আর কেউ না। ভাবলেশহীন মুখে দুই পাষাণ খন্ডের মতন তুই পিশাচ রক্ষী। মনোজের বিপদ হলেই বা তার অঙ্গুলি নির্দেশেই এই পিশাচেরা ছিঁড়ে ফেলবে তার শত্রুদের। সে যেই ই হোক।

কিন্তু মন মানে না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এও হোলটাইমার ভক্ত। সে ও তো আজ প্রায় ছয় বছয় হয়ে গেল। ঘর ভেট ও দক্ষিণার টাকা যা আসে সেটুকুই ইনকাম। ব্যাংকের টাকা ভাঙিয়ে তো আর চলবে না। টেনে টুনে সংসার চলে। জমার ভাঁড়ার শুন্য।

সবাই চায়। সবাই। এক ভক্ত এসে প্রশ্ন করে দুটি জমির খোঁজ পেয়েছে, তো কোনটি কিনবে? হেঁ হেঁ হেসে একশো টাকা পায়ের কাছে রাখে। "মাকে একবার জিজ্ঞেস করবেন কেমন? সারা জীবনের সঞ্চয়, ভুল ডিসিশন যেন না নিয়ে ফেলি"। আরেকবার একজন খুব কাতর হয়ে প্রশ্ন করেছিল, "ওয়েটিং লিস্টে নাম্বার তিন,চার,পাঁচ,ছয় - কনফার্মড হবে তো?" মনোজ অবাক হয়ে তাকালে প্রশ্নকর্ত্তা লজ্জা পান, মাথা নীচু করে বলেন,আসলে দিল্লী যাওয়াটা খুবই জরুরী। প্লেনের টিকিট নিতান্তই কাটতে হলে ফেলে রাখতে তো পারব না। এইসব।

এমএলএ সাহেবের আসবার সময় হয় না। কিন্তু খোঁজ রাখেন ঠিকই। মায়ের আশীর্বাদের জন্য তিন নম্বর চামচাকে সাড়ম্বরে পাঠান হাজার টাকা দিয়ে।

তাও, দু একজন আসেন যাদের কোনো দাবি নেই। শুভ্রকেশ নির্মলবাবু নিয়মিত আসেন। প্রায় রোজ। কখনো প্রশ্ন করেন না। এক বাদলাদিনের ফাঁকা ঘরে মনোজ তাকেই প্রশ্ন করেন, আপনি নিয়মিত আসেন। কিন্তু কিছু জানতেও চান না। আপনার জানবার কিছু নেই?

নির্মল বাবু সোজা সাপটা উত্তর দেন। "ছেলে পুলে নেই। গিন্নী সন্ধ্যা হলেই টিভি খুলে বসেন। দুজনের কারুর মুখেই কথা নেই।যৌবন কাটিয়ে দিলাম কাজ পাগল হয়ে। অবসর নেওয়ার সময় দেখি আমার না আছে সংসার না আছে বান্ধব। একটাও সন্ধ্যা কী করে কাটাতে হয় সে আমার জানা নেই। তাই আপনার কাছে এসে বসে থাকি। কত লোক আসে। তাঁদের কথা শুনি। সময়টাও কেটে যায়। প্রফেশনাল মানুষ। মাস পহেলাই দু হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়ে দেন। প্রতি মাসে।

মনোজ মাকে ডাকে আকুল হয়ে। "মা,মা, মাগো। এরকমই কি চলবে? সংসারের খুঁটি নাটি কত চিন্তা, কত আপদ বিপদ। তোমাকে মাথায় রেখে সব ছেড়েছি। এখন কী ভাবে নিজেকে বোঝাব সেই রাতে যা ঘটেছিলো, সে সত্যি, সত্যি, সত্যি। কোনো

হ্যালুসিনেশন নয়?”

"বিশ্বাস হয় না? আমাকে বিশ্বাস করিস না?"

"তোমাকে বিশ্বাস করতে না পারলে কি নিঃশ্বাসটুকুও নিতে পারতাম? আমার আর কিছু দেওয়ার নেই। যেটুকু ছিল, মধ্যবিত্তের আধুলি আর ছেঁড়া কাঁথা - সবই দিয়েছি। সব। সব। আর পিছন ফেরার উপায় নেই। আমি বসেছি জগৎ জোড়া বাঘের পিঠে। আর নামতে পারব না। নামার জমিটুকুও নেই।” মা অভয় দেন। বলেন, “আছি,আমি আছি। তুই আমার ছেলে। কেনো চিন্তা করিস?”

মনোজের সারা শরীর কালীময় হয়ে গেছে। মনে হয় তার সব কটি কোষে বোধ হয় মায়ের নাম। তাও কালী সাগরে ডুব দিয়েও মাঝে মাঝে বিন্দুতম সন্দেহ থেকেই যায়। কোনোদিন ঘুম ঘোরে অবচেতনের কোন গহীন আনাচ কানাচ থেকে এক নিদারুন ত্রাস এসে মনোজের চুল ধরে ঝাঁকিয়ে তোলে। “মা,মা, এসব সত্যি তো?” মনোজ আকুল হয়ে প্রশ্ন করে। “এই যে সারাদিন তোমার সাথে কথা বলি, এ সব সত্যি তো?” মনোজ শুনতে পান মায়ের খিল খিল হাসি, “বোকা ছেলে। এখনো আমায় সন্দেহ করিস?” মনোজ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে যান।

৬

কিন্তু সংসারের চাকা তো আর চলে না। সংসারের থেকেও এক সন্ন্যাসী। আর টাকা পয়সা ছাড়াও আরো কত দায় থেকে যায়। লৌকিকতার,সামাজিকতার। ছেলে মেয়ে চায় মা বাবার সাথে বেড়াতে যেতে - যেরকম হাজারটা লক্ষটা পরিবারে যায়। ছেলে মেয়ে শুভ্রা চায় একটু নিরিবিলি সন্ধ্যা। প্রতি সন্ধ্যায় শ্যামা সংগীত,ভজন, আলোচনা, ধুপ,ধুনো। সারাদিন যখন তখন লোক চলে আসে। যেন এক পাব্লিক প্লেস। যার যা খুশি কারণে আসে।

ঝাঁকড়া চুলের ছেলেটি পরপর তিনদিন এলে মনোজ তাকে প্রশ্ন করেন, কী জানতে চায় সে। "নাথিং" হেলায় উত্তর দেয়

ঝাঁকড়া চুলো। "এই যে ঘটে চলছে নানান সিনারিও। এটা একটা পার্সোনাল থিয়েটার। সেটাই" মনোজ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটি বলে, "এও এক টাইপের এক্সপেরিমেন্ট। কতো ক্যারেকটার আসে। সো মেনি স্টোরিস।আই জাস্ট লাভ দিস।”

মনোজের অপছন্দ হয়। তার বৈঠকখানা কি সার্কাসের ময়দান। শ্রদ্ধা নেই তো, আস কেন? অসন্তুষ্ট স্বরে বলে, "ভাই, তোমার জীবনেও তো থিয়েটার কিছু কম নেই। সেই জন্যেই তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াও। মা বাবার কাছে মুখ দেখাতে পারো না। মুহূর্তে ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়, যেন ভূত দেখেছে। যেন তার সারা গায়ে বিদ্যুতের চাবুক। যন্ত্রণায় মুখ বেঁকে যায় ছেলেটির। সে প্রায় দৌড়ে পালিয়ে যায়। পিছন ফেরে না।

বিজন হাসে, "ঠাকুর, তুমি তো সবার মনের মধ্যিটুকুও দেখতে পাও। কারুর কথা গোপন থাকে না। আমার বুকের ভিতরটা কি দ্যাখো? আমি তো আর মাকে ছুঁতে পারবো না, তাই তোমাকে ধরেই বসে থাকি।”

কিন্তু একতিল সন্দেহ থেকেই যায়। কখনো কখনো মনোজ ভাবেন আমি সবার মনের কথা বুঝতে পারি। সব টের পাই। আবার চমকে যান যখন ভাবেন কী আছে শুভ্রার মনে? বা টুবাই কী ভাবছে? গতবার বর্ষায় মালা জলে আটকে গিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে রাত দশটা পর্যন্ত, কোনো খবর নেই। মনোজের ফোনে চার্জ নেই, তায় লোডশেডিং চলছে। কিন্তু সেই দারুণ দুশ্চিন্তার সমায় মা কালী তো কোনো আশ্বাস পাঠান নি। আর অত চিন্তায় তখন মায়ের নাম জপ করতেও ইচ্ছা করছিল না মনোজের।

আসে, ভক্তেরা আসে। কিন্তু সবাই তো ছাপোষা ঘরের মানুষ। তারা টাকা পয়সা দেয়। ঐ প্রণামী আর কী। তার অনেকটাই তো খরচা হয় রোজ সন্ধ্যাবেলার সৎসঙ্গে। যা বাকি থাকে তাতে সংসার চলে নিতান্ত ঘষটে পিষটে। জমা তো কিছু নেই। কখনো কোনো বিপদ হলে কোথায় হাত পাতবেন মনোজ? তেমন নামকরা বড় মানুষ তো কেউ আসে না। মাঝে মাঝে কোনো সুখবর পেলে

ভক্তেরা মোটা টাকা দেন। কিন্তু সেও তো অনিশ্চিত। অনিয়মিত।

নিজেকে বড্ড নির্বান্ধব, একাকী মনে হয় মনোজের। কী এক বাঁধনে ধরা পড়ে ছটফট করছেন এই না-সংসারে। এক গোড়ালি জলে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছেন উজানে ভেসে যাওয়ার। মা কালী শুধু সেটুকু সুতোই ছাড়েন যতটুকুতে নাকটা জলের উপর রাখা যায়। টাকা ছাড়াও স্ত্রী-সন্তানের কতো চাহিদা থাকে। স্বামীর কাছে, বাবার কাছে। তারা সাহচর্য চায়। এও তো এক ক্ষুধা। টুবাই ছুটে এসে বলে, “বাবা, দেখে যাও। ইন্ডিয়ার কী কামব্যাক। অস্ট্রেলিয়াকে ছাতু করে দিচ্ছে। দেখবে এসো টিভিতে।” বলেই বাবার ভাবলেশহীন মুখে, কষ্ট করে এক চিলতে হাসির দিকে দিকে তাকিয়ে “ওহো” বলে আবার নিজেদের ঘরে চলে যায়। নিরুৎসাহ হয়ে।মনোজ আবার মর্ম বেদনায় ভোগে। পারছি না,পারছি না। আমি এক সম্পূর্ণ ব্যর্থ বাবা।

৭

নির্মল বলেন, “আপনি ডানদিকের বুকে বার বার হাত বোলান। লক্ষ্য করেছি। মনে হয় না তো মুদ্রাদোষ। কোনো ব্যাথা বেদনা আছে কি?”

"না। একটু চিনচিনে ব্যাথা। আজকাল দেখছি মাঝে মাঝেই চাড় দিচ্ছে। তবে ডানদিকে তো আর হার্ট থাকে না। আর মা রয়েছেন। চিন্তা কীসের?"

সেই নির্মলও হঠাৎ আসা বন্ধ করে দিল। প্রায় এক মাস। এখন তো রীতিমত নিয়মিত হয়ে গেছেন। বিজনকে ঠাকুর বলেন, “এক বার খোঁজ নিও তো। সুহাস গুপ্তেরা ওদেরকে চেনে।”

বিজন খুব খুশি হয়ে জানায়, বন্যা, সেই যে শ্যামল দত্তের বোনঝি। কল্পতরুর কেস। তার হাজবেন্ডের কেসে যে অ্যাপ্রুভার ছিলো সে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। এখন কেস অনেকটাই গুবলেট। বন্যা ফোন করেছিল। বলল,সবই ঠাকুরের কৃপা।

রাত্রে কালীর কাছে নির্মলের খোঁজ চান মনোজ। কিন্তু কোনো উত্তর পেলেন না। তবু শেষ রাতে হঠাৎ ঘুম ভাঙল মনোজের। শুধু মনে থাকল স্বপ্নটা নির্মলকে নিয়ে। এবং কী জানি, ভালো কিছু নয়। কিন্তু আর কিছু মনে নেই।

সাড়ে আটটা নাগাদ বাকিরা উঠে গেলে মনোজ ঐ নির্মলের সাথেই, আড্ডা বললে আড্ডা, কিছু গল্প সল্প করেন। যদি বলেন বন্ধুত্ব,তো তাই। দুজনের দিক থেকেই। সদ্য রিটায়ার্ড এই মানুষটি কথা বলেন চিবিয়ে চিবিয়ে। মাঝে মাঝে দু একটা বেফাঁস বক্রোক্তি করতেও ছাড়েন না। বলেন সারা জীবন কেরিয়ারের পিছনে ছুটে লোকেদের হেনস্থা করেছি, কড়া মেজাজ দেখিয়েছি। অনেকের ক্ষতিও করেছি। নির্বিবাদে। আর এখন চাকরিও শেষ। ভয়ে থাকি বাকি জীবনের জন্য। কী ভাবে কাটাবো সময়। সময় আমাকে গিলে খাচ্ছে।

মনোজ বলে,আপনি ধর্মে মতি দিন।

"পারব না। কোনোদিনই বিশ্বাস করি নি। এখনো সময় কাটানোর জন্য মাকালীকে বিশ্বাস করতে পারব না। আপনি তো খুব লাকি। আপনার এতো বিশ্বাস, এতো গভীর বিশ্বাস।”

এই কথা আমাকে আগেও বলেছিলেন একজন। আফিসের বিশ্বাসদা। বলেছিলেন, “আপনি খুব লাকি। মায়ের উপর এরকম আস্থা রাখতে পারেন।"

সেই নির্মল, আসছে না এক মাসের বেশি।

৮

সেই নির্মলকে দেখে চমকে গেলেন মনোজ। চেহারা তো একই রকম রয়েছে। কিন্তু মনোজের মনে হল শুধু শরীরটাই রয়েছে। ভিতর থেকে কেউ যেন শুষে নিয়েছে অন্তঃসার। শুধু খোলসটুকু পড়ে আছে।

সবাই চলে গেলে নির্মল কাছে আসে। সেই নির্বিকার স্বরে

বলেন, "আমার স্ত্রী। সেরিব্রাল। ডাক্তার ডাকার সময়টুকুও পাই নি। নো ফ্যামিলি, নো ফ্রেন্ড সার্কল।কোনো নেশা নেই, সখ নেই। কোনো অ্যাটাচমেন্টই নেই। আমার লোনলিনেস ইস নাউ টোটাল।”

"কেন খবর দিলেন না আমায়?"

"কী করতেন? আপনার কালী মাই বা কী করতেন?"

"কিছু না পারি,আপনার হাতটা ধরতাম। পাশে দাঁড়াতাম। আপনার মনে হত পাশে তো কেউ আছে।"

"একাই নিয়ে গেলাম শ্মশানে। পাড়া প্রতিবেশী, সবার থেকেই দূরে দূরেই থাকতাম।পুরোনো কলিগদের মধ্যেও কেউ নেই, যাকে খবরটা দিতে ইচ্ছেও করল। সো, ঐ শ্মশাণ থেকে ফিরে একা একাই বাড়িতে ঢুকলাম। সাইলেন্ট অ্যান্ড ডার্ক।

মনোজের চোখে জল আসে। ছলছল চোখে দেখে নির্মলের চোখ শুষ্ক, স্বরেও কোনো বিষাদ নেই। স্পষ্ট উচ্চারণ।

"এখন মনে হচ্ছে থার্টিপ্লাস বছরের পুরোনো বউকেও মিস করি না। যেটুক অভাব সেটা ঐ ডেইলি হ্যাবিটের। সকালে কাগজ আসলে ইংরাজিটা আমি নিয়ে বাংলাটা ওকে দিতাম। এইসব। খুবই ছোটোখাটো। একটু দম নিয়ে নির্মল আবার বলেন, "নিজের ভবিষ্যতের প্ল্যান আর অ্যারেন্জমেন্ট, এইসব করতেই বিজি ছিলাম। আইন,আদালত,উকিল। ব্যাংক। চিরকালই তো খুব সাবধানী ছিলাম। তাই মিনিম্যাল প্রবলেম হল।"

তারপর মনোজের দিকে তাকিয়ে বলেন, "কী হোল? আপনার ব্যাথাটা আবার বেড়েছে? কাতরাচ্ছেন তো শুনছি।”

"ও কিছু না। হঠাৎ করে ব্যাথাটা চাগাড় দিয়ে ওঠে"

নির্মল বিজন কে বলে, “কালই দাশগুপ্তের ক্লিনিকে গিয়ে চেস্ট এক্স রে করিয়ে নিন। আর হাজরাকে খবর দিন। বাড়ি ফেরার সময়ে একবার দেখে যাবেন। ফেলে রাখবেন না"।

৯

বিজন খুব খুশি। একেবারে বিশ হাজার দিয়ে গেছেন ওনারা। বন্যা, শ্যামল দত্তের বোনঝি। আরেকজন সাক্ষীও জুটেছে। সবই মায়ের খেলা। বলেছে মায়ের মুকুট গড়িয়ে দিতে।

মনোজ খুবই কুণ্ঠিত বোধ করেন। একজন লোক আচমকা মারা গেল, সেও কি মায়ের কৃপা? মনে পড়ে দেড়শো বছর আগে সাধকের পায়ে পড়লেন ভক্ত জমিদার। বললেন, “ঠাকুর বাঁচাও, খুন খারাবি হয়ে গেছে।” সাধক স্মিত হেসে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কেস টেকেনি। ও কি মায়ের কৃপা?

সবাই খুশি। ইদানিং বেশ খানিকটা বেড়েছে দক্ষিণা আর প্রনামীর পরিমান। শুক্রবারের সন্ধ্যাতে রীতিমতন ভিড় হয়। বারান্দাতেও লোকে দাঁড়িয়ে থাকে। শুভ্রা বলে, “কত গাড়ি আসে খেয়াল করেছ?”

বিজন বলে, “ঠাকুর একবার আসুন, হাজরা ডাক্তার এসেছেন।”

ডক্টর হাজরা হাত তুলে নমস্কার করেন। "এই খানেই আপনার আশ্রম? বেশ,বেশ। আসতে যেতে দেখি তো বেশ, মানে ক্রাউড হচ্ছে। আমার ফ্যামিলিও কালীভক্ত। শ্বশুরবাড়ির দিকে একজন তো কালীঘাটের সেবাইত। "

অভ্যস্ত হাতে এক্সরে প্লেট নিয়ে আলোর দিকে ধরেন। মুহূর্তে ডাক্তারের মুখ সাদা হয়ে যায়। কপাল চাপড়ে বলেন মাই গড।

নিস্তব্ধতা। বিজন ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলে, “ক্যানো? কী হোলো?”

ডক্টর হাজরা লজ্জা পান। তার এরকম অপেশাদারি এক্সপ্রেশনে। মনোজের চোখে চোখ রেখে বলেন, “বলি?” মনোজের সম্মতি পেলে বলেন,”ক্যান্সার। আপনার লাঙ্স টিকে খেয়েছে। এবার পাঁজরার হাড়গুলোকে ধরেছে। ক্ষয়ে যাচ্ছে

সেগুলো। আপনার থ্রেশহোল্ড অফ পেইন খুব হাই? এতোদিন টের পান নি?"

হাজরাই বলেন। "ছয়মাস। টেনেটুনে। যদি লাকি হন তো তার আগেই। কেনো না ব্যাথা খুব বাড়বে। আপনি রামসুব্রামানিয়ামকে একবার দেখাতে পারেন। অংকোলজিস্ট। আমি বলে দেবো। তাহলে তাড়াতাড়ি দেখবেন নাহলে তো সেই মাস খানেকের ওয়েটিংলিস্ট।" সবাই চুপ। শুধু দেওয়াল ঘড়িটা টিক টিক করে চলে।

১০

নয়, নয় এ মধুর খেলা। তোমায় আমায় সারা জীবন সকাল সন্ধ্যাবেলা।

গানটি বার বার মনে পড়ে মনোজের। মনে হয় কালী চিরকালই তার সাথে খেলা করে গেলেন। সেই খেলা, যার প্রকৃত অর্থ মনোজ কখনো বুঝে উঠতে পারেন নি। সেই খেলা, যার আইন কানুনও মনোজের জানা নেই। তাও সারা জীবন কালীর সাথে খেলে চলেছেন। ভক্ত ও ভগবানের খেলা।

যেমন সাহারা মরুভূমির একটা পিঁপড়েকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না মহাসাগরের রূপ, বা জন্মান্ধ মানুষকে চেনানো যাবে না টকটকে লাল রং কী রকম, তেমনই মানুষ আর ভগবানের মধ্যে চিরকালই একটা বাধা থেকে যাবে। ফারাক বা ব্যবধান। দুজনে দুজনের ভাষা বোঝেন না। কিছুটা চেনেন, কিছুটা অনুভব করতে পারেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত্যই। দুজনে দুজনের অপরিচিতই থেকে যাবেন।

প্রায় রাতারাতি ওজন কমে যেতে লেগেছে। সপ্তাহ পরেই জামা কাপড় ঢিলে হয়ে যাচ্ছে।চোখ বসে যাচ্ছে কোটরে।গাল ঢুকে যাচ্ছে। আর বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে ভয়ানক বেদনা। একটানা। আর সারা শরীর কাঁপানো কাশি।

কোথাও কি ভুল থেকে গেল ? এই কি অন্তিম পরীক্ষা? আর কতবার অগ্নিপরীক্ষা দেবেন মনোজ ? কার জন্য? কীসের জন্য ? মনোজ ভাবে আর ভাবে।

তার রাগ হয় না, বা অভিমান। মনোজের মনে হয় না ঠকে গেলাম। বা বৃথা গেলো বিকীর্ণ সৃষ্টির জালে ছলনাময়ীর পিছনে ছুটে।

মালা কাঁদে আর বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে, বলো না কালীকে। তোমায় সারিয়ে দিতে। দেবেন দেবেন। মা কালী তোমায় সুস্থ করে দেবেন। মনোজ মাথা নাড়ে। সব অংকেই কি আর দুয়ে দুয়ে চার হয়? জীবন অমন সুখের জ্যামিতি নয়।

"এখন কী হবে? এখন কী হবে?ছেলে মেয়েদুটো তো এতো ছোটো। আমাদের সংসার চলবে কী করে? সারাজীবন তো অন্যদের সমস্যা তুমি সল্ভ করে দিলে আর এখন নিজের অসুখটা সারাতে পারছ না? ডাক, ডাক তোমার মাকে। সংসারাটা উনিই সামলান। তোমার অসুখটাও সারাক"। অসহায় মনোজ মাকে ডাকে। মা অবাক হয়ে বলে, "আমি তো রয়েছি তোর পাশেই, দেখিস না ?"

"আমার অসুখ সারিয়ে দেও মা। ব্যাথাটা তো কমাও।" মনোজ বলে আর এক অবিশ্বাস্য নীরবতার মুখোমুখি হয়। সেই নৈঃশব্দের মাঝে চোখ বন্ধ করে দেখে তার দুই পাশে দুই পার্শ্বরক্ষী পিশাচ। সেই ভাবলেশহীন মুখ, অপলক দৃষ্টি। পাহাড়ের মতন শরীর। মুন্ডিত মস্তক। নির্বাক। সজাগ।

নির্মল পাশে এসে বসে। "কোনোদিন ফ্রেন্ডশিপ হয় নি কারুর সাথে। স্কুল কলেজেও নয়। থার্টিফাইভ ইয়ারসের বউও নয়। এই বাষট্টি বছর বয়সে, কী অদ্ভুত, আপনার সাথেই যাএকটু - ঐ ফ্রেন্ডশিপ। আপনার কাছে নিত্য সন্ধ্যাবেলা এসেই যা একটু সুখ পেতাম। শান্তি পেতাম। তা সেটাও গেলো। আপনার মা কালীর বোধয় আর সেটা সহ্য হল না। যাকগে।

আমার পৈতৃক বাড়ি আর বিশাল জমি পড়েছিল বকুলবাগানে। প্রোমোটারদের শত অনুরোধেও বিক্রি করি নি। কেনো করব? কী হবে আমার টাকা নিয়ে?

তো, এবার সেটাকে বেচে দিলাম। বেশ অনেক কোটির ব্যাপার। একটি আশ্রমের সাথে কথা হয়েছে। হরিদ্বারের কাছে। ঐ আশ্রম বললে আশ্রম, ওল্ড এজ হোম বললে ওল্ড এজ হোম। সেখানে চলে যাচ্ছি। কালকেই ভোরের ফ্লাইটে দিল্লী। সেখান থেকে ট্রেনে। আপনার সাথে তাই দেখা করতে আসলাম। আর দেখা হবে না আমাদের।" মনোজ স্মিত হাসেন, "ভালো থাকুন,সুস্থ থাকুন। মা আপনার ভালো করুক।"

নির্মল অবিচলিত ভাবে বলেন "আপনার ছেলে আর মেয়ের নামে ট্রাস্ট করে দিয়েছি। আগামী দশ বছর প্রতিমাসে দু'হাজার টাকা করে পেয়ে যাবে - দু'জনেই। ওদের,অ্যাটলিস্ট এডুকেশনের দায়িত্বটা নিলম।" বলে একটু অপ্রতিভ হন। সারা জীবনে কারুর জন্য কিছু করেন নি। আজকে অযাচিত ভাবে করে একটু লজ্জাই পান।

মনোজের হাত ধরেন। তারপর বলেন, "চলি। গুডবাই।" ঘর থেকে বেরিয়ে যান। বিজন বলে, "সবই মায়ের কৃপা। মা আছেন। সব দেখছেন। সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।"

ভক্তের সংখ্যা দ্বিগুন, ত্রিগুন হয়ে গেছে। দক্ষিণাও বেড়ে গেছে হু হু করে। এই ই শেষ সুযোগ। সবাই যত পারে চেয়ে নেয়। পুণ্য করে রাখে। পরীক্ষার রেজাল্ট, স্বামীর সুমতি। ছেলের চাকরি। মেয়ের বিদেশ যাত্রা।

বন্যা আসে। খুব কাঁদে। বলে, "ঠাকুর, আমার স্বামীর পাপ নিলেন। তাতেই আপনার অসুখ হল কি?"

মনোজ হাসে। পাপের কি অমন হিসাব নিকাশ চলে? মিলনের জুয়াচুরির পাপ নিয়ে নীলকণ্ঠ মনোজের ফুসফুসে বাসা বাঁধল কর্কট রোগ। এতো কম পাপেই এতো ব্যাথা, এতো যন্ত্রণা ? শুধু

একজনের পাপ নিয়ে? তাহলে কীসের ঠাকুর তিনি?

১১

যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি চাই। আর চিন্তা করতে পারেন না মনোজ। বুকে দারুণ ব্যথা আর তার সাথে যোগ হয়েছে কাশি। দমক যখন আসে তখন সারা শরীর কাঁপিয়ে কাশি চলে। মনে হয় নাভির থেকেই উঠছে। তাও সারাদিন শুধু লোকের পর লোক। মিষ্টিতে ফুলেতে ভরে যাচ্ছে ঘর। শুভ্রার হাত ভরে যাচ্ছে টাকায়। সবার ঠেলাঠেলি। শেষ আর্জিটা কোনোরকমে পৌঁছে দিতে হবে। মহামানবের পায়ের দুলো। দর্শন।

এক কবিরাজি ডাক্তার দিয়েছে, কী এক আফিম মেশানো ওষুধ। খেলে ব্যাথা আর টের পাওয়া যায় না। কিন্তু সারাক্ষণ একটা ঝিম ভাব।চেতনাটাও সম্পূর্ণ নয়। আধা ঘুম আধা জাগরণ। স্বপ্নে অর বাস্তবে, কোনোটার শুরু কোনটার শেষ তা আর খেয়াল রাখতে পারেন না মনোজ। শুধু জেগে থাকলেই ব্যাথার সাগরে ডুবে থাকেন। ডুব ডুব ডুব সাগরে আমার মন। তাও খেয়াল রাখেন তার খাটের পাশেই দুই পিশাচ। তাকে পাহারা দিয়ে চলেছে। সজাগ তাদের দৃষ্টি। পাথরের মুখ। কিন্তু কোন শত্রু থেকে রক্ষা করে এই পিশাচেরা? শত্রু তো তার দেহের ভিতরে। কুরে কুরে খেয়ে চলেছে তার হাড়,পেশী,মজ্জা।

মনোজ আর্ত কণ্ঠে বলেন, “মা,মা। কেনো আমাকে ছেড়ে চলে গেলে?”

মা পাশে এসে বসেন। "এই তো আমি রয়েছি তোর পাশেই।”

তুমি আমার ব্যাথা কমাতে পারলে না?"

"কত ছেলে আমার। কত ব্যাথা। সব ব্যাথাই কি আমি কমাতে পারি?"

"তাহলে একবার দেখা দাও। যেমন দেখেছিলাম তোমায়। তুমি হেসেছিলে। তুমি বলেছিলে আচ্ছা। তেমন ভাবে এস। আর

একবার। দুই চোখ ভরে দেখি"

"এই তো আমার সাথে কথা বলিস। সারাদিন মায়ে পোয়ে কত কথা হয়।টের পাস না, মাঝে মাঝে তোকে ছুঁয়েও যাই? বুঝিস না, আমার স্পর্শ?"

"জানি না। টের পাই কি না। না হয় আরেকবার দেখতাম তোমায়। তারপর চোখ বুঁজতাম। চিরকালের জন্য। আর একবার দেখি তোমায়"

মা চুপ করেন। চিরকালের জন্য। সারা জীবনের জন্য।

মনোজ টের পায় তার চারিদিকে নেমে আসছে নিঃশব্দতার পর্দা। কোনো শব্দ নেই ভুবনে। আর তখনই কুল কুল করে নেমে আসে সেই অনন্ত কালো মহাসাগর। সব আলো গ্রাস করে। নিঃসীম। নিশ্ছিদ্র।

"তোমাকে ক্ষমা করলাম" মনোজ বলেন আর ডুবে যান সেই মহাকালোর সাগরে।

তেভাগু

প্রতিভা সরকার

- মাসি !

- হুঁ।

-জল...

-হুই যে কোণায় বোতল।

মেয়েটার চোপা নেই, খুব কম কথা বলে। ভালো, তাতে বকবক করতে হয় না, কাজ কমে। অগত্যা রিতা চেয়ারে বসে লম্বা হাই তোলে। চোয়ালের বাঁধান দাঁতের নীচে চুমকুড়ি মতো হয়।

কাল এই নতুন মেয়েটা ধরা পড়েছে রামবাগানে। ধরা ঠিক নয়, বাড়িউলি নিজেই দিয়ে গেছে এই এন, জি,ও-র শর্ট স্টে হোমে। নইলে হুজ্জোতি বাধার চান্স ছিলো। একে তো মাইনর, তার অভিজ্ঞ চোখ মেপে নেয় আর একবার মেয়েটাকে। তার ওপর আবার ছম্মক ছল্লো গড়নপিটন। কাউন্সিলরের ডানহাতটা সোনাগাছির রাখি উৎসবে স্টেজে উঠে বাতেলা মারে, আবার রোজ সন্ধেয় এ পাড়ায় ঘাঁটি গাড়ে। ও শালার নজর আবার কচি লাউ কুমড়োতে, মাচায় ঝুলতে দেখলেই হলো।

ফাউ জুটেছে কালু গুন্ডা। মাসির থোবড়ায় বায়নার টাকা ছুঁড়ে দিয়ে গেছে। নিলে লাও, নইলে পুলিশের হুজ্জোত সামলাও। আর পুলিশ তো দুপক্ষের হাতেই তামাক, দুদু দুটোই খায়। সমঝে চলে একমাত্র এই এন, জি,ও-কে। তাই ফালতু টাইম না উড়িয়ে বাড়িউলি রেখে গেল এইখানে।

মেয়েটা জল খাচ্ছিল, রিতা অলস চোখে মাপছিলো ওকে। মোটা গুছি বিনুনিটা পাছাটাকে ঘসটে আরো নীচে নেমে গেল, কনুই ভেঙে হাত উঠে গেল মুখের সামনে, টিয়া-লাল ঠোঁট ফাকা করে সরু ধারায় জল খেতে লাগলো মেয়েটা। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। বুকদুটো উঁচু হয়ে আছে থুতনি বরাবর। রিতার আগের বাবু দেখলে উল্লাস করতো, কি চুচি মাইরি ! সে নিজেও এই লাইনে পঁচিশ বছর পার করেছে। ঠিকঠাক মাল চেনে বলে দেমাক আছে। এ মেয়ের দাম উঠবে।

গবগব করে জল খাচ্ছে দ্যাখো। ভয়,আতঙ্ক -যদিও দেশ ছেড়ে পালাবার সময় কোনটাই ছিল না। যে জ্বালায় জ্বলেছিস, আমার মতো বুড়ি হয়ে পেশা ছাড়ান না দিলে তার মরণ নেই। অন্য জ্বালাও এসে জুটবে তখন। তাও তারা ডাক্তারের কাছে যেতে বেজায় লজ্জা পেতো, এখন এ লাইনের মেয়েরা বুক বাজিয়ে যায়। এন, জি, ও থেকে পাশের চেম্বারে ডাক্তার আসে রোজ। আজও সেখানে লম্বা লাইন, আর প্রচুর খিস্তি খাস্তা। দোতলার ঘরেও সেসব দেদার উঠে আসছে এই ভরদুপুরে।

- মাসি

- আবার কি ?

- তুমি কে ?

এইবার রিতা একটু থমকায়। কি বলে এখন সে ! পেশা ফুরোনো এক বুড়ি বেবুশ্যে, যে এই এন,জি,ও-র শর্ট স্টে হোমের ইন চার্জ এখন, তাকে সরাসরি পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে একটু ফাঁপর লাগে বইকি ! একটু নড়েচড়ে বসে পাশের জানালা দিয়ে গলার কাছে বুজকুড়ি কাটা একদলা কফ ছুঁড়ে ফেলে নীচে গলির দিকে। ততক্ষণে মেয়েটা এগিয়ে এসেছে তার কাছে। কালো রঙে আরো কালোর পোঁচ পড়েছে মুখে দুশ্চিন্তায়,

- কি হবে !

গায়ে বোটকা গন্ধটা আজ একটু কম। কদ্দিন পর স্নান করতে

পেল কাল কে জানে। কার কি হবে ? ওর নিজের ? একটু হেসে নেয় রিতা,আর হবার কি বাকি রেখেছে , নাগর ফুসলে এনে দুদিন পর বিক্রি করে দিয়েছে শেয়ালদায় এক বিহারি ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে। তার কাছ থেকে আর একবার কিনেছে রামবাগানের মাসি।

- কি আর হবে, বাপু ! তোমার হাড়ের পরিক্ষে হয়েছে। রিপোট এলে বোঝা যাবে বয়স কতো। আঠারোর নীচে হলে বাড়ি ফিরতে পারো। আর ওপরে হলে এ পাড়ায় পেশা করতে পারো। তোমার যা মন চায়।

--লেবে না !

--না লেবে তো না লেবে। থাকবি এখেনেই। এক বচ্ছর বাকি থাকলে এক বচ্ছর, ছ' মাস হলে ছ' মাস। তারপর এডাল্ট হলে ঘর ভাড়া নিয়ে এ পাড়াতেই পেশা করবি। এই যে পুজো এসেছে, কতো মেয়ে নেপাল, বাংলাদেশ থেকে এসেছে। পুজোআচ্চায় সোনাগাছি রামবাগানে টাকা ওড়ে বুঝলি। শুধু ধরতে জানতে হয়।

যাইহোক একদিকে অন্তত এই পেশা করা কতো লাভজনক এটা মেয়েটার সঙ্গে নিজেকেও যেন বুঝিয়ে খুশি হচ্ছিল রিতা, হঠাৎ মেয়েটা পরিষ্কার গলায় বলল,

- না।

- কি না ?

- পেশা না।

- ওবাবা, তুই যে দেখি সতীমায়ের অবতার। তো ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলি কেন আবাগির বেটি ? জানতিস না এসব ? ন্যাকামি হচ্ছে ?

রীতার কেন এতো রাগ হয়ে যায় সে নিজেও জানেনা। শর্ট স্টে হোমে যে ক'দিনই রেস্কিউড মেয়েরা থাকুক না কেন, তাদের

সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে পইপই করে কো অর্ডিনেটর দিদি বলে দিয়েছে। মুখ খারাপ করা চলবে নাকো। এই এন জি ও তাদের মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছে, নিজের পেশাকে সম্মান করতে বলেছে, আপদেবিপদে পাশে দাঁড়িয়েছে। আর রিতার মতো পেশার বয়স পেরিয়ে যাওয়া মহিলাদের জন্য অন্য সংস্থানের ব্যবস্থা করারও চেষ্টা করে। তাছাড়া বদ মেয়েও তো আসে। এটার মতো ম্যাদামারা তারা নয়কো মোটেই, পেশা করবে বলেই ঘর ছাড়ে, বাধা পেলে যা খুশি তাই করে বসতে পারে। এই তো কিছুদিন আগে দুটো রেস্কিউড মাইনর ঘুমন্ত ইন চার্জ কমলাদির মাথা শিলনোড়ায় থেঁতলে পালিয়ে গিয়েছিল। সাদা টপে রক্তের দাগ দেখে পুলিশ হাওড়া স্টেশনেই তাদের পাকড়াও করে। এ মেয়ে তেমন খুনচড়া নয়। কথাই বলে না, সারাক্ষণ বেজার মুখে বসে কি সব চিন্তা করে। তবু সাবধানের মার নেই। তাই পেশার অপমানে বেদম রাগ হলেও সে সুর নরম করে,

- কোন কাজকেই ছোট দেখতে নেই রে। অতো আপত্তি থাকলে তোর বাড়ি ছাড়া উচিৎ হয়নি বাপু। হ্যাঁরে, তোর নাম যেন কি ?

- তেভাগু।

- এ আবার কোন ঢঙের নাম রে ! তেভাগু ! তিন ভাগ করে খাবে...নাকি....

আবার একটা অশ্লীল ইঙ্গিত সে হজম করে নেয়। এই হোমের ইন চার্জ সে। পদের সম্মান বলে একটা কথা আছে না। কোঁত করে কথা গেলে রিতা। সঙ্গে কিছু শ্লেষ্মারও সদ্গতি হয় আবার।

রিতার কথার জবাব না দিলেও তেভাগুর মনে অনেক ছেঁড়া ছেঁড়া ছবি। মা কাঁঠালগাছ জুড়ে ঘুঁটে দিচ্ছে। ভাইটা ছাগলের মুখে পাতা ধরবে বলে দৌড়চ্ছে, কোমরের ঘুনসিতে বাঁধা ঘুঙুর মৃদু আওয়াজ তুলছে ঠুংঠুং। বাড়ির সামনের ডোবাটায় এইসময় বালি হাঁস নামে। লোকে বাচ্চাগুলোকে ধরে ধরে খেতো বলে সে

একদিন বারণ করে গুপী মামার চড় খেয়েছিল,

- দেওয়ানী হইবু ?

তবু জোছনা পড়ে জলের ধারে কচুপাতা চকচক করলে সে জগন্নাথদেবোকে আকুল হয়ে ডাকতো, আজকের মতো যেন বেঁচে যায় নরম খুদি বাচ্চাগুলো ! আর মাঝরাতে মা হাঁসের কক কক আওয়াজ আর হুটোপাটিতে বুঝতো পুকুরে আজও লোক নেমেছে।

আর কখনো ওখানে ফেরা হবে না। পথ হারিয়ে ফেললে যে ভয় আতংক ঝুঁটি ধরে নাড়া দিতে থাকে তেমন ভয় নয় তার। বরং গলাভর্তি তেষ্টা নিয়ে তাকিয়ে থাকা ঠাণ্ডা জল ভর্তি মেটে কলসির দিকে। ভয়ংকর আপসোস, কিন্তু দোষ দেবে কাকে ! নিজের ইচ্ছেতে ঘর ছেড়েছে গোপালের হাত ধরে।

গ্রামের চৌহদ্দি না পেরোনো তেভাগু প্রথমে গেল ভুবনেশ্বর, সেখান থেকে হাওড়া। কত বড় রেলগাড়ি চড়ে মহানদী পেরোলো ঝমরঝম। নদীর শুখা বুক জুড়ে বড় বড় চাকার দাগ। গোপালকে জিজ্ঞেস করায় সে ছ্যাঁতলা পড়া দাঁত বার করে হাসে,

-- ট্রাক বালু খুদতে আসে। আমি যেমন তোরে খুদি।

এখনো গায়ে কাঁটা দেয় তেভাগুর। সেই নিমগাছের নীচে প্রথমবার। হলদে খড় ঢুকে গিয়েছিল তার কালো চুলে, ফ্রক ধুলো মাখামাখি।

- ছাড়িবু তুই গোপাল ?

তার কাতর মিনতির উত্তরে গোপালের হাত নতুন নতুন জাদু দেখাতে শুরু করে। টুকুস টুকুস টোকা মারে তার কপালে, থুতনিতে, বুকে পেটে। হাতদুটোই গোপাল হয়ে গেলে তেভাগুর শরীর ফুলে ফুলে উঠতে থাকে ভরা নদীর মতো। ছাড়তে চেয়ে সে আরো ঘন হয়ে লেপ্টে যায় গোপালের বুকের সঙ্গে। পউল পরবের গানের ছন্দের মতো ওঠা পড়া করতে থাকে তার নগ্ন

কিশোরী শরীর যতক্ষণ না গোপাল এলিয়ে পড়ে তার উদোম বুকের ওপরেই। দম আটকে এলেও সে কিছু বলতে চায় না, এতো ভালো লাগে তার গোপালের গায়ের গন্ধ !

কিন্তু এইরকমই এলিয়ে থাকার সময় একদিন আকাশমুখো তেভাগু পরিষ্কার দেখলো দুটো পেঁচা উড়ে গেল নিম গাছের কোটর ছেড়ে, তাদের গোল ভাঁটার মতো চোখ থেকে ঘেন্নার আগুন নেমে এলো গোপালের পিঠে আর ডানা ঝাপটানোয় আওয়াজ উঠলো ছি ছি ছি। ভয়ে কেঁপে উঠল তেভাগু। গোপাল সেই ভয় বুঝতে না পেরে নির্লজ্জভাবে হাসল,

--কি রে, আরো চাই ?

নিমগাছ খুব পবিত্র গাছ। ধর্মের গাছ। ওষুধের গাছ। মা বলতো। বহু যুগের পর কোন নিম গাছের বাকলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ফুটে বেরোয়। তখন আর সে গাছ থাকে না।দারুব্রহ্ম হয়ে যায়।

পান্ডারা আরো লক্ষণ মেলায়। খোদলে বাস করে কিনা শাবকসহ লক্ষ্মী পেঁচা আর গোড়ায় বিষধর সর্প। সব মিলে গেলে মহা ধুমধামে সেই দারুব্রহ্ম প্রভুর নবকলেবর নির্মাণের কাজে লাগে। জয় প্রভু জগন্নাথো !

বড় একটা নিশ্বাস ছাড়ে তেভাগু। কে জানে নিমের অভিশাপেই সব এমন তছনছ হয়ে গেল কিনা। স্কুলে যেত তেভাগু। ক্লাস এইট পাশের পরীক্ষা দিয়েছে। ভূগোল বই পড়ে জেনেছে তাদের এই বাহ্নিয়াজঙ্গল গ্রামটা পূর্ব মেদিনীপুরে হলেও, গোপাল আর তার মতো জড়াজড়ি করে আছে উড়িষ্যার সীমানার সঙ্গে। বাপ ছিল ভাগচাষী, লাল পাট্টির মাতব্বর। সেইই তার নাম রেখেছিল তেভাগু, আর ভাইটার নাম আকালু। একদিন ওই নিমগাছের তলেই তার বল্লমবেঁধা দেহ মিলল, সাজোয়ান শরীরটা পুরো রক্তশূন্য, গোঁয়ার মাথাটা অসাড় হেলে রয়েছে একদিকে। তারপর থেকেই বাপের গায়ের গন্ধ পাবে বলে মা পইপই করে না বলা

সত্ত্বেও তেভাগু স্কুল ছুটির পর একা বসে থাকতো গাছতলায়। নদীর দিক থেকে আসা শনশন হাওয়া চুলে বিলি কাটতো, মনে হতো বাপের চাষাড়ে মোটা মোটা আঙুল। ভুতে পাওয়ার মতো তেভাগু সেই আদর নিতে নিতে দেখতে পেত পাটে বসা সূর্যের সর্ষেফুলের রেণুর মতো গুঁড়ো হলুদ আলোয় কালোকোলো মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে মাথা সমান পাটক্ষেতের আবছায়ায়।

- বাপ গো !

-হ' মা !

- অপঘাতের মড়া, ভুত হইবা বাপ।

বাবা উত্তর দিত না আর। কাছেও ডাকতো না। বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মিলিয়ে যেতো সন্ধ্যার অন্ধকারে।

একদিন ঐ পাটখেতের ভেতর থেকেই উদয় হলো গোপাল। মেয়েলি চেহারা, ফর্সা, পাতলা গোঁফের রেখা, তবে দাড়ি নেই। হাত পায়ে লম্বা লম্বা আঙুল, আর পেঁচার মতো বাঁকানো নাক। ঠাকুর গড়ে সে সীজনে, কিন্তু মাঝে মাঝেই উধাও হয়ে যায় গ্রাম থেকে। জিজ্ঞাসা করলে বলে সুরাতে কাপড়কলে কাজ করতে যায়। এইরকম যাতায়াতের পর তার মুখের ভাষা বদলে গেল, চোখের চাউনি হলো ঝকঝকে। সে নাকি এখন মেট্রোরেলের মজুর হয়ে আছে বড় শহর কলকাতায়। মা হঠাৎ ভেদবমিতে মারা গেলে সে এসে গ্রামে রইল কিছুদিন আর তার মধ্যেই একদিন চক্কর কাটতে কাটতে তেভাগুর মুখোমুখি হল গোপাল। শুকনো মুখ, তেলহীন রুক্ষ চুলের কালো মেয়েটা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বসেছিল।হাওয়ায় দুগাছি চুল উড়ে এসে পড়েছিলো চোখের ওপর। গোপালের চোখে কেমন নেশা লেগে গেল। সে তাড়াতাড়ি হাতে এলোমেলো করে ফেললো নিজের টেরিকাটা চুল, চোখ ভালো করে কচলে হতাশ এসে দাঁড়ালো তেভাগুর সামনে, যেন প্রথম যে কথা মেয়েটার মনে আসে তা হলো 'আহা রে'!

হলোও তাই। তেভাগু শুকনো নিমপাতা হাতে সরিয়ে তাকে বসতে দিল। খুব নরম গলায় শহুরে উচ্চারণে গোপাল শুধোল,

- ভালো আছো, তেভাগু ?

- ভালা আছি।

- ভালো নেই তুমি। বাপ ওমন ভাবে ফুঁড়ে গেলে ভালো থাকোই বা কি করে ! বুঝি গো আমি সব বুঝি।

- হ।

চোখ ভর্তি জল নিয়ে মাথা নাড়ে তেভাগু,

- ভালা নাই আমি।

গোপাল পাশে বসে অবলীলায় তেভাগুর হাঁটুর ওপর হাত রাখে।

- জানি রে জানি। সব কথা কি কওয়া যায়, না কইতে হয়। আয় তোকে কইলকাতা শহরের গপ্পো শুনাই। মন ভালো হয়ে যাবে।

সে গল্পে হাওড়া ব্রীজ আসে, ময়দান, গঙ্গার ধারে বসে ছেলেমেয়েদের প্রেম করা, সিনেমা দেখা। বড় বড় দোকান আর তেভাগুর মন্দ ভাগ্যের জন্য বড় মায়া। ঘুরে ঘুরে আসে। একদিন ওঠার আগের মূহুর্তে গোপাল লম্বা আঙুলে তেভাগুর থুতনি ধরে নিজের দিকে ফেরায়,

- নাকছাবি নাই তোর ?

- নাই। নাকছাবি রইলে দ্যাখতে বড় ভাল্লাগে, না গোপালদা?

- লাগেই তো। এতো মায়াদারি মুখ !

এই মায়ার কথায় তেভাগু যেন গোপালের পোষা মেনি হয়ে যায়। তার সারা শরীরে আদর ছড়াতে ছড়াতে এতোদিন পর আলহাদে গোপাল নিজের ভাষায় বকবক করতে থাকে,

- হাতে কি রইবে ? তেভাগুমণির হাতে কি রইবে? শাখা, পলা কতরি। কাইয়া মাইজি তো কি, গলায় সোনার চ্যান দিলে রূপ ফাটি যাবা। আমার সাথে রইবা তো সোনার রিং বনি দেবা।

তেভাগুর টান টান স্নায়ুতে ঢিল পড়ে। মায়ের আর আকালুর কান্না ভুলে সে সমস্ত শরীর লম্বা করে দেয় মেনিটার মতোই। না দেখা ল্যাজের ডগা মৃদু মৃদু আছড়ায় মাটির ওপর। কান দুটো খাড়া করে গভীর চোখে তাকায় গোপালের দিকে।পেটের ভেতর থেকে আরামের উদগার উঠে আসে, গরররররর। গোপাল আরো ঘন হয়, যেন এখনি কোলে তুলে নেবে আলহাদী মেনিটাকে।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হয়। রিতা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। নীচে দারোয়ান আসতে দিয়েছে যখন তখন এ কোঅর্ডিনেটর দিদিই হবে। তনুজা ঘরে ঢুকে বলে,

- জল খাওয়াবে রিতাদি ?

- এই যে দিদি।

কাচের গ্লাসে জল ঢেলে রিতা টেবিলের ওপর রাখা বড় প্যাকেটটা দেখায়,

- রিপোট এলো, দিদি ?

- হ্যাঁ।

আড়চোখে মেয়েটাকে একবার দেখেও নেয় সে। এক মুখ দুশ্চিন্তা নিয়ে জানালার শিক ধরে ভয়ে ভয়ে দেখছে তাকে।

- এদিকে এসো।

বাধ্য মেয়ের মতো তেভাগু এগোয়। ক্লান্ত লাগে তার খুব। এখুনি যেন মেঝের ওপর স্তূপ হয়ে খসে পড়বে সে।

- আরে আরে মেঝেতে বসছো কেন ! এই চেয়ারটা আছে কেন তাহলে ! বসো বসো। কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ?

ঘুম ঘুম ভাব, তবু তেভাগু মাথা নাড়ায়। দিদির কামিজে কি

সুন্দর ফুল ফুটে আছে, কানের ঝোলান দুলটাও কি সুন্দর !

- তুমি তো পড়াশুনো জানা মেয়ে। ক্লাস নাইনে উঠেছিলে। আমার কথা বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছে কি ? এখন কিন্তু আমি তোমাকে অনেকগুলো জরুরি কথা বলব।

বালিহাঁসের আর্তনাদ শুনতে পায় তেভাগু। মায়ের কাছে ফেরত দেবে তাকে, না ঐ পুতনা রাক্ষসীর কাছে যেটাকে মাসী বলে ডাকে সবাই? সাত আটদিন ঘরে তালা মেরে রেখেছিল তাকে। দুবার একটু খাবার আর জলের বোতল। ভয়ে তার সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তবু পেচ্ছাপ তো পেত একবার দুবার। সেই কটু গন্ধ, অন্ধকারে ইঁদুরের কিচকিচ, আর জং ধরা তালার শব্দ ঘিরে ধরলো তেভাগুকে । মাঝে মাঝে লোক এসে দেখে যেত তাকে। সঙ্গে দোক্তার গন্ধ ছড়ানো মোটা মাসির খিচুনি, ওঠ মাগি, ঢেমনি কোথাকারে, গোঁ ধরে বসে আছে। উঠে দাঁড়া বলছি। উঃ, মুতে একেবারে ফাটিয়ে রেখেছে গন্ধে !

পাশের ঘর থেকে বমির হড়হড়, মাতালের জড়ানো কথা, গালিগালাজ, হাসি।

তেভাগুর বড় কালো চোখ জলে ভরে গেল।

- এই দ্যাখো, আগেই কাঁদে ! রিতাদি ওকে বোঝাওনি আমরা কি ভাবে কাজ করি ?

দিদি তার হাত ধরলো। নরম ঘেমো হাত। তারপর বলতে লাগলো,

- একটা মুশকিল হয়েছে তেভাগু। বোন অসিফিকেশন টেস্টে, মানে তোমার হাড়ের যে পরীক্ষা হয়েছে তাতে ডাক্তারবাবু একটু কনফিউজিং, মানে গোলমেলে রিপোর্ট দিয়েছেন। এই দ্যাখো লেখা আছে, শি হ্যাজ ফোরটিন টিথ ইন আপার জ'... তোমার ওপরের পাটিতে চোদ্দটা, নীচের পাটিতে তেরোটা দাঁত আছে।

গ্লাসে পড়ে থাকা জলটুকু খায় দিদি,

--হার হাইমেন শোড ওল্ড হিলড টিয়ার্স...আচ্ছা থাক,এটা না জানলেও চলবে। তারপর, আই টুক হার এক্স রে, মানে তোমার কবজি, কনুই,কাঁধের হাড়ের এক্সরে নিয়ে দেখা গেছে কনুইয়ের জয়েন্ট ১৩/১৪ বছরের মতো, রিস্ট জয়েন্ট ইজ ইউনাইটেড হুইচ ইউনাইটস এট দ্য এজ অফ 16/17 ইয়ার্স, আবার কাঁধের জয়েন্ট দেখাচ্ছে ১৮ বছর।

--ও মা, মাদারির খেল নাকি !

রিতা ফোড়ন কাটায় দিদি বিরক্ত হয়,

--থামো না রিতাদি। দেখছো তো কেমন নার্ভাস হয়ে আছে মেয়েটা...তেভাগু শোন, ফলে ডাক্তারবাবু লিখেছেন, আই এম অফ দ্য ওপিনিয়ন দ্যাট দ্য এজ অফ দ্য গার্ল ইজ 17/18 ইয়ার্স উইথ মার্জিন অফ এরর অফ সিক্স মান্থস অন আইদার সাইড। মানে তোমার বয়স আঠার হতে এখনো ছ মাস বাকি। এই ছ মাস তুমি এই শর্ট স্টে হোমেই থাকবে।তারপর বাড়ি ফিরতে চাইলে ফিরবে, পেশা করতে চাইলে করবে।

তেভাগুর চোখ বুজে আসছিলো। কতকাল ভালোমতো ঘুমায় না সে। গলা শুকিয়ে কাঠ। অনেককাল আগে কাঁথিতে দেখা ক্ষুদিরামের সিনেমার মতো সে যেন গোল পাকানো দড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল এতোক্ষণ। হাত দুটো পেছনে আঁটা। দিদির বলা শেষ হলেই রিতা ফাঁসটা আঁটো করে দেবে। পেশা পেশা পেশা। এ কথাটা কতোরকমের হয়! তার বাপ ছিল চাষা, গোপালের বাপ তাঁতি। এখানে পেশা মানে মুখে রঙ মেখে রাস্তায় পুরুষ ধরা, বন্ধ দরজার পাল্লার ফাঁকে চোখ রেখে দেখেছে সে এ ক'দিন। আর ভাবতে পারছিলো না তেভাগু। তার দু চোখ ভারি হয়ে গেছে। ছ' মাস অনেক সময়। বাঁচা মরা ঠিক হয়ে যায় ছ' মাসে, আর পেশা ঠিক হবে না !

--দিদি, ঘুমাই ?

তার এই হঠাৎ উঠে দাঁড়ানোতে একটু ঘাবড়ে যায় দিদি।

--ঘুমোবে ? এখুনি ? রিতাদি, ওর খাবার ব্যবস্থা করে দাও, ও শুয়ে পড়ুক।

তেভাগু যেন শুনতেই পায় না। পাশের ঘরের বিছানাটা তাকে টানছিলো গোপালের গায়ের গন্ধের মতো। দু জোড়া অবাক চোখের সামনে দিয়ে সে প্রায় দৌড়ে যায় মাঝের দরজাটার দিকে। ও ঘরে ধপাস শব্দ হয় বিছানার ওপর।

একটা হাত তার চৌকির বাইরেই ঝুলছিল। ভয়ানক তাড়াহুড়োয় ঘুমিয়ে পড়লে যা হয় আর কি ! মাথার কাছে মন্দির, কাবা, চার্চ, গুরদোয়ারার ছবি নিয়ে একটাই ক্যালেন্ডার ফ্যানের হাওয়ায় উড়ছিল ফররফর। তার নাক বরাবর ছাদ থেকে তাকিয়ে ছিল মস্ত টিকটিকি, নজরে হলুদ বালবের গায়ে কালো ফুটকি। এসব কিছুই তেভাগুর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনা, কারণ তার স্বপ্নে তখন সেই বুড়ো নিমগাছ আর তার ছোট ছোট সাদা ফুল। গুঁড়ির গায়ে যেগুলোকে মনে হয়েছিল বৃষ্টি আর হাওয়ার আঁক কাটা, সেগুলো আসলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মের আদল। নতুন দেহ ধারণ করবেন প্রভু, তাই দলে দলে পান্ডা ধেয়ে আসছে বৃক্ষদেবতার দিকে যার নীচে প্রথম মিলেছিলো সে আর গোপাল। তেভাগু স্বপ্নেই হাঁকপাক করে, তার মুখ ভিজে যায় ঘামে, সে সবাইকে ডেকে বলতে চায় এ গাছকে তারা দুজন মিলে অশুচি করে দিয়েছে, এতে নব কলেবর হবেনা। তাছাড়া ডিম ফুটে সবে বেরিয়েছে প্যাঁচার সাদা তুলতুলে বাচ্চা, সাপ খোলস ছেড়ে এখনো বেশিদূর যায়নি, এ তাদের আশ্রয়। এর গায়ে কুড়ুল মারতে আছে !

কিনতু তার সব কথা চাপা পড়ে যায় অজস্র কলরবে, ঢোল সানাই কত্তাল জগন্নাথের জয়গান, গ্রামের বৌ ঝি, শিকনি পড়া ল্যাংটা বাচ্চা, জোয়ান মরদের ফিসফাস। তার সঙ্গে মেঘের হাঁকড়ানি, বাতাসের গর্জন। কেমন গম্ভীর অন্যরকম শব্দের হাট, যেন গা ছমছম করে। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে গোপাল এসে তার হাত ধরে। শহুরে ভাষায় বলে,

-- সবাই ব্যস্ত। চল এই ফাঁকে পালিয়ে যাই।

--- মট্টে না।

জেদি তেভাগু ঘাড় নাড়ে।

খ্যা খ্যা হাসে গোপাল। লালায় ভেজা ওর আলজিভটা অব্দি দেখা যায়। দু হাতে পাকলে ধরে ওকে। তেভাগু চেঁচাতে থাকে,

-- ছাড়, কুত্তার বাচ্চা। জুত্তা মারি তর মুখ ফাটি দেবা। সব লোক ডাকি কইবা, মাইর খাওয়াইবা।

--- তাই নাকি ! মাইর খাওয়াইবা ! জুত্তা মারি মুখ ফাটি দেবা ! এত্ত সাহস ! দ্যাখ কাইয়া মাইজি, দ্যাখ...

তেভাগুর চোখের সামনে গোপাল যেন গলে গলে পড়তে থাকে। তার চোখ বিশাল গোল হয়ে ওঠে, ফর্সা চামড়ায় মেশে কালচে নীল। হাঁটুর নীচটা গলে পড়তে তেভাগুর কোমরের কাছে এসে পড়ে তার মাথা। হাতদুটো কনুইয়ের পরে মিলিয়ে যাবার আগেই সে খামচে ধরে তেভাগুর বুক,

---- চিল্লা কাইয়া মাইজি চিল্লা। আরে আমিই জগতের নাথো। তোকে বাঁচাইবে কে ?

এইবার ডুকরে ওঠে তেভাগু,

---- বাবা.... বাঁচাও।

পাশের ঘরে টেবিলে ভাত বাড়তে থাকা রিতার কানে যায় সেই অস্ফুট গোঙানি। কেউ শুনছে না জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে সে দেদার মুখ খারাপ করে,

---খানকি মাগির ঢঙ দ্যাখো । নাং কে মনে পড়ে কতো রঙ্গই না কচ্ছে ঢেমনিটা।

ছবি: দেবরাজ গোস্বামী

রক্তমাংসগাছ

শাশ্বত বন্দ্যোপাধ্যায়

খেলামাঠের একধারে এই গাছটা যে কে কবে লাগিয়েছিল, কেউ জানে না। পাড়ার ছেলের দল জন্ম থেকে দেখছে, ও আছে তো আছেই। পাতাভরা ঝাঁকড়া গাছ, তার সুঠাম বাদামি কাণ্ড, গায়ে বয়সের হিজিবিজি। ওর ডাল এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, এইভাবে ভাগ হতে হতে হাজার হাজার প্রশাখা ছড়িয়ে গিয়েছে আকাশের নিচে। এই গাছে মধুফল হয়, তাই ওকে সবাই 'মধুর' বলে ডাকে।

গ্রামের নাম ক্ষীরজমি। লোকে বলে এখানকার মাটি মাস-বিয়োনি। আজ বীজ ছড়াও, মাস পুরতে না পুরতেই দেখবে ফনফনিয়ে উঠেছে শস্যগাছ, তার চিবুকের কাছে ঝুমঝুম করছে পাকা ধান-গম, কিংবা সর্ষের ক্ষেত ভরে গেছে ফুটকি ফুটকি হলুদে। এমন মাটি পেয়ে মধুরও বছরে দুবার করে ভরে ওঠে ফলে। প্রথমে ধপধপে ফুল ধরে, কত দেশ থেকে কত ভ্রমর আসে, মৌমাছির হাঁকডাক শোনা যায়, বোলতাদের ডানার কম্পনে তিরতির করে চারধার। তারপর ফুলের নিচ থেকে একটু একটু করে জন্ম নেয় গোল ফল। বড়ো হতে হতে ফুলটাকে গ্রাস করে কেবল বুকের কাছে একটুখানি কেশর জাগিয়ে হাওয়ায় দুলতে থাকে হালকা গোলাপি রঙের মধুফল। তখন গাঁ-শুদ্ধু ছেলেবুড়োর উৎসব। ডালে ডালেই বেলা কেটে যায়।

মধুরের চারধারে বহুদূর অবধি খোলা মাঠ। কোথাও কোনো আল নেই, সীমা টানা নেই। বিকেল হলে বন্ধুদের নিয়ে সুকুল খেলতে আসে গাছে কাছে। আলো মরলে সবাই যখন ফিরে যায়, সুকুল একা গিয়ে দাঁড়ায় গাছতলায়।

সূচীপত্র

- "কেমন আছ মধুর?"

- "খুব ভালো। তুমি কেমন?"

- "একটু মনখারাপ।"

- "কেন?"

রোজ কত কিছু ঘটে বাড়িতে, ইস্কুলে, গ্রামে। চাঁদের গায়ে যেমন ছোপ ছোপ দাগ, তেমনই সুকুলের আয়নার মতো মনে একটুখানি অন্ধকার লেগে থাকে ঠিক। সে কথা ও মধুরকে জানায়। মধুর চুপ করে শোনে। তারপর ডালপালা নাড়িয়ে এক ঝুড়ি বাতাস দেয় ঢেলে – কেবল সুকুলকে স্নান করাবে বলে। অশান্তি-উদ্বেগ ধুয়ে ঠান্ডা হয়ে পড়ে সুকুলের মন। ওর আঁজলায় ফুলের সময় ফুল, ফলের ঋতুতে ফল ভরে দেয় গাছ। দুই হাতে মধুরকে জড়িয়ে আদর করে সুকুল ফিরে যায়।

২ /

একদিন শেষ-দুপুরে মাঠে পৌঁছে সুকুল দেখল তখনও আসেনি কেউ। এই সুযোগে ও একটুখানি বসতে গেল মধুরের ছায়ায়। কিন্তু কাছে গিয়েই বরফ হয়ে গেল সুকুলের দেহ। এ কী! মধুরের পুবদিকের একখানা বড়ো ডাল কাটা!

-"তোমার একখানা হাত কে কাটল মধুর?"

- "পুবজমির মালিক।"

- "কেন?"

- "দেখছ না, ওদিকে বেড়া দিয়েছে। ওর জমিতে আমার পাতা ঝরে পড়লে নাকি নোংরা হবে, তাই।"

- "তা বলে... তা বলে... তোমার একখানা হাত কেটে দেবে?"

- "দিল তো।"

নিমেষের মধ্যে ঝড় উঠল সুকুলের মাথায় – সেই হাওয়ার

তাণ্ডব আর কমতেই চায় না। আর খেলা হল না সুকুলের। এলোমেলো পায়ে গোটা গ্রাম ঘুরে বাড়ি ফিরে এল ও। তখন ঝিমঝিম করে গোধূলি ছড়িয়ে পড়েছে আকাশময়। বনবাদাড়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কিটির কিটির পোকাডাক। বড় করুণ ও ক্ষণজন্মা দেখাচ্ছে মানুষের পৃথিবী। ঘরে ঢুকে সুকুল বাবাকে বলল, "মধুরের ডাল কে কেটেছে তুমি জানো?"

-"হ্যাঁ। বঙ্কুখুড়ো।"

- "কেন?"

- "জমি ভাগ হচ্ছে যে। ও মাঠ আর থাকবে না। পুবধারের অনেকখানি বঙ্কুখুড়ো কিনে ঘিরে রাখল। বোধহয় চাষবাস করবে, একটা ঘরও তুলবে। ওর মধ্যে শুকনো পাতা ডালপালা পড়লে অসুবিধা, পরিষ্কার করার বেজায় ঝক্কি, তাই কেটে দিয়েছে।"

কী অনায়াসে কথাগুলো বলে দিল বাবা। লোকটার মুখে এতটুকু দুঃখ নেই! চেনা মানুষটাকে বড্ড অচেনা লাগল সুকুলের। ও বলল,

-"ডাল কাটলে মধুরের লাগে না বুঝি?"

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল বাবা।

-"কেমন হাঁদা রে তুই, গাছের আবার লাগে নাকি?"

- "তবে, কার লাগে?"

- "শুধু মানুষ আর পশুপাখির। গাছের ওই নামেই প্রাণ আছে। ওসব পুঁথি-বিদ্যে। বেদনা টের পেতে গেলে রক্ত লাগে। মাংস লাগে। ডালপালায় বেদনা জাগে না।"

- "কেন?"

- "কেন আবার কী?! এটাই নিয়ম। ডালপালা যেমন ভাগ হতে পারে, আমাদের হাত-পা কি পারে? পারে না। তেমনি আমারা ব্যথা-বেদনা টের পাই, গাছেরা পারে না। যার যেটা ধর্ম।

বীজ থেকে চারা, চারা বেড়ে বেড়ে ছোট গাছ, তার শাখা থেকে প্রশাখা – গাছ শুধু বাড়ে। আর...”

- “আর?”

- “আর মানুষ তাকে একটা মাপ দেয়।”

- “মানে কেটে দেয়, তাই তো?”

- “হুম।”

আর কথা বাড়াল না বাবা।

মানুষ যে একটা খুনি প্রজাতি এ কথাটা মাথায় নিয়ে শুতে গেল সুকুল। কিন্তু ঘুম এল না। ভোর না হতেই ও গিয়ে দাঁড়াল মধুরের কাছে।

-“মধুর।”

- “বল।”

- “তুমি আমার একটা হাত নাও।”

- “এ আবার কেমন কথা?”

- “ঠিক কথা।”

- “তা আবার হয় নাকি?”

- “কেন হবে না? বাবা বলেছে রক্তমাংস না হলে ব্যথা-বেদনা জাগে না।”

- “মানুষ বোঝে না। ওরা সত্য থেকে বহুদূরে।”

- “এমন কেন?”

- “কারণ মানুষেরই একমাত্র মাপের ধারণা আছে। আর কারো নেই। যার মধ্যে একবার মাপবোধ আর হিসেব-নিকেশ ঢুকে পড়ে, সে কেবল ছোট করতে জানে। এই অসুখ থেকে তার মুক্তি নেই।”

- "তাহলে তুমি আমার হাত নেবে না?"

- "না। আমি তোমার একখানা হাত কেটে নিয়ে নিলে, ডাল কাটল যে তার সঙ্গে ফারাকটা রইল কোথায়? দুঃখু কর না সুকুল, এই যে তুমি হাত দিতে চাইলে, আর আমি দেখতে পারলাম তোমার বুকের ভেতর একখানা মেঘ-ভাসা আকাশ রয়েছে, এতেই আমার সব কষ্ট ধুয়ে গেল।"

৩/

দু'দিন পর খেলতে গিয়ে সুকুল দেখল, মধুরের দক্ষিণ ডাল কাটা। ওদিকের জমিতেও বেড়া দিয়েছে। ওদিকেও ডাল গেলে মানুষের অসুবিধা।

বুকে হাজারটা ছুরি বসল সুকুলের। মধুর যেন শুকিয়ে গেছে। যদিও এখনও দিনান্তে ফুল-ফল-বাতাস দেয়, ঠিক ফিরিয়ে দেয় সুকুলের আদর, কিন্তু যন্ত্রণা বড়ো স্থবির করে ফেলেছে ওকে। নিরন্তর উপায় ভাবতে ভাবতে সুকুল শুরু করল প্রার্থনা। নীল আকাশের দেবতাকে ডাকতে লাগল দিবারাত্রি।

একটা ছোট্ট ছেলে এত ডাকছে, দিনে খাচ্ছে না, রাতে ঘুমোচ্ছে না দেখে, একসময় সাড়া দিলেন দেবতা –

-"বলো সুকুল।"

- "তুমি কি আকাশপারে থাকো?"

- "হ্যাঁ"

- "তুমি কি নীলমানুষ?"

- "আমি মানুষ নই, দেবতা।"

- "তোমার রক্তমাংস নেই তো?"

- "না।"

- "তবে?"

- "আমার শরীরে শুধু মেঘ আর রোদ্দুর। কখনও বা ঝড়-বিদ্যুৎ, বৃষ্টিজল।"

- "তবে বেশ। তুমি বুঝতে পারবে।"

- "কী বুঝব?"

-"মধুরের ডাল একটা একটা করে কেটে ফেলছে ওরা।"

- "ওরা কারা?"

- "গাঁয়ের লোক। মানে মানুষ।"

- "আচ্ছা।"

- "এইভাবে তো একদিন মরে যাবে মধুর। উধাও হয়ে যাবে।"

- "আমাকে কী করতে বল?"

- "তুমি মধুরের গায়ে একটু রক্তমাংস দাও।"

- "রক্তমাংস?"

- "হ্যাঁ। তাহলে লোকে ভাববে ও'ও ব্যথা পায়। আর ডাল কাটবে না।"

- "কিন্তু আরেক রক্তমাংস কষ্ট পাবে ভেবে তাকে যে ব্যথা দেয় না মানুষ, তেমন তো নয়।"

- "তবে?"

-"রক্তমাংসের যন্ত্রণাকে স্বীকার করে নয়, রক্তমাংসের প্রতিরোধের ভয়ে চট করে তাকে আঘাত করে না মানুষ। কিন্তু অধিক শক্তিশালী মানুষ আরেক কমজোরি মানুষকে মারছে, এ কি তুমি দ্যাখোনি?"

চুপ করে রইল সুকুল। দেখেছে ও। ফসল তোলার সময়, মাছ ধরার সময়, তাঁতির ঘরে কাপড়-বেচা টাকা এলে মানুষের রূপ

বদলে বদলে যায়। তখন আর কেউ খুড়ো ভাই মা মাসি নয়, কেউ দাদনদার, কেউ মহাজন, কেউ মোড়ল। কী রোয়াব তাদের!

কিন্তু সুকুল ছোটো ছেলে। আর কোনো বুদ্ধি এল না ওর। ও বলল,

-"সে যা হয় হোক। তুমি মধুরকে একটু রক্তমাংস দাও।"

- "যা বলছ, ভেবে বলছ তো?"

- "হ্যাঁ"

- "আর কিন্তু ফিরিয়ে নিতে পারবে না।"

- "আমি ভেবেই বলছি। তুমি দাও দেবতা।"

- "আচ্ছা। তবে তাই হোক।"

৪।

পরের দিন গোটা ক্ষীরজমি গ্রাম ভেঙে পড়ল মধুরের চারধারে। সুকুল গিয়ে দেখল – গাছের শাখায় শাখায় ফুটে উঠেছে শিরা, তার ভেতর দিয়ে দপদপ করে রক্ত চলছে পাতার অগ্রভাগ অবধি! তিরতির করে কাঁপছে পাতারা। আগের মতো আর ঠান্ডা নয় ওরা, সামান্য উষ্ণতা জন্মেছে সবুজ শরীরে। আর কাটা ডালগুলোর মুখে রক্ত শুকোনো দাগ। আনন্দে শিউরে উঠল সুকুলের মন। এইবারে ও নিশ্চিন্ত, আর মধুরের ডাল কাটবে না গাঁয়ের বজ্জাত লোকজন।

মানুষের হুড়োহুড়ি থামলে, একদিন খেলা সেরে সন্ধের মুখে ও গিয়ে দাঁড়াল মধুরের কাছে – ঠিক আগের মতো।

-"ও মধুর..."

-"বল"

-"জান, এখন আমি ভীষণ খুশি।"

-“কেন?”

- “এখন তুমি রক্তমাংসবান। আর কেউ কাটবে না তোমাকে।”

-“হুম”

- “তুমি খুশি তো?”

-“ওই আর কী।”

- “এ আবার কেমন কথা? তোমার গলাটা ভারি ভারি লাগছে কেন মধুর?”

- “কই ভারি? ক’টা দিন কথা হয়নি তো, তাই অমন লাগছে। আমি ঠিক আছি।”

মধুর যাই বলুক, পুরোনো সঙ্গীকে ঠিক চিনতে পারল না সুকুল। কেমন যেন বদলে গেছে ও – একটু ভারিক্কী, একটু দূরের। তবু ও দুই হাতের বেড়ে আদর করল গাছকে। অনেকক্ষণ ধরে। ওর বুকের মধ্যে চারিয়ে গেল মধুরের শিরা-ধমনীর দিপদিপ।

কিন্তু আজ আর সুকুলের আঁজলা ফুলে ভরে দিল না গাছ।

৫।

সুকুল বেশ বুঝতে পারে একটু একটু করে বদলে গেছে মধুর। আজকাল আর সাড়া দেয় না তেমন। ওর ডালে আগের মতোই ফুল হয়, বরং আরও বেশিই হয়। ফলগুলোও পুরুষ্টু হয় খুব। কিন্তু সেই আশ্রয়ী বাতাস আর সুকুলকে দেয় না কেউ। কেন হল এমনটা? ও-ই তো দেবতাকে বলে রক্তমাংস এনে দিল মধুরের শরীরে।

আবার ঘুম হারিয়ে গেল সুকুলের। খাওয়া গেল ঘুচে। ও ডাকতে লাগল দেবতাকে। সুকুলের কাতর আহ্বানে আগের মতোই সাড়া দিলেন আকাশপারের ঈশ্বর –

বলো সুকুল।

মধুর বদলে গেল কেন?

রক্তমাংস পেল বলে। আমি তো দেওয়ার আগে তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সুকুল।

হ্যাঁ... তা করেছিল... কিন্তু রক্তমাংস গায়ে এলে যে মধুর বদলে যাবে, তা তো বলোনি.. ও বদলে গেল কেন?

রক্তমাংসের মধ্যে নিহিত রয়েছে দূরত্ববোধ। অহং। অপ্রাপ্তির আক্ষেপ। যেখানে যাবে তাকেই দূষিত করবে এই রক্তমাংস।

আকুল হয়ে উঠল সুকুলের মন। এ কী হল?

"তুমি ওর রক্তমাংস ফিরিয়ে নাও।"

-"তা আর হয় না।"

-"কেন?"

-"রক্তমাংস দেওয়া যায়, ফেরান যায় না।"

-"কেন?"

-"রক্তমাংসের মধ্যে একটুখানি করে মিশে যায় আমার আয়ু। ওর ওপর আর জোর খাটে না আমার।"

-"তাহলে উপায়?"

-"নেই"

এই বলে ফিরে গেলেন মেঘ-বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া দেবতা।

৬ /

পড়ায় মন বসে না সুকুলের। পাঠশালা থেকে অভিযোগ আসে। খেলায় ডাকতে এসে বন্ধুরা ফিরে যায়। ঋতু বদলায়। মধুরের ডালে ফল ধরে। গাছ ছেঁকে ধরে ছেলেবুড়োর দল। লোকমুখে সুকুল খবর পায় ডাল থেকে দুজনকে আছড়ে ফেলেছে

মধুর। কারো হাত কারো বা পা গেছে ভেঙে। গাঁয়ের মানুষজন বলাবলি করে – নিশ্চয়ই কোনো অপদেবতা ভর করেছে মধুরের ওপর। ওই গাছটাকেই শেষ করে দিতে হবে এবার। শিকড় থেকে উপড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

গোটা ক্ষীরজমি ডুবে যায় হত্যাকল্পনায়। ষড় চলে। আটচালায় ভিড় জমে সন্ধে হলেই। আর এই সমস্ত কিছু থেকে একটু একটু করে উঠে যায় সুকুলের মন। একটা ঘুড়ি উড়ছিল বহুদিন, আজ সে ছিঁড়ে গেছে। লম্বা সুতো নিয়ে সে ভাসছে। ভেসেই চলেছে। হঠাৎ করেই অনেক বড় হয়ে যায় সুকুল। ওই ছিন্ন রশি, ঠিকানাহীন ঘুড়ি, ওর পরিণত মন।

আবার একদিন দেবতাকে ডাকল সুকুল।

-“বল সুকুল।”

-“আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর। এই শেষবার।”

-“যা চাইবে, ভেবে চাইছ তো?”

-“হ্যাঁ। খুব ভেবেছি।”

-“বেশ, বলো...”

-“এই গ্রাম থেকে অনেক দূরে, যেখানে মাঠের পরে মাঠের পরে মাঠ, আমাকে নিয়ে চল, আর সেইখানে একটা গাছ করে দাও। মধুফল গাছ।”

-“রক্তমাংস দেব সেই গাছে?”

-“না। একটুও না। আমাকে শুধু শিকড় দিও। মাইলের পর মাইল শিকড়। ফসলখেতের তলা দিয়ে, মানুষের বাড়ির নীচ দিয়ে, নদনদীর তল ঘেঁষে, আমি যেন ছড়িয়ে পড়ি।”

-“আচ্ছা, তাই হোক।”

এই বলে চলে গেলেন দেবতা।

পরদিন সুকুলকে কোত্থাও খুঁজে পেল না কেউ। পৃথিবীর প্রত্যন্ত এক মাঠে জন্ম নিল একখানা বিরাট মধুফল গাছ। জনহীন সেই দেশে মানুষ আসে না তার কাছে। তাকে ঘিরে থাকে প্রজাপতি, ভ্রমর, মথ, পতঙ্গের দল। আর পাখি আসে, পাখি যায়।

পাথর

শক্তি দত্তরায় করভৌমিক

পাউলুস, এ পাউলুস ছোড়া এখানে কী করছিস বটেক? সুরিয়া বুড়ির তীক্ষ্ম মিষ্টি ডাক উড়ে যায় হাওয়ায়। বুড়ি হাতের কালচে দাগ ধরা ধাতব খাড়ু বাজিয়ে হাত ঝামরে ঝামরে কলাকুচি নদীতে কাপড় কাচছে। আধখানা বাংলা সাবানের সাদা গোল্লায় ফেনা তুলছে। নদীর কিনারে বন্যার জলে কোন মন্দিরের পাঠের সিঁড়িটা ভেসে এসে ইকরা গাছের ঝোপে আটকে গেছিল। ওটাই কাপড় কাচার পাট। এখানে বাগানের ধোপাও কাপড় কাচে। ওর মধ্যেই খোদাই করা কোন ঠাকুর - হাতে একটা চাকা, একটা পদ্মফুলের কলি - কোন ঠাকুর কে জানে, তবে দয়ামায়া আছে। এই যে কলাকুচি বস্তির সব কাপড় আছড়ে আছড়ে কাচে সবাই - দেবতা কিন্তু পাপ দেয় না। কোথায় কাচত না হলে এরা? দুপাড়ে শুধু কাদা মাটি, বড় বড় ঘাস, কাঁটাগাছ। তা মানে না তা নয়। কাচার আগে কপালে হাত ঠেকায়, কাচা হয়ে গেলে স্নান করে। দুটি লালপাতিয়ার লাল সাদা পাপড়ি ছিঁড়ে ঠাকুরের নূপুর পরা পাথরের পায়ে দেয়। নমন করে। বুঝতে চেষ্টা করে ঠাকুরটো গাবরু না ডেকা? অর্থাৎ স্ত্রী দেবতা না পুরুষ দেবতা। জলে হাওয়ায় খোলা আকাশের নীচে বানের জলে ভেসে আসা ঠাকুরকে দেখে বোঝা যায় না কিছু। পাথরের প্রাচীন দেহ ক্ষয়ে গেছে। মনসা পূজার দিনে সবাই যখন পিদিম জ্বলা কলার ভেলা ভাসায় তখন এই ঠাকুরকেও কলা চাল বাতাসা নৈবেদ্য দেয়। গরীব মানুষ, যে যা পারে। ঘিরে ঘিরে ছিনিমিনি ভাষায় কী গান গায়, নাচে, ধূপবাতি দেয়। ছোটমোট একটা মেলাও বসে।

দেবতা খুশিই হন। অনেক সময়ে উঠতি ছেলে মেয়েরা এই পাথরে পা ঝুলিয়ে বসে গল্পগাছা করে। দেবতা সহ্য করেন, শাপমান্যি করেন না। যেতে যেতে মেয়েটি ফিরে চায়, দুহাত কপালে ঠেকায়। সুরিয়া বুড়ির মুখে একটু হাসি - পুরনো ঠাকুর নূতন দিনের ছোড়াছুঁড়িকে কি একটু আস্কারা না দিয়ে পারেন! বুড়ি আবার চ্যাঁচায় - এ পাউলুস, পাউলুস রে-এ-এ-এ।

পাউলুসের বয়ে গেছে বুড়ির ডাকে সাড়া দিতে। হ্যাঁ, মা-টা যেবার মরলো সেবার বুড়িটা খুব মরম করে ওকে চালভাজা, ফলটা, মিঠাইটা খেতে দিত। কাঁচা পেয়ারা খেয়ে পেট খারাপ হলে কাঁথাকানি ধুয়েও দিত। কিন্তু এখন ওর বুড়ির বকবকানি শুনলে হবেনা। তেকোনা জালে নদীর খোঁদলে লুকিয়ে থাকা দুয়েকটা কাঠুয়া যদি ধরতে পারে, বড়জুলির হাটে বিক্রি করে কটা টাকা পেলে ঢেকিয়াজুলি যাবে সিনেমা দেখতে। একা নয়, হ্যাঁ হ্যাঁ, সঙ্গে কেউ যাবে বইকি, সেকথা এখন থাক। পাউলুস পেছন ফিরে দেখে বুড়ি স্নান সেরে পাত্থর দেবতাকে ফুল চড়িয়ে এক বালতি কাপড় নিয়ে কাত হয়ে হাঁটছে আর সামনে দূর্জেনের বড় বিটিটা গান গাইতে গাইতে চলেছে - কুটি কুটি চায়ের পাতা বিলি বিলি বিলি - - - .। কী গান, কী হাঁটার ছিরি! পাউলুস আবার জালের দিকে মন দেয়। এবার কটা ছটফটে ভাঙ্গন মাছ উঠেছে জালে - মায়াভরে পাউলুস দ্রুত হাঁটে। এ নানী - নানী - নানী - টুকুস দাঁড়া, মাছ কটা লিয়ে যা - এ নানী -।

মাছ কটা সোমারীর হাতে, কাপড়ের বালতি নিয়ে বুড়ি লালমাটি আর পাথরের পথে কষ্টে হাঁটে। জলছেঁড়া সূর্য্যিটা বড় তাপ ছাড়ছে, কপালটা ঘামছে, অথচ এখনই ডুবচান দিয়ে উঠল। বড়রাস্তায় উঠতেই ট্র্যাক্টর চালিয়ে থামল চাবাগানের নার্সারির রোজারিও। একপ্যাকেট ডঙ্কা আগরবাতি হাতে দিয়ে বলল - একটা মোমও দিল - মৌসী, মেরীজুনের নামে পাত্থরঠাকুরের কাছে একটু প্রে কোর। রোজারিও তেজপুরের চার্চে যায় ফি-রোববার। ওর ঘরে যীশুবাবার ক্রুশবেঁধা ছবি। আহা, ভগবানের এত দুখ, তো মানুষের হবে না কেনে! রোজারিওর দুঃখও সুরিয়া জানে।

ওর মেয়েদুটি খুব ধলা। একটা বারো একটা চৌদ্দ। মিসামারির ম্যাথুসাহাব ফৌজিসাহাব - সেও খিরিস্তান। লেখাপড়া শিখিয়ে বিয়া দিব বলে কোচিন না কই নিয়া গেল। গরিব রোজারিও বলে এংলোইন্ডিয়ান সাহেবের জাত। মেয়ে দুটি ভালো খাবে পরবে বলে দিয়ে দিল। এখন শুনছে জুন নাকি লুকিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে তারা দুই বহিন বহুত খারাপ আছে। গরিব সাহেব রোজারিও এখন চার্চে মোম দেয়, উদালগুড়ি পীরের মাজারেও মোম দেয়। এই চারহাত ভগবানকে মোম ধূপকাঠি দিতে চায় বুড়ির হাতে। হ্যাঁ, সুরিয়া কালকে গোলাপফুলের মত মেয়েদুটির নাম করে দিয়ে দেবে বৈকি ঠাকুরের কাছে। এটা চা বাগান - কার নানা পরনানা কোন জাত কোন গেরাম কোন জেলা থেকে কোন আড়কাঠির সঙ্গে এখানে ওখানে এসে পড়েছিল তারা জানেনা। তাদের সন্তান সন্ততিরা সবাই কুলি। এখন অবশ্য কুলি বলেনা, লেবার বলে। তারা এত জাতজন্মের খোঁজ রাখেনা। ঘামে শ্রমে হাঁড়িয়ার ঠেকে ওঠাবসা একসঙ্গে। তাদের দেবদেবীরাও একাকার। পাতি তোলে বাগানে নিড়ানি দেয়, চাঘরে ডায়নামো চলে, ড্রায়ারের আগুন গরম তাতে খাটে। দুপুরে একই পাত্র থেকে লাল চাহাপানি খায়। ওদের বামুন শুদ্দুর নাই, ওসব আছে বাবু কোয়ার্টারে। ডাক্তারবাবু বামুন, চাঘরবাবু শুদ্দুর, বাগানবাবু বড়গোঁহাই। তাদের খাওয়া ছোঁয়া ঠাকুরদেবতায় একটু আধটু নিয়ম নিষেধ আছে। বেচারী রোজারিও একুল ওকুল কোন কুলেরই নয়।

সোমারী কাজ করে ম্যানেজারের বাংলোতে। এরা বলে বাংলা। ম্যানেজারের মালি দূর্জেন। সোমারী শুনেছে ম্যানেজার ধরচৌধুরীসাহেব আর থাকবে না, চলে যাবে শিলচর। বাঙালি মালিক বাগান বেচে দিয়েছে কোন শর্মাজির কাছে। দিল্লিওয়ালা না কি বম্বেওয়ালা, তবে বাঙ্গালি না। তারা নূতন ম্যানেজার আনবে - কী নাম, বাপরে - হনুমানপ্রাসাদ ত্রিপাঠি। কী জানি কেমন হবে মেজাজ কেমন হবে দিল দেমাক। বাগানের বাবুমহলও শঙ্কিত। ব্রিটিশ মালিকানার অত্যাচারজর্জরিত শ্রমিক মাঝের বছরগুলোয় একটু হাঁপ ছেড়েছিল। এখন আবার কী হয় কে জানে। ফিসফাস

চাপা টেনশন চলতেই থাকে। রাজা পাল্টায় - প্রজার ভাগ্য কতটুকু পাল্টায়? তবু ঊনিশবিশ সাতসতের চিন্তা তো হয়ই। ইংরেজ মালিকের দয়ার গল্প, আবার অমানুষিক অত্যাচারের গল্প - যেমন রাতদুপুরে হরজুর ঠাকুমার বোনকে সাহেব ম্যানেজার জর্জ ওয়ালার ডেকে পাঠিয়েছিল তার বাংলায়, যেতে চায়নি, শেষ পর্যন্ত যায়নি। তার জন্যে তার বাপ ভাইকে ভাদ্দুরে গরমে রোদে আর বৃষ্টিতে পাতিঘরের ছাদে দিনভর হাত পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছিল সাহেব। বাপটার ঘাড় ঝুলে পড়েছিল বিকেলের আগেই, জিভ বের করে জল চেয়েছিল, পায়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুঁটিতে বাঁধা অবস্থাতেই মরে গিয়েছিল। আর ভাইটা? দিনভর সুয্যির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আধাকানা হয়ে গিয়েছিল। জীবনভর চোখে প্রায় দেখতে পায়নি। হরজু তার বৌকে শুয়োরের মাংস কেটেকুটে দিতে দিতে পুরনো গল্প আবার শোনায়। আজাদি হল, কেউ বলল এইবার দিন পাল্টাবে। চা মাজদুর ইউনিয়ন হলো, তা পুরোটা কি পাল্টালো? বাবুদের বাড়ি বেগার খাটা, গালি অপমান সব দুখ কি আর দূর হলো? তবু চলছিল একরকম। এখন আবার কোন পালা শুরু হয় কে জানে! ফিসফাস আলোচনা চলতে থাকে। পাত্থরদেবতা নাহারগাছের তলায় শুয়ে শুয়ে এসব দুঃখের কথা নীরবে শোনেন। সইবার ক্ষমতা দেন। রইতে গেলে সইতে হয়।

বস্তিতে সুবলমাস্টার আজকে তুলসীদাস পড়বেন। তিনি আসেন মাঝে মাঝে, সুর করে রামায়ণ গান শোনান। ভোজপুরী টান, গলাটি মিঠে মিঠে। শুনতে সকলেই ভালোবাসে। পয়সা টাকার খাই নেই, একটা পিদিম একটা ধূপতি আর একটা কাপড়ঢাকা জলচৌকি হলেই খুশি। আজকে আবার আসরের তোড়জোড় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাগানের একমাত্র পুরুতঠাকুরের আগমন পুরো লেবারবস্তির মেয়ে মরদকে সন্দিহান করে তুললো। মাঝেমাঝে পুরুত একটু লাগে বৈকি। একটু আধটু ধর্মাচরণ। নাবাল আসামে কে না মনসা মাইকে ভয় পায়। দুধ কলা পদ্মফুল সব নিজেরাই জোগাড় করে, মন্তরটা কি আর পড়তে পারে বামুন

ছাড়া? তখন এঁকে ডাকে এরা। ইনি তুচ্ছতাচ্ছিল্য তুই তোকারি করেন। খাই এঁরও বেশি নয়। কিন্তু লেবাররা হদ্দ গরিব। তায় তলবের বেশিটাই যায় হাঁড়িয়ার নেশায়। এরা পুরুতঠাকুরকে এড়িয়ে চলে।

হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী অপেক্ষা করেছেন কখন আসর বসে। তুলসীদাস শোনার সময় তার নেই। তিনি তাঁর কথাটুকু বলেই বিদায় নিতে চান। থাকেন একটু দূরে, ঘোষপাড়ার কাছে। একঘর বামুন, ঘোষপাড়ার বাঙালিরা তাঁকে দিয়ে শনিপুজো লক্ষ্মীপুজো করায়; সস্তা শাড়ি ধুতি নারকেলটা দক্ষিণাটা দেয়। অসমিয়া গৃহস্থরা নিজেদের ব্রাহ্মণকেই ডাকে। রিফ্যুজি বামুনের কদর করেনা তারা। তবে হ্যাঁ, ওঁর যজমান বাগানের ম্যানেজারবাবুর মা। শনি সত্যনারায়ণ লক্ষীপুজো সবেতে মোটা দক্ষিণা দান ব্রাহ্মণভোজন - ওঁর দয়াতেই হরিশচন্দ্রের চলে মোটামুটি। বছরে একটা দিন অশিক্ষিত কুলিদের পাত্থরঠাকুরের পায়েও দুটি জবাফুল বেলপাতা দেন। অংবং করেন, এরা চাঁদা তুলে দক্ষিণা দেয়।

সুবল আসনে বসার আগেই বামুনঠাকুর কিছু বলতে চান। সুবল আপত্তি কি আর করতে পারেন! হরজু সর্দার আর সুরিয়াবুড়ি ছেলেছোকরাদের ধমকান। চুপ যা, থাম। ঠাকুরমশাই কী বলে শোন। অল্পবয়সি ছোঁড়াছুঁড়িগুলো তুলসীদাসেও মন নাই। বড়রা পাঠ শুরু হলে ঢুলবে আর এরা পাতিঘরের ছাদে উঠে নাচাগানা শুরু করবে। এখন সবার বকাঝকা খেয়ে থামল।

পুরুতঠাকুরের বক্তব্য হল তিনি ম্যানেজারের বাড়ি থেকে শুনে এসেছেন হনুমানপ্রসাদ ত্রিপাঠি নামে নতুন ম্যানেজার এই রোগাপটকা বেঁটে মছলিখোর বামুনকে দিয়ে পূজাপাঠ করবেন না। তেজপুর থেকে পশ্চিমা পুরুত আসছে, লম্বা চওড়া টকটকে রং সংস্কৃত জানা পাশ করা পুরুত। এতদিনে হরিশচন্দ্রের ভাত উঠল বলে। পুরনো ম্যানেজারবাবু আজকেই জানিয়ে দিয়েছেন আগাম খবর। এখন এ তো এক পুরুত ভাত মারছে অন্য পুরুতের -

এতে সোমারী, দুরজেন, পাউলুসদের কী? রোজারিওরই বা কী? আছে, আছে কথা। বাংলার বিরাট চৌহদ্দিতে নতুন পুরুতের কোয়ার্টার হবে। আর হবে মন্দির। পাত্থরঠাকুরকে তুলে নিয়ে যাবে মন্দিরে।

শহুরে কটা বাবু আর দিদি এসেছিল না সেদিন লিপস্টিক মাখা চুড়িদার পরা? পাত্থরদেবতাকে ওরা নাকি বলেছে বিষ্ণুদেবতা। চার হাত, হাতে পদ্ম। নূতন মালিকের মতে এই দেবতাকে মন্দিরে না রাখলে পাপ হবে। নাকি হয়েও চলছে পাপ, বারো জাতির ছোঁয়া লাগছে। কাপড় কাচছে, পাথরে চড়ে বসছে। এ চলতে দেবেনা। প্রবীণ শ্রমিক নারী পুরুষ দাদা পরদাদার আমল থেকে এই বাগানে কাজ করছে। এই ঠাকুর তাদের সাপের কামড়, বন্যা, ম্যালেরিয়া তাবৎ উৎপাতে ভরসা। এরা এই দেবতার অধিকার ছেড়ে দেবে? কেন দেবে? টাকা আছে বলে দেবতাকে কিনে নেবে? হয় নাকি?

আজকে তুলসীদাসে কারো যেন তেমন মন বসল না। সুবল মাস্টারও বেশিক্ষণ পাঠ করল না। শুক্লা দশমীর চাঁদ মাঝ আকাশে ওঠার আগেই আসর ভাঙল। সবচেয়ে মাথাঠান্ডা মংলুসর্দার সবাইকে বোঝাল - দেখাই যাক না কী হয়।

ফিসফাস চলছে। ওদিকে বাংলোর বাগানের ওপাশে ইঁট দিয়ে টালির চালার মন্দির উঠছে ওদিকে ইকরার বেড়ায় সিমেন্ট প্লাস্টার দিয়ে পুরুতের কোয়ার্টার। গরীব রোগা টাকমাথা হরিশচন্দ্র চক্রবর্তী দীর্ঘশ্বাস ফেলে। পুববাংলার গরীব বামুন, ভিটেটুকু ছাড়া আর কীইবা ছিল! তাওতো ছেড়ে আসতে হয়েছিল শূন্য হাতে। এপারে এসে ক'দিন থিতু হয়েছিল, এখন আবার এই বাগানের কুঁড়ে ছেড়ে কোথায় খুঁজবে নতুন জীবিকা নতুন আশ্রয়! বুদ্ধিও কষে। সন্ধ্যায় সকালে লেবারবস্তির বুড়ো জোয়ান সর্দারদের তাতায় - এতদিনের ঠাকুরকে কেন তোদের থেকে ছিনিয়ে নেবে? তোদের কোন সম্মান নাই? হলই বা মালিক। এটা আজাদ দেশ কি না? এক মংলুই ত্রস্ত। বলে - কী করব? হামরা

কি উয়াদের সঙ্গে লড়ে পারি? সুরিয়াবুড়ি রেগে আঙ্গুল নাড়ে - কেনে পারব না, পারতে হবেক। পাউলুসও বলে, আলবাত পারব। মালিক একলা কি করবে, আমরা এতজন। লড়ব হামি সব। দিব না দেবতারে।

একদিন হাতি নিয়ে এল লোকজন। ভারী পাথর, কবেকার কোন পাথুরে দেবালয় থেকে ভেসে আসা খিলান, হয়তো বানরাজার প্রাসাদেরই ভাঙা অংশ কি ভরলী মন্দিরের। হাতি দিয়ে শিকল বেঁধেই হয়ত টেনে তোলা হবে।

মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলে। উত্তেজনায় তলায় তলায় বাড়ে। আশেপাশে টিউলিপ, বেলসিড়ি, সিরাজুলি চাবাগানের লেবাররাও কানাঘুষো খবর পায়। সহানুভূতি সবারই। গরীবের পাথরঠাকুর কোন দিল্লিওলা শর্মার কথায় সিমেন্টের কুঠুরিতে বন্দি হবেন। কালাকুচি নদীর তীরে নাহার গাছের তলায় তাঁর এতদিনের বাস। শূন্য গাছতলায় তারা কার কাছে দুটি লালপাতিয়া ফুল, দুটি চিনিচাম্পা কলা আর আগরবাত্তি দিয়ে সুখদুঃখের কথা বলবে। জেদি পরিশ্রমী মানুষগুলির আঁতে বড় লেগেছে। হতে দিবেক নাই এই জুলুম।

নূতন মালিক মহাবীর শর্মার আসামে আরো তিনটি চাবাগান, গুয়াহাটির এডভোকেট লাখোটিয়া তার আইনি পরামর্শদাতা। সরকারের ওপরমহলে লোক আছে, ব্যবসা চালাতে গেলে না থাকলে চলে না, তায় চা বাগানের ব্যবসা। শর্মাজি খবর রাখছেন, তৈরিও হচ্ছেন। এইসব আগে বন্ধ করতে হয়।

সারা অঞ্চল জুড়ে ফাগুয়ার ধূম। রাজবংশীরা ঠোঁটে পুঁইবিচির রং মেখে রাধাকৃষ্ণ সেজে একে অপরকে রং দেয়। শ্রমিকরা হাঁড়িয়া খেয়ে উদ্দাম হোলি খেলে। সমাজ - নিয়ম - বাবুভায়া কারোর পরোয়া করে না - চারদিকে হোলি হ্যায়।

আজকের শুভদিনে পাথরঠাকুরকে শুদ্ধ করবেন বলিষ্ঠ ফর্সা লম্বা নতুন পুরোহিত। ছোট মানুষের সঙ্গে থেকে ঠাকুর অশুদ্ধ

হয়েছেন যে। অভিষেক হবে দেবতার। দুই সহকারী প্রকাণ্ড পেতলের থালায় নারিয়েল চন্দন চাল কুমকুম নিয়ে প্রস্তুত। বাজনদার এসে গেছে। হরিশচন্দ্র পাউলুসকে বলে - তোরা ছেড়ে দিবি পাত্থরঠাকুরকে? না না, কভি নেহি। পাউলুস, তার মামাতো ভাই সিরাজুলির বুধনও গলা তোলে নেহি নেহি। সোমারী বলে হামিরা কি পারবো উয়াদের সাথে? পারতে হবেক। সুরিয়াবুড়ি হরজু সব একমত। দেবতার অধিকার ছিনিয়ে নিতে দেওয়া হবে না।

পাত্থরঠাকুরকে ঘিরে ভীড় জমে যায় কলাকুচির ঘনঝোপে ঘেরা নাহার গাছের তলে। শেষরাত থেকে জমা হয় বাগানের লেবার। নারী পুরুষ গাবরু ডেকা। নাই ছাড়বো মোদের দেবতা মোরা নাই ছাড়বো।

মাঠে হাঁড়িয়ার বড় পাত্র, মাটির গামলায় রং পিচকারি। উতসবের আনন্দ আর প্রতিরোধের উত্তেজনার উন্মাদনা ছড়ায়, বাবুপাড়া শঙ্কিত। পুলিশকে খবর দেওয়াই ছিল।

পুলিশের গাড়ি পৌঁছতে উত্তেজিত মানুষগুলি পাগল হয়ে ওঠে। পুলিশ মাইক বাজিয়ে কীসব ভাল কথা বলতে চায়। উৎসব, হাঁড়িয়া, অধিকারের দাবিতে আচ্ছন্ন মানুষগুলির মিলিত আবেগ ফুঁসে ওঠে - - ঢিল ছোঁড়ে - পুলিশ শূন্যে গুলি ছোঁড়ে। তির ধনুক লাঠি বল্লম টাঙ্গি বেরিয়ে আসে লেবারবস্তির বঞ্চনাপীড়িত অন্ধকার থেকে। সোমারী সুরিয়াবুড়ি দূর্জেন হরজু মংলুসর্দার চেঁচিয়ে ওঠে - নাই দিবা - হামাদের দেবতা হামিরা নাই ছোড়ব। মশাল জ্বলে ওঠে হাত থেকে হাতে।

পুলিশ গুলি চালায়। সোমারী আঁকড়ে ধরে পড়ন্ত পাউলুসকে।

হরিশচন্দ্র চাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোলাহল শোনেন। ফাগুয়ার চাঁদ পশ্চিমের আকাশে ঢলে পড়েছে। পাউলুস পাত্থরঠাকুরের দিকে পা কালাকুচির জলে মাথা রেখে ঝুলছে - সোমারীর আর্তনাদ ভাসে না না, তুই যাবি না, যেতে দিব না

তুকে। নাই ছোড়বো।

লালপাতিয়ার গাছ ঢলে ঢলে পড়ে নদীর জলের লালে। পাথরের দেবতার শয্যা বেয়ে মানুষের রক্ত গড়ায়, ঠাকুর শুয়ে থাকেন কালও যেমন ছিলেন। আর্তনাদ, গর্জন আছড়ে পরে আকাশ জুড়ে, নাই ছোড়ব। খরস্রোতা নদীর ওপারে উৎসবের চাঁদ ডুবে যায়।

দাউদাউ আগুন, সেই আগুনের আভায় লাল আকাশ দেখা যায় সিরাজুলি, বেলসিরি, টিউলিপ চাবাগানের শ্রমিক বস্তি থেকে। কলাকুচি নদীর রক্তমেশা স্রোত বয়ে চলে অন্য ঘাটের দিকে।

কল্প

ইন্দ্রাণী

ফুলশয্যার রাত অবধি অহনার ধারণা ছিল, সব বাড়িরই নিজস্ব কিছু পুরোনো গল্প আছে। প্রাচীন বালাপোষ আর জরিপাড় শাড়ির সঙ্গে সেইসব কাহিনী মথবল দিয়ে তুলে রাখা থাকে। তারপর যেদিন আত্মীয় বন্ধু বহু বৎসর পরে একত্রিত- হয়ত বিবাহ, কিম্বা অন্নপ্রাশন, অথবা শ্রাদ্ধবাসর- সেই সব গল্পকথা আলমারির অগম সব কোণ থেকে আলগোছে বের করে এনে রোদে দেওয়া হয়। এমনি করে, প্রপিতামহর খুল্লতাত অথবা অতিবৃদ্ধ মাতামহীর পিতৃশ্বসাপতির একটি দুটি আখ্যান, ব্রোকেন টেলিফোন খেলায় যেমন হয় আর কি- মুখে মুখে ফেরে আর একটু একটু করে বদলে যেতে থাকে। আসলে, অহনা এরকম কিছু গল্প শুনে বড় হয়েছে; প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ মাতামহী অথবা পিতৃশ্বসাপতি শব্দগুলি এবং পুরোনো ভারি অলঙ্কারের মত সরোজিনী, বা নীলাম্বর অথবা সরসীবালা নামের প্রতি প্রগাঢ় মায়াও তার আশৈশব। বস্তুত, অহনার নিতান্ত বাল্যকালে, পিতৃপক্ষে,তার জ্যেষ্ঠতাত বাড়িতেই তর্পণের আয়োজন করলে, অহনা ঘুম ঘুম চোখে, সেইখানে গিয়ে বসত। আশ্বিনের সেই সব ভোর-তাদের বড় ঘরের লাল মেঝে- কোশাকুশি তাম্রপত্র-জ্যেষ্ঠতাতর গরদের ধুতি চাদর কপালে চন্দন আঙুলে কুশের আংটি- এতৎ সতিল-গঙ্গোদকং, তৃপ্তিমখিলাং যাস্তু,অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা - রহস্যময় সে সকল শব্দ...প্রতিটি কথা, সমস্ত পুরাতন নাম, প্রাচীন সম্পর্ক নিজের মনে, নিজের স্বপ্নে ঢুকিয়ে নিত বালিকা; অবসরে, ঘুমে, শব্দগুলির সর্বাঙ্গে হাত বোলাত পরম মমতায়-

অহনাদের বাড়িতে, যে দু তিনটি গল্পকথা ঘুরে ফিরে বেড়াত-

নবীন জামাতা, নববধূ বা নবলব্ধ কুটুম্বকে শোনানো হ'ত, তার মধ্যে দুটি কাহিনী তার প্রিয় ছিলঃ অহনার প্রপিতামহীর কোনো খুল্লতাত সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন -গল্পে তিনি সন্ন্যাসীদাদু। বলা হ'ত, সন্ন্যাসীদাদু নাকি এখনও তাঁর বংশধরদের দেখা দেন - গৃহস্থের দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেন সন্ন্যাসী-হাতে দন্ড, কমন্ডলু, মাথায় পাগড়ি, শরীরে দিব্যাভা- দু দন্ড বসেন, তারপর আশীর্বচন আউড়ে স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে যান। বস্তুত অহনার ঠাকুমার পুজোর ঘরে সেই সন্ন্যাসীর একটি ছবি ছিল-ফ্রেমে বাঁধানো হলদেটে ছবিতে পাহাড়ি নদী গাছ ঘরবাড়ি দেখা যেত - সামনে তিনি হাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে। ছবিটি অহনার খুব প্রাচীন মনে হত না। সে কথা বললে, ঠাকুমা দুই হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে বলত -'হ্যার বয়স বাড়ে না'। অহনা বিশ্বাস করত না কিন্তু গল্পটা ওর ভালো লাগত; ছবির সঙ্গে গল্প বা গল্পের সঙ্গে ছবি মেলাতে চাইত। ছবিখানি কবে কে কোথায় তুলেছিল, সে ছবি ঠাকুমার কাছে কি করে এল তা নিয়েও এযাবৎ অচরিতার্থ কৌতূহল অহনার।

সন্ন্যাসী দাদুর গল্প ব্যতীত বৃদ্ধপ্রপিতামহী হিরণ্যপ্রভার কাহিনী অহনার অতীব প্রিয় ছিল। শোনা যায়, হিরণ্যপ্রভা চিত্র রচনায় সবিশেষ পটু ছিলেন- গৃহস্থালির সমস্ত কাজের মধ্যেও উঠান, তুলসী মঞ্চ, গৃহের মৃৎপাত্রগুলিতে তিনি নিরন্তর ছবি এঁকে চলতেন- অঙ্কনকালে শত ডাকেও সাড়া দিতেন না। একদা দ্বিপ্রহরে পুরুষেরা ভোজনে রত, মেয়েরা সন্তানের পরিচর্যায় অথবা রন্ধনে কিম্বা পরিবেশনে ব্যস্ত - বেলা অনেক, অথচ সেদিন তখনও তাদের স্নানও সারা হয় নি-সেই সময় উঠোনে এক বিশাল হাতি এসে দাঁড়িয়েছিল। হাতির সর্বাঙ্গে অলংকরণ, হাওদাটি সুসজ্জিত। উঠোনে দাঁড়িয়ে মাহুতবিহীন সুবৃহৎ সে হাতি বৃংহণ করেছিল। সেই ধ্বনিতে, রন্ধনকক্ষ থেকে হিরণ্যপ্রভা বেরিয়ে এলে, হাতিটি হাঁটু মুড়ে বসে এবং হিরণ্যপ্রভা কোনোদিকে না তাকিয়ে হস্তীপৃষ্ঠের সুসজ্জিত হাওদায় অধিষ্ঠিতা হ'ন। কথিত আছে, সে সময় তাঁর ঘোমটা খসে পড়েছিল- রুক্ষ কেশদাম

মধ্যাহ্ন সূর্যের আলোয় মুকুটের মত দেখাচ্ছিল।সেই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে, হাতিটি তাঁকে পিঠে নিয়ে মিলিয়ে যায়। হিরণ্যপ্রভা আর ফিরে আসেন নি।

এই গল্পদুটি, কলেজজীবনে অহনা ওর প্রাণের বন্ধু শাল্মলীকে বললে, শাল্মলীও অনুরূপ কিছু ঘটনা শোনায়- যেমন, কোনো কালে, শাল্মলীর মামার বাড়ির দিকের এক বাল্যবিধবা গভীর রাতে নির্জন ছাদে, দু হাত আকাশে তুলে আপন মনে ঘুরে ঘুরে নেচে চলত; তারপর এক জ্যোৎস্নারাতে সে ডানা মেলে উড়ে গিয়েছিল। শাল্মলী তার নাম বলতে পারে নি।

অহনা বলেছিল, 'নাম না থাকলে, গল্প ভালো লাগে না। ওর নাম আমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখি ? অঙ্গনা ?'

-'ঠিক। অনাম্নী অঙ্গনা'। শাল্মলী হেসেছিল।

বস্তুতঃ এই সব প্রাচীন কাহিনীর আদানপ্রদান অহনার প্রিয় ছিল। নতুন আত্মীয় পরিজন, নবলব্ধ বন্ধুদের এই গল্প শোনানো সে বাধ্যতামূলক মনে করত-যেন এ গল্প না শোনালে তার পরিচয় দেওয়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

অতএব, অহনা যে ফুলশয্যায় তার নবীন স্বামীটিকে সন্ন্যাসীদাদু অথবা হিরণ্যপ্রভার কাহিনী বলবে এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। গল্প শেষ করে সমরের পরিবারের অনুরূপ প্রাচীন কোনো গল্প শুনতে চেয়েছিল অহনা। সমর বলেছিল, 'তোমার মত গল্প শোনার টাইম আমার ছিল না। গল্প ঠল্প কিছু নেই আমাদের। ' তারপর মিলনে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

অহনার শ্বশুরমশাই বহুদিন গত, শাশুড়ী পক্ষাঘাতগ্রস্ত- প্রাচীন কোনো কাহিনী জানা থাকলেও তা বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সমরের বাড়ির চিলেকোঠায়, খাটের তলার প্রাচীন তোরঙ্গে কোনো প্রাচীন অক্ষর সে খুঁজে পায় নি গত এক বছরে। কেবল, সমরের মামাবাড়িতে প্রণাম করতে গিয়ে, ঠাকুরঘরে আলমারির মাথার ওপরে নীল মার্কিন কাপড়ের ঢাকনা দেওয়া এক বাদ্যযন্ত্র

দেখেছিল।

অহনা বলেছিল, 'এস্রাজ? কে বাজায়?'

সমর আশ্চর্যরকম কঠিন মুখ করে বলেছিল, 'বাজাতো। আমার ছোটোমাসি। ' তার যে কোনো মাসিশাশুড়ি আছেন তাই জানতনা অহনা-সে অবাক হয়ে তাকালে, সমর বলেছিল-'হারিয়ে গেছে'।

-'কেমন করে? ' অহনা জিগ্যেস করেছিল। এই প্রথম সমরের পরিবারে সে একটি গল্পের খোঁজ পাচ্ছিল।

সমর বলেছিল-'জানি না। হারিয়ে গেছে, ব্যাস।তোমাদের মত হাতী ঘোড়ার গল্প আমাদের নেই।'

-'কি নাম ছিল ছোটোমাসির?'

সমর মুখ শক্ত করে বলেছিল-'অনু'।

অনু কি অনুরাধা না অনুশ্রী না অনুমিতা, অনন্যা অথবা অঙ্গনা-এই সব জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হয়েছিল অহনার। সমরের মুখের ভাব দেখে সে আর কথা বাড়ায় নি।

ডিসেম্বরের শেষে, সমরের কিছু কাজ পড়ল সিউড়িতে। অহনা শান্তিনিকেতন যাবে কি না জানতে চাইলে, সে এক কথায় রাজি হল। ছোটোবেলায় একবার শান্তিনিকেতন যাওয়া ঠিক হয়েও ওর চিকেন পক্স হওয়ায় সব পন্ড হয়েছিল। পরবর্তীকালেও, সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা ও চর্চার জন্য অহনা সেখানে যেতে চেয়েছিল। অহনার গলায় সুর ছিল-সে ভালো গাইত। কিন্তু ততদিনে সমরের সঙ্গে অহনার বিবাহ স্থির- পিতৃদেব এক কথায় অহনার ইচ্ছেয় না বলেছিলেন। এত বছর পরে, ডিসেম্বরের রাতে, আবার শান্তিনিকেতনের কথা উঠল। অফিস থেকে ফেরত সমর সবিশেষ উত্তেজিত ছিল সেদিন। বলছিল, শান্তিনিকেতনে ওর বন্ধুর বাড়ি, সেখানে থাকা যাবে, হোটেল ফোটেলের বুকিং এর দরকার হবে না।

সিউড়ির কাজ শেষ করে সমর যখন অহনাকে নিয়ে বোলপুর এলো, তখন ভাঙামেলা। মেলার মাঠে তবুও ভীড়, নাগরদোলা, টুরিস্ট বাস, শালপাতা। ওরা দুপুরে খানিক ঘুরল। বাটিকের ব্লাউজপিস, পোড়ামাটির গয়না, আপেলবীচির মালা -এইসব টুকটাক দরাদরি করছিল অহনা।

সেদিন সন্ধ্যায় খ্রীষ্টোৎসব। বিকেল বিকেল কাচঘরের বারান্দায় বসতে না পারলে, হিমে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বাইরে- সমরের বন্ধুর বাড়ি থেকে জানা গিয়েছিল। সেইমত, বিকেল পড়তেই, ওরা কাচঘরের দরজার গোড়ায় শতরঞ্জিতে বসে পড়ে। ভেতরে তখনও সাজসজ্জা ও বৈদ্যুতিক সংযোগের কিছু কাজ চলছিল। ভীড় ক্রমে বাড়ছিল। ঘর ছাপিয়ে সিঁড়ি, সিঁড়ি ছাপিয়ে রাস্তা অবধিও মানুষজন। চাদর, জহর কোট, সোয়েটার, জ্যাকেট। আলো কমে আসছিল, হিমভাব বাড়ছিল। কাচঘরের ভেতরে গায়ক গায়িকারা সমবেত-একাধিক তানপুরার শীর্ষদন্ড দেখা যাচ্ছিল। সমর উসখুস করছিল-একবার বলছিল-বাথরুমে যেতে হবে, একবার বলছিল, ঠান্ডা লাগছে, টুপি আনতে হবে, আবার সিগারেট খাওয়ার জন্য ছটফট করছিল-ভিতরে উঁকি দিচ্ছিল- বাইরে তাকাচ্ছিল-তার মুখে রাগ আর অসহায়তা দেখছিল অহনা।

-'কী শালা ফেঁসে গেলাম এখানে। এই ঠান্ডায় এই সব কাঁদুনি শুনতে হবে এতক্ষণ। শুরু হবে কখন তাও তো বুঝছি না।'

অহনার অস্বস্তি হচ্ছিল। বলল-'এক্ষুণি হবে, দেখো না, সবাই এসে গেছে।'

সমর ওর কনুই টেনে বলল-'চলো ফিরে যাই। লেপের তলায় ঢুকে যাবো সোজা'। বলে সামান্য চোখ মারল অহনাকে।

অহনা বলল, 'এক্ষুণি শুরু হবে। একটু বসো। আর হয়তো কোনদিন আসাও হবে না'।

-'যাবে না কি ক্রন্দনসঙ্গীত শুনবে? আমি চললাম।' সমর ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দেয়। তারপর বেরিয়ে যায়। অহনাও

সমরের অনুগামী হয়ে উঠে দাঁড়ায়, হাতের ব্যাগ তুলে নিয়ে, শাড়ি, শাল গুছিয়ে, বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে। ঠিক তখন কাচঘরে সমস্ত তানপুরার একসঙ্গে সুর মেলানো শুরু হয়। শীত না কি আকস্মিকতা- অহনা আমূল কেঁপে উঠে আবার বসে পড়ে। সে যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে কাচঘরের ঝাড়লন্ঠন দেখা যাচ্ছিল আর তানপুরার শীর্ষগুলি- কখনও হাতের আঙুল-সুর বাঁধছে। অহনার মনে হ'ল, সে যেন এক অলীক কক্ষের দোরগোড়ায় -যেখানে কেবল সুর ভেসে বেড়াচ্ছে - একটি তানপুরার সুর যেন অন্য তানপুরা তুলে নিচ্ছে, তারপর আর একটি তানপুরা, সেখান থেকে আর একটি। শেষ তানপুরাটি থেকে বেরিয়ে একলা সুর অতঃপর যেন ওপরে উঠছে, ঝাড়লন্ঠন ছুঁয়ে ভেসে ভেসে অহনার কাছে আসছে, এরপর সুরে সুরে জড়িয়ে ঈষৎ ভারি হয়ে নিচে নামছে, আবার উঠছে।

ধুপের ধোঁয়ার মত সুরের এই চলাচল অহনাকে ঘিরে ফেলছিল। এক মায়াবরণ যেন অহনার শ্রুতি দৃষ্টি আর মননে জড়িয়ে যাচ্ছিল- আবরণ সরালেই যেন এক অভূতপূর্ব মুহূর্তের সম্মুখীন হবে সে -এরকম তার মনে হচ্ছিল। সমর এসে আবার ওর পাশে বসতে পারে, নাও পারে-অহনার তা নিয়ে আর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না-সমরের কথা অমান্য করার জন্য কোনো ভয় কাজ করছিল না আর- বরং ওর মন সমর, তাদের মিল, তাদের অমিলগুলি পেরিয়ে যাচ্ছিল দ্রুত- ঘর দোর সংসার অস্পষ্ট হচ্ছিল। ওর মনে হচ্ছিল, সম্ভবতঃ এই সেই মুহূর্ত-যখন মানুষ হারিয়ে যায়, হয়ত ডানা মেলে উড়ে যায় ভরা জ্যোৎস্নায়। সে ভাবছিল এবং ক্রমশঃ বিশ্বাস করছিল। অহনার মনে হচ্ছিল, কিছু একটা ঘটবে, খুব বড় কিছু, ঠিক কী ঘটবে সে জানে না, কিন্তু তার জন্য আনন্দিতচিত্তে অপেক্ষা করতে পারবে। অহনা কাঁপছিল, ওর চোখে জল আসছিল, দু হাত জড়ো করে এই মুহূর্তটিকে সে আগলে রাখতে চাইছিল আর সমস্ত শরীর দিয়ে এই অপরূপ সুর মেলানো অনুভব করছিল, শুষে নিচ্ছিল।

গান শুরু হয়ে গিয়েছিল। আচার্য কিছু বলছিলেন। হিম মাথায়

নিয়ে অজস্র মানুষ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। মোমবাতি জ্বলছিল। মেলার মাঠে সম্ভবতঃ বাজি পোড়ানো চলছিল। আকাশে একটি আলোক বিন্দু সহস্র আলোক বিন্দু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল- গাঢ় বেগুণী আকাশে আলোর কণাগুলি কখনও সিংহের কেশর, কখনও সুবৃহৎ অগ্নিপুষ্পর পরাগরেণু তৈরি করছিল, তারপর ছাই হয়ে ঝরে পড়ছিল হিমভেজা মাঠে।

সেই সময়, বল্লভপুরের হরিণের বন পেরিয়ে এক বিশাল গজরাজ আম্রকুঞ্জের দিকে ধাবিত। সে ঐরাবতের সর্বাঙ্গে অলংকরণ, পৃষ্ঠে সুসজ্জিত হাওদা।

প্রাথমিকভাবে গুরুচণ্ডা৯ র 'হরিদাস পালেরা' ব্লগবিভাগে প্রকাশিত

ছবি: চিরঞ্জিত সামন্ত

মৃত্যুর দরজা ঠেলে

মোজাফফর হোসেন

দরজায় আলতো করে কড়া নাড়ার শব্দ। বোঝা যায় কেউ একজন টোকা দেবে কি দেবে না - মনের এই দো'টানা ভাবনা থেকে ছুঁয়ে দিয়েছে। পশ্চিমের দেওয়ালে সেঁটে থাকা ঘড়িতে তখন তখন রাত ১২.৪২ মিনিট। কিছুক্ষণ আগে যখন মেয়েটি 'গুট নাইট' জানিয়ে গেল, তখনও ঘড়ির কাটাগুলো এখানেই ছিল। আবার কী বলতে চায় মেয়েটি?

-"গুডনাইট জানাতে ভুলে গেছি, গুডনাইট বাবা।"

দরজা খুলতেই ঘরের ভেতর এক'পা রেখে কথাটি বলেই চলে গেল মিতু। কিছুক্ষণ আগে ঠিক এভাবেই এই কথাগুলো বলে গেছে ও। তবে কি ভুল করে আবার এল? নাকি আমারই ভুল হচ্ছে? কিন্তু ভুল তো হওয়ার কথা নয়। তখন ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলাম, "সবসময় খালি পায়ে থাকিস কেন?" ও কোন উত্তর না করে চলে গেল। এবার আর ওর পায়ের দিকে তাকানো হয়নি। তবে কি সময় আমাকে পিছিয়ে আনল?

"কই, এসো। দরজায় দাঁড়িয়ে একা একা কার সঙ্গে কথা বলছ?" ভেতর থেকে নীলু বলে।

শুয়েছি কতক্ষণ হবে মনে নেই। ঘুম এসেছিল কি এসেছিল না?! দরজায় ফের কড়া নাড়ার শব্দ। ঘড়ির কাটা তখন কিছুটা এগিয়েছে। মশারির এককোণা উঁচু করে সাবধানে নামি। নীলু ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। হাঁটতে থাকি দরজার দিকে অনেকটা সময়। ঘরের দক্ষিণ কোণ থেকে উত্তরের সীমানা যেন কয়েক মাইল বিস্তৃত। পায়ের পাতা মেঝের সাথে আটকে আটকে

যাচ্ছে। ছোটবেলায় যখন স্কুলে যেতাম, খুব করে যখন বৃষ্টি হত, খালি পায়ে এঁটেল মাটির কাদা চটকে চটকে আমরা স্কুলে যেতাম। আমি আর রহিম। পরে রহিম স্কুল ছেড়ে সব মৌসুমেই কাদা চটকানোর কাজ জুটিয়ে নিল; কাদা চটকে চটকে গাঁয়ে গাঁয়ে কাঁচামাটির ঘর বানিয়ে বেড়াত। সে অনেক অনেক দিন আগের কথা। আজ আমি মেঝে থেকে এঁটেল মাটির গন্ধ পাচ্ছি। স্যাঁতসেঁতে-নোনতা গন্ধ, সাথে রহিমের শরীরের ঘ্রাণটাও মিশে আছে।

দরজা খুলেই দেখি খানিক দূরে মা দাঁড়িয়ে।

"ওহ, মা! কিছু বলবে?"

"আমি বোধ হয়..." - মা কথার মাঝখানে থেমে মনে করার চেষ্টা। পুরো বাক্যটা মা কখনোই একবারে শেষ করতে পারে না।

"তুমি সময় নিয়ে বলো। ওতো তাড়া নেই আমার" - আমি জবাব দিই।

মা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে না। আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি।

"না, কিছু না। এমনিই এসেছিলাম।" কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর মা আমার দিকে মুখ করেই পেছনে সরে যেতে থাকলেন। একটা প্রাচীন নিস্তব্ধতা গ্রাস করে নিল তাকে।

আমি দরজা লাগিয়ে দিই।

"তোমার কী হয়েছে বলো তো?"—নীলু বলল। ও ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে। ঘুমাতে যাওয়াটা ওর কাছে পার্টিতে যাওয়ার মতই গুরুত্বপূর্ণ। কম করেও একঘণ্টা প্রস্তুতি চলবে আয়নার সামনে। আমি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, প্রায় প্রতিরাতেই।

আমার ঘুম ভাঙে ফের, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে। খুবই অস্পষ্ট শব্দ, যেন স্বপ্নের ওপাশ থেকে ভেসে আসছে অস্তিত্বে।

উঠে বসি। নীলু অঘোরে ঘুমাচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীর সুখ এখন ওর নিঃশ্বাসের পথ ধরে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে অতলে। এমনি করেই প্রতিনিয়ত সুখ হারাচ্ছে পৃথিবী। মশারির বাইরে এসে চোখটা ভাল করে ডলে নিই। ঘড়ির দিকে তাকাই, রাত ২টা ৩৬ মিনিট। দক্ষিণের জানলা খোলা। বৃষ্টির ফোঁটার মতো জোছনা পোকা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। নাকি বৃষ্টিই হচ্ছে?—সোনালি বৃষ্টি? ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে যাচ্ছে অনবরত। মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে শেয়াল। মাঝরাতে পুরো শহরটা যেন পরিপূর্ণ গ্রাম বনে যায়! এই শহরটা কোনো এক সময় গ্রাম ছিল, শেয়ালগুলো তখন থেকেই ডেকে আসছে। শেয়ালের ডাকের সাথে সাথে মাঝে মধ্যে আদিম মানুষের চিৎকারও শোনা যায়—আনন্দ কিংবা বেদনার। দিনের আলো ফুটলে ওরা ইঁট-পাথরের সাথে মিশে যায়। সবকিছু একাকার হয়ে যায় নীলুর শরীরের প্রতিটা ভাঁজে। আমি খুব আলতো করে দরজার দিকে পা বাড়াই। ঘরের ফার্নিচারগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিই। ঠিক জায়গাতেই আছে বোধ হয়! মাঝেমধ্যে ওদের ফিসফাস শব্দ আমার গভীর ঘুম ভেদ করে আমাকে সেই বাল্যকালে নিয়ে যায়। ওদের চলাচলে আমি কদমফুলের গন্ধ পাই।

"মা? এখনো ঘুমোও নি?" - দরজা খুলে মাকে দেখে আমি জিজ্ঞেস করি। মা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমাকে চেনার চেষ্টা করে।

"আমি তোমার ছেলে" - কী যেন নামটা? আমি নিজের নাম মনে করার চেষ্টা করি।

"তুই যখন আমার পেটে ছিলি, তখন তোর কোনো নাম ছিল না, বাবা!" মা বলে - "তোর এখনো কোনো নাম নেই আমার কাছে"

-"কিছু বলবে মা?" - আমি জানতে চাই।

-"না, বাবা।"

-"এসেছ যে? তোমার কি শরীর খারাপ?"

-"আমি কী যেন একটা রেখে গিয়েছি।" মা উত্তর দেন।

-"তুমি আবার কী রেখে গেলে?"

-"চশমা?" মা আমাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করে।

-"চশমা তো তোমার চোখেই আছে!"

-"ওহ! তাহলে অন্য কিছু হবে, মনে করতে পারছি না।"

-"ভেতরে এসে দেখবে?"

মা ছায়ার মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে: মাঝখানের দূরত্ব বাড়তে বাড়তে কয়েকশ' বছর ছাড়িয়ে যায় যেন। আমি দাঁড়িয়ে থাকি সভ্যতার দিকে পিঠ দিয়ে ভবিষ্যৎ আর অতীত যেখানে অনন্তকাল ধরে বর্তমান সেই দিকে মুখ করে। মা কখন চলে যায়, টের পাই না কিছুই। নীলুর ডাকে চমকে উঠি।

-"কী হলো? ওখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন?"

- "এমনি" - আমি বিড়বিড় করে বলি।

দরজা বন্ধ করে বারান্দায় যাই। সিগারেট ধরাই। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডুলি পাকিয়ে অন্ধকারে মিশে যায়। আরও গাঢ় ঘন হয়ে ওঠে অন্ধকার। আমার মতো ধোঁয়া জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে কারা যেন এই অন্ধকার তৈরি করে রোজ রোজ। কেউ একজন আদর করে তার নাম দিয়েছে রাত। খুব মিষ্টি একটা নাম। অন্য নাম হলে অন্ধকার এত মধুর হত কিনা সন্দেহ। আমি যখন বাল্যকালে ইরার সাথে প্রেম করতাম, তখন আমি ওকে 'মন্থন' বলে ডাকতাম। অকারণেই। শব্দটা আমি সমুদ্রের তলদেশ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। আমাদের বাড়ির পেছনের বদ্ধ জলাশয়টি থেকেও হতে পারে। একদল জোনাকিপোকা টর্চ মেরে মেরে হন্তদন্ত হয়ে রুমের মধ্যে প্রবেশ করে। একটি এসে বসে আমার

শার্টের বাঁ-কলারের ওপরে, কানের ঠিক ইঞ্চি তিনেক নিচে। হয়ত কিছু বলতে চায় আমাকে। বলতে চায়, নীলুর মতো ওরও সিগারেটের ধোঁয়া অসহ্য লাগে। কিন্তু ও কিছুই বলে না। নিঃশব্দে জিরিয়ে নেয় খানিকটা সময়, তারপর আবার উড়ে যায় শূন্যে। বাকিরা আমার রুম তন্নতন্ন করে তল্লাশি করে, কয়েকটি ঢুকে যায় নীলুর পেটিকোটের ভিতরে, হয়ত আরও গভীরে; আজকাল মানুষকে বিশ্বাস করা খুব কঠিন, ওরাও সেটা জেনে গেছে হয়ত।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে আবারও ঘুম ভেঙে গেল। বারান্দাতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘড়ির দিতে তাকাতে আর ইচ্ছে করে না। বিরক্তির সাথে দরজার দিকে যাই।

-“মা, তুমি? এখনো ঘুমাও নি?” বিরক্ত কিছুটা মুখেও ফুটে ওঠে।

-“ঘুম আসে না, বাবা” - মা উত্তর করে।

-“আমার সকালে অফিস, মা। ভোরে উঠতে হবে” -আমি শক্ত করে বলি।

-“ওহ” - আর কথা না বলে মা পিছন দিকে পা বাড়ায়। আমি এগিয়ে যাই খানিকটা। মাইলের পর মাইল।

-“মা, তোমার কি শরীর খারাপ? কী হয়েছে তোমার?”

-“আমি কী যেন পাচ্ছি না খুঁজে!” মা সরে যেতে যেতে বলে।

-“কী? বলো মা। আমি তোমাকে খুঁজে দিচ্ছি” - আমি চিৎকার দিয়ে বলি।

-“ঠিক মনে করতে পারছি না, বাবা।” অন্ধকারের ওপাশ থেকে মা বলে। মা’র পিছনে হাঁটতে হাঁটতে আমি সমুদ্র দেখে আসি। ছেলেবেলায় এমনি করে বাবার পেছনে পেছনে আমাদের দক্ষিণ শালিকের মাঠের বিল দেখে বেড়াতাম। একবার সার্কাসও দেখেছি। আর একবার অন্ধগলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম। বাবার খোঁজে। বড় হয়ে জেনেছি, ওখানে মেয়েছেলে কেনা যেত

ঘণ্টাচুক্তিতে। বাবা কি সেদিন কিনেছিল কাউকে? বাবা বেঁচে থাকলে জিজ্ঞেস করতাম। একদিন ভরদুপুরে বাবা আত্মহত্যা করে। তার বেঁচে থাকতে ভাল লাগছিল না: প্রায়ই আমাকে বলতেন সে'কথা। বড় হয়ে আমিও একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম। বাবার মতো কোন কারণ ছাড়াই। আমার মৃত্যু হয়েছিল কিনা মনে পড়ছে না।

খ

আজ আমার ফিরতে বেশ রাত হলো। প্রায়ই রাত হয়ে যায়। সরু গলি ধরে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। আজ খুব বিচ্ছিরি অন্ধকার। মই বেয়ে ছাদে ওঠার মতো বেশ সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। ছোটবেলায় একবার মাকাল ফলের ভেতরে এমন অন্ধকার দেখেছিলাম। বাবা আমাকে আর মিতুকে বোকা বানানোর জন্য এনে দিয়েছিল ফলটি। আমাদের পাড়ার গোরস্থানে প্রচুর ফলতো এই ফল। মিতু আমার যমজ বোন। বাবা নাকি মাকে বলতো, 'আমাদের মেয়ে হলে নাম রাখব মিতু আর ছেলে হলে মিথুন।' আমরা দুজনেই হয়েছিলাম। আজ বিদ্যুৎ নেই কিংবা থাকলেও আমি তার অস্তিত্ব টের পাচ্ছি না। মাঝেমধ্যে আমি ভীষণ অন্ধকার দেখি চারপাশ। অন্ধকারে আমার বাড়ি খুঁজে পেতে খুব কষ্ট হয়। মনে হয় গলির সব বাড়িতে নীলু ড্রেসিং টেবিলে বসে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। পদক্ষেপ গুনে গুনে অগ্রসর হই। ঠিক মনে করতে পারি না, কতটা এগোলে আমি গন্তব্য খুঁজে পাব। অন্ধকারের শাড়ি পরে প্রতিটা বাড়ি ঘোমটা দিয়ে দিব্যি বসে আছে। অন্ধকারের দেবতা এরিবাসের সঙ্গে এখন তাদের মিলন ঘটবে, জন্ম হবে অনেকগুলো আলো এবং দিনের। আমি ঢুকে পড়ি একটাতে। নীলু ড্রেসিং টেবিলে বসা। নীলুই তো? নীলুর মতই সবকিছু শুধু ঘরের আসবাবগুলো একটু এলোমেলো। আমি বেশ ক্লান্ত। নীলুকে দেখতে দেখতেই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম ভাঙল দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে। উঠে বসি। নীলু কিংবা নীলুর মতো নারীটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। রাত ১টা ২৫মিনিট। ঘড়িটা আজ

দেয়ালের উত্তর দিকে। কিংবা পশ্চিমের দেয়ালটাই উত্তর দিকে সরে গেছে। দরজায় হাত পড়তেই খুলে যায়। নীলু বোধ হয় লক করতে ভুলে গেছে। এই ভুলটা ওর খুব বেশি হয় না। আজ হয়েছে। দরজার ওপাশে খাঁ খাঁ শূন্যতা।

-"মা?" আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলি। কোথাও কেউ নেই। অনেক সময় মা এভাবেই দরজায় টোকা দিয়ে চলে যায়। আমি দাঁড়িয়ে থাকি অনেকক্ষণ। অন্যদিনকার মতই নিথর, নিশ্চুপ।

-"কী করছ ওখানে? এনিথিং রং?" নীলুর কথায় চমকে উঠি।

-"কিছু না। এমনি।" দরজাটা আঁটকে বারান্দায় গিয়ে বসি। সিগারেট ধরাই। সিগারেটের আলো জোনাকি পোকার মতো জ্বলে আর নেভে। জোনাকি পোকাগুলো আজ এতক্ষণে বিশ্রামে গেছে। শেয়ালগুলো ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কবেই। ঝিঁঝিঁপোকারা ডেকে চলেছে একটানা। ওরা ক্লান্ত হয় না সহজে। আরও একটা সিগারেট ধরাই। বারান্দার সামনে একটা গাছ আছে, বৃক্ষ জাতীয়। নাম জানি না। পৃথিবীর সমস্ত গাছ বলতে আমি এখন ওটাকেই বুঝি। যেমন নারী বলতে ইরা। গাছটি নিঃশ্বাস নেয় বেশ জোরে জোরে। অনেকটা বাবার মতো করে। গাছটির ফাঁক-ফোকর দিয়ে খামচা খামচা আকাশ দেখা যায়। তারাগুলো মনে হয় ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় ঝুলে আছে। আমি একবার মিতুকে বলেছিলাম— "দেখ, আমাদের গাছটিতে কেমন তারা ধরেছে!" মিতু আমার মেয়ে। ওর জন্ম হওয়ার কথাশুনে আগাম নাম রেখেছিলাম মিতু, আমার সমান বয়সী বোনটার নামে। বাবার মৃত্যুর পর ওকে একদিন গাঁয়ের জঙ্গল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। একটা মাকাল ফল ছিল মুষ্টিবদ্ধ। বাবার অবর্তমানে ছোটচাচা আমাদের ভালোবেসে মাকাল ফল এনে দিতেন। জন্মের কয়েকদিন পর চলে গেল আমাদের মিতুও। এমন অন্ধকারে বারান্দাতে বসলে মিতু এসে আমার পাশে বসে। ছোট-মিতু কিংবা বড়-মিতু। মিতু সেদিন আবদার করে বলেছিল,

"আমাকে একটা তারা পেড়ে দেবে, বাবা?"

আজ ঘুটঘুটে অন্ধকার, আকাশের মেঘগুলো ছানাকাটা দুধের মতো বিগড়ে গেছে– কারা যেন চুরি করে নিয়ে গেছে তারাগুলো। থাকলে আজই একটা পেড়ে দিতাম মিতুকে। গলির মোড়ে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে কখন থেকেই। ওর কণ্ঠস্বর আমার সেই ছেলেবেলার কুকুরটির সাথে অবিকল মিলে যায়। ও অদৃশ্য চোরদের সন্ধান পেয়েছে বোধ হয়। নাকি ওই সাবাড় করেছে সবগুলো তারা? হালকা বাতাস বইছে, কারও নিঃশ্বাসের মতো থেমে থেমে। বাতাসে পোড়া মাটির গন্ধ – ভ্যাপসা মাটি রোদে পুড়লে এমন গন্ধ হয়। আমাদের রান্নাঘর থেকে এরকম গন্ধ বের হতো। আমি নিঃশ্বাস টেনে মার হলুদ-মাখা শরীর থেকে গন্ধটা নিতাম। রান্নাঘরে ঘনঘন যাওয়া দেখে মা ধরে নিয়েছিল, আমি তাঁকে খুব ভালোবাসি। আসলে ভালোবাসতাম তখন ভিকুর মাকে, তার মাংসল বুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে আমার ভাল লাগত। ভালোবাসতাম কলপাড়ের পেয়ারা গাছটিকে, গাছটির পেয়ারা আমার ভাল লাগতো। তারপর আরেকটু যখন বড় হলাম তখন ভালোবাসতাম ইরাকে, ইরার উদোম শরীর আমার ভাল লাগতো। মাকে এসবের বলা হয়নি কিছুই।

ঘুম ভেঙে যায় কড়া নাড়ার শব্দে। গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দাঁড়াই। মিতু আমার পাশ থেকে উঠে গিয়ে ওর মায়ের বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে। শব্দ থেমেছে দেখে আবার চেয়ারটিতে এসে বসি। আরও একবার কড়া নাড়ার শব্দ।

ডাইনিবুড়ির চুল

সোনালী সেনগুপ্ত

মাঠের একপাশ দিয়ে যে মেঠো রাস্তাটা চলে গেছে, সেটা দিয়ে টিপকল অব্দি গিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে গেলে উঁচু পাম্প হাউস, তার পিছনেই রঞ্জনমুদির বাড়ি। আর উল্টোদিকের রাস্তা দিয়ে পুকুর, জলা বাঁশ ঝাড়ের খোয়াকুচির বাধা পেরিয়ে যেতে পারলেই নাকি সে এক ডাইনিবুড়ির বাড়ি, তার নাম বাবায়াগা।

এর বেশি আর গল্পটা সে জানে না। বাবায়াগার গল্পটা।

বাবায়াগার গল্পটা একটা লাল মলাট-অলা বইয়ে আছে। সেদিন যখন টুকুনদাদামশাই ছোট্ট ফুচি-নাতনিকে যতীনের জুতোর গল্পটা পড়ে শোনালেন, সেদিন সেও হাঁটু-দুটো জড়ো করে বসে ছিল। দেরী হয়ে যাচ্ছিল, সন্ধে পেরিয়ে যাচ্ছিল, তবু বসে ছিল। ফুচি নাতনি এমনিতে খুব দুষ্টু, কিন্তু গল্প শোনে চোখ গুলগুলিয়ে, পায়ের কাছে লুটোপুটি খায় তুলোর ভালুক, আধ-খাওয়া আপেল। যতীনের জুতোর গল্প শেষ হলে, বাবায়াগার গল্প শুরু হলো। গল্প শুনতে শুনতে ফুচি ঘুমিয়ে পড়লে আপেলটা তুলে টুকুনদাদামশাই তাকে দিয়ে দিলেন। বললেন, ধুয়ে খেয়ে নে।

ধুলো-লাগা আপেল ট্যাঁক-কোমরে কাপড়ে বেঁধে সে বাসার পানে হাঁটে। পুকুর, জলা, বাঁশ ঝাড়, খোয়া-কুচির রাস্তা পেরিয়ে। এইদিকে তাদের বস্তি।

একদিন-ও বাবায়াগার দেখা পাওয়া যায় না। ডাইনিবুড়ির বাড়ি কোথায়, কে জানে?

হু-উ-ই দূরে ট্রেনলাইন থেকে ছেলে দুটো হেঁটে ফেরে। ওদের

দাঁত কালো, চোখ বসা, গালে ছোপ ছোপ। ওদের বয়েস সাত আর নয়।

ওরা গল্প শুনতে চায় না। মতি যতীনের জুতোর গল্প মনে করে করে শোনাতে গিয়েছিল ওদের। ছোটটা ঘুমিয়ে পড়ল, বড়টা বলল, মা, চুপ কর। মাথা কিলবিল করে।

ভিক্ষার দলে ভিড়ে রোজ নাহক কুড়িটা টাকা আনে বড়। আরো একটু পায়, কিন্তু বিড়ি খায়, আঠার ধোঁয়া টানে। মাথা তো কিলবিল করবেই।

আয় বাবা, মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

এক ঝটকায় হাত ফেলে দেয় বড়। ঘুমুতে দিবি কি না?

ভেজা ভেজা চোখ হয় মতির। ঘরের মাঝ বরাবর শাড়িটি টেনে দিয়ে সে সানকিতে তরকারী বেড়ে রাখে। নিজে কাজের বাড়ি থেকে আনা রুটি দিয়ে তরকারী দিয়ে রাতের খাওয়াটি সেরে নেয়। তারপর মাদুর পেতে বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমিয়েও পড়ে। উঁচু দাঁত দুটি একটু হাসি হাসি হয়ে কালচে ঠোঁটের উপর জেগে থাকে।

রূপকথার স্বপ্ন দেখে মতি। নীল জলের পুকুর, ফুলের গাছের পাশে একখানা সাজি নিয়ে বসে ফুল তুলছে সে, গাছে আপেল ধরেছে, লাল রঙের, তাদের গায়ে সাদা ইস্টিকার লাগানো। ভালো খেয়ে দেয়ে রূপকথার দেশে থেকে শরীরটিও কেমন শুধরেছে তার, দেখসে। গোল গোল হাতে ও কিসের চুড়ি, সোনার? হলুদ ছাপা কাপড়, একেবারে যেন ফুচির মা নতুন বউ। এমন সময় পিছনবাগের দুয়ারে এসে ডাইনি বুড়ি বাবায়াগা ঠকঠক লাঠি ঠোকে।

ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে মুখে একখানা লবঙ্গ পোরে মতি। তারপর ধীরে সুস্থে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে, এসেই একখানা খিঁচুনি খায়। গজ গজ করে কাজলমাসি।

তোরে আর খদ্দের দিবুনি। চারবার দরজা ঠুকতে হয়, বলি মাগনা শোবে নাকি ভালোমানষের পো, যে তুমি গতর নাড়াতে পারুনি?

মতি হাত তুলে খোঁপা টি ঠিক করতে করতে হাসে, বোকার হাসির মধ্যে না-হক খানিক স্বপ্নোত্থিতা রাজকুমারীর হাসি মিশেল খায়। তার মুখের ওপর চাঁদের আলো চকচক করে।

চেনা লোক, অল্পবয়েসী, বাবুপাড়ার ইস্কুল মাস্টার, দেখে আরাম পায় মতি। অচেনা খদ্দেরে তার ভয়। একমুখ হেসে বলে অমা, মাস্টার যে গা। অনেকদিন পর!

তিনঘর দূরে বাপের ঠিক ঠিকানা হীন বড় আর ছোট অঘোরে ঘুমোয়। বস্তির কয়েকঘরে গেরস্তদের বাস, তারা মেয়ে-ব্যাটায় গতর খাটিয়ে খায়, তাদের ছেলে মেয়েরা মুনিসিপ্যাল ইস্কুলে পড়ে। তারা আগে কলে জল তোলে, আগে মুনিসিপ্যালের বাথরুমে যায়, ছোঁয়া লাগায় না। ঝগড়া লাগলে গাল দ্যায় বটে।

মতি, কড়ি, তুলতুলি হাফ-গেরস্ত। কারোর বাড়ি ব্যাটাছেলে আর নাই, কারোর কখনই ছিল না। পাঁচ পাড়ার উপোসী ব্যাটাছেলেরা বাড়ি ফেরার সময় চুপি চুপি শুয়ে যায়, বাঁধা রেট দুইশো টাকা, তার পঁচাত্তর কাজলমাসির। সবাই জানে, চুরি নাই, লুকোছাপা নাই, শুধু গলা ফুটে বলতে মানা।

এই যে শরীরের গর্তে ঢুকছে বেরোচ্ছে বাবুরা, এতে কি মতির আরাম নাই? আছে বৈকি, ষোলো আনা আছে। আর কি টান আছে বলো দেখি এই হাফ-গেরস্থালিতে?

গল্প আছে। আস্তে আস্তে এই যে বাবুর পিঠটা মালিশ করে দিচ্ছে মতি, আর বাবু আরামে ঘাড় ফোলাচ্ছে, আর কত কি বলছে। মন দিয়ে সব শোনে মতি। রূপকথার মত। এই য্যামন বাবুর বউ আছে, সেও ইস্কুলে চাকরি করে, অনেক দূরে, পাহাড়ের দিকে ইস্কুল, আর বাবুর চাকরি এই করিমপুরের ইস্কুলে। কেউ চাকরি ছাড়ে না, মাসে একবার দেখা শোনা, দুজনেই চাকরি

কাছাকাছি আনার চেষ্টা করে, সে আর হয় না। ভাল্লাগে কি?

খুব টের পায় মতি। তেলের মত বাবুর গা চুইঁয়ে পড়ে না ভালো-লাগা, কেমন ধূপ ধূপ গন্ধ তার। সেই রকম ধুপের গন্ধ-অলা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নাকি বাবুর বউ ছাতা হাতে ইস্কুলে যায়। চোখে চশমা, বাবুর ছেড়ে রাখা প্যান্ট, মানিব্যাগের দেওয়াল থেকে গম্ভীর চশমা-চখি বউছবি উঁকি মারে, দেখেছে মতি।

একেকজনের গায়ের থেকে গল্প টেনে নেয় মতি, ভারী সুখ তাতে। কিন্তু সে কথা বলতে যাও দেখি কড়িকে। মুখ বেঁকিয়ে সে বলবে, পয়সা রোজগারের কথা, দুবার নয় চারবার শুলি কাজে দিবে গা। তুই একখানা হাঁদা মেয়ে, তোরে একবারের ভাড়া দিয়ে দুবার আরাম করে ন্যায়।

তা হবে। একটু হাঁদাই আছে মতি, কিন্তু গল্পের নেশা আর তাকে ছাড়ে কই?

বাবু, তুমি বাবাইগার গল্প জানো?

কি গা বললি?

বাবায়গা, লাল মলাটের বইয়ে আছে-টুকুনদাদা পড়ে শোনায়।

ওহ। এক গাল হেসে ফ্যালে মাস্টার, সে তো ছোটদের গল্প, আমি ভুলে গেছি। বেল্ট আঁটতে আঁটতে বলে আচ্ছা, তোকে বইখান দেব।

তার মুখখানা ছোট হয়ে যায় -আমি তো পড়তে জানিনে।

তা-ও তো।

বিবেচনা করে বলে মাস্টার, আচ্ছা, কখনো পড়ে এসে তোকে শোনাব। নেক্সট যেদিন আসব।

ঘরে এসে শুলে বেড়ার ফাঁক দিয়ে চিরচিরে চাঁদের আলো পড়ে গায়ে। কেমন কুঁকড়ানো দেখায় চামড়া।

আচ্ছা, সত্যি ডাইনিবুড়ি এই বস্তিতে থাকে না তো? কেমন

ভয়ে গা শিউরয় মতির। পাশের ঘরে চতুর্থবার কড়ির গুঙ্গনোর আওয়াজ পাওয়া যায়, শুনতে শুনতে ঘুম আসে মেঘের মত, চাঁদ ঢেকে।

বাগানের গাছগুলোতে ঝপাস ঝপাস করে জল ঢালতে থাকে নবনীতা। সদ্য কুঁড়ি বেরোনো গাছগুলো, বর্ষায় লতিয়ে ওঠা লতাগুলো বেজায় মুষড়ে যায়। বারান্দায় বসে টুকুনদাদামশায় ফুচিকে খেলা দিতে দিতে আড়চোখে দ্যাখেন, কিছু বলতে সাহস হয়না। বৌমা তাঁর বেজায় রাগী, আরো রেগে গেলে ফুচিকে ঠাসঠাসিয়ে চড়থাপ্পড় মেরে দ্যায়। তার চেয়ে অবোলা গাছগুলোর উপর দিয়ে যাচ্ছে যাক। রাতে বড্ড ঝগড়া হয়েছে ছেলে-বৌমায়, ফুচি উঠে পড়ে কেঁদে উঠেছিল। তখন ফিসফিসিয়ে তর্কাতর্কি। বচসা অশান্তি ফিসফিসিয়ে করলেও শুনতে পাওয়া যায়। ছোট্ট বাড়ি, ফাঁকা জায়গা, চাঁদের আলোয় ভেসে যায় ইঁটের ছাদ। সে আর প্লাস্টার করা হয়ে ওঠেনি। ঐখানে একদিন চেয়ারে বুড়োবুড়ি মুখোমুখি বসবেন ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বুড়ির আবার তর সইল না।

কাজেই রাত্তির জেগে ছোট্ট টেবিলল্যাম্পের আলোয় টুকুনদাদামশায় বই পড়েন। আর ঝগড়া শোনেন। কত রকমের, কত কারণের ঝগড়া। জানলা দিয়ে চাঁদের আলোয় ধোয়া মেঠো রাস্তা দিয়ে অনেক রাতে কারা সব এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হেঁটে আসে। সন্ত্রস্ত পায়ে ঢুকে যায় ছোট ছোট গর্তে। ওদিকে বস্তি।

ফুচিকে শিখিয়ে দিতে হয়, ওদিকে ডাইনিবুড়ি বাবায়াগা থাকে, তার লোহার দাঁত, তার হাড়ে হাড়ে লেগে শব্দ হয় খটাখট।

চাঁদের আলোয় তার ঝাঁটা দেখা যায়, তার তাঁতে মাকু দৌড়ে যায়। স্টেশনে মাঝরাতের এক্সপ্রেস এসে দাঁড়ায়।

সকালবেলা না খেয়ে ছেলে আপিস বেরিয়ে যায়, কপালে গভীর ভ্রুকুটি।

ও বৌদি, অত জল দিচ্ছ কেনেক? গাছগুলিন মরে যাবে তো।

আঁচল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে মতি এসে দাঁড়ায়, দুটি দাঁত উঁচু, মুখে নির্বোধ হাসি। মেয়েটার মুখে কি এক ধরনের মায়া আছে।

নবনীতা আরো জোরে এক বালতি জল ঢালে, বেশ করছি। ফটর ফটর করিসনা। বাসন ধুয়ে ঝুড়িতে তুলেছিস? সব বাসন মুছেছিস?

সব মুছেছি গো, তুমি ভাত চড়াবে না? দাদাবাবু সকাল সকাল বেইরে গেলেন বুঝি?

হুম।

আস্তে আস্তে হাত ব্যথা হয়ে আসে নবনীতার। রাগ-ও স্তিমিত হয়। বালতি নামিয়ে রাখে, জলের কল বন্ধ করে।

এদিকে কাজের লোক পাওয়া খুব মুশকিল। এই থাকে, এই চলে যায়, স্টেশনের কাছাকাছি বড় বড় ফ্ল্যাটবাড়ি উঠেছে, সেখানে সারা দিনমানের কাজ করে। ভিতরদিকে ঠিকে কাজ কেউ করতে চায়না। এই মেয়েটা একটু কুঁড়ে। কিন্তু খুব পরিষ্কার ঝরিষ্কার, মুখে কথাও তেমন নেই, একটু বোকা বোকা হাসি। যদিও ওর ছেলেরা ভিক্ষে করে শুনে গা গুলিয়ে উঠেছিল নবনীতার, কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল ওর কোনো ছেলেই এদিকে আসেনা, ছেলেদের প্রতি ওর টানও তেমন নেই, মা বিড়াল যেমন জন্ম দিয়ে দুধ খাইয়ে তারপর ছানাদের কথা ভুলে যায় তেমনি মতিও। ছেলেদের শরীরখারাপের কথা বলে কাজটাজ কামাই করে না। ঘর মুছে বাইরের বারান্দাতে বসে থাকে, দুপুরের এক থালা ভাত দিলে খেয়ে নেয় তৃপ্ত মুখে, প্রয়োজন মত ভারী কাজগুলো করে দিয়ে, বিকেলে বাসন মেজে তারপর যায়। দুপুরে দাওয়ায় শুয়ে ঘুমিয়েও নেয়। রোগা-পাতলা চেহারা, ভারী বুক,চওড়া পেছন, ওর দিকে তাকিয়ে তখন বেশ হিংসে হয় নবনীতার। সে চিরকালের মোটাসোটা মানুষ, বাচ্চা হওয়ার পর আরো মেদ জমেছে গায়ে।

হাতে সোনার বালা এঁটে বসে, খুলে রাখতে হয়।

কি খাস রে মতি, এমন সুন্দর চেহারা তোর।

মতি অবাক হয়ে হাসে, যা দাও বৌদি, তাই তো খাই, ঘরে এক কড়ার তরকারী রাঁধি।

নবনীতা রাঁধতে বসে, দাঁড়িয়ে রান্না করতে পারেনা সে, হাঁফ ধরে, কাজেই গ্যাসের উনুন নিচে নামিয়ে রাখা। একটু সেকেলে মতন রান্নাঘরের লাগোয়া বারান্দায় বসে কুটনো কুটে দ্যায় মতি।

তোর ছেলেদের বাপ কোথায় থাকে?

এ প্রশ্নের জবাব ঠোঁটস্থ মতির, সে আমারে ছাইরে চলে গেল।

গ্যালো তো গ্যালো, তা তোর তাকে মনে পড়ে না? দুক্ষু হয় না?

এই যে মিছি মিছি ঝগড়া রাগারাগি হয়ে যায়, থাইরয়েড বাড়ার জন্যই হবে, দীপ্তেন রাগ করে বেরিয়ে গেলে সারাটা দিন নবনীতা ভিতরে ভিতরে গলে যেতে থাকে, তরলের মত, ওই তো একটা মানুষ তার, আজ এলে আর রাগ করবে না সে। আর এই একটা মানুষ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, মতির দুক্ষু হয় না? এই প্রশ্নের কুলকিনারা পায়না নবনীতা। কেমন ছিল সে লোকটা, যাকে ঘিরে কোনো গল্প নেই?

মতি ভারী আতান্তরে পড়ে যায়। কাজলমাসী যা শিখিয়ে দিয়েছে তাই বলেছে, কিন্তু গল্প নেই কি গো। কত গপ্প। কিন্তু সেসব ফুচির মা নতুন বৌকে বললে তার কাজটি কি আর থাকবে? কড়ির মত চারটে বাবু নিতে হবে তখন রাতে।

তাই মতি মুখ নিচু করে সবজি কাটে। কাটতে কাটতে গল্পের ঘোরে ডুবে যায়। কড়াই-এ ছ্যাঁক ছোঁক ফোড়নের আওয়াজ হয় তখন।

বড়র বাপটা যে কে, সেটা ভেবেই পায় না মতি। রেল থানার

সেই পুলিশবাবু? তেনার পেটের আর বুকের মাঝে মস্ত জরুল ছিল, ভারী মোটা মানুষ, চোদ্দ বছরের মতি কেমন চ্যাপ্টা মতন হয়ে গিয়েছিল, আর ভ্যাবলা মত, কিন্তু সেসব ছাড়িয়ে মতির মনে আছে, পুলিশবাবুর পকেটে থাকত কিরিম বিস্কুট, কাজকম্মের পর অন্ধকারে থেবড়ে বসে তারা বিস্কুট খেয়েছিল, আর পুলিশবাবু বলেছিল তার বয়েসী একটা মেয়ে আছে পুলিশবাবুর, এই বলে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলেছিল অত বড় লোকটা। মতি ভারী অবাক হয়েছিল, তার তো লাগেনি তেমন, একটু দম আটকেছিল, এইটুকুই শুধু। তার পর একটা টর্চ জ্বালিয়ে পুলিশবাবু তার মুখখানা উঁচু করে দেখেছিল, আর বিড়বিড় করে বলছিল---কণার দাঁতগুলো এরকম উঁচু নয়--না নাহ।

নাকি সেই গুন্ডা মতন লোকটা, আ:, সে খুব ব্যথা পেয়েছিল, কিন্তু জ্বলুনি-অলা একরকম আনন্দ-ও, বেশ কয়েকবার এসেছিল লোকটা, কামড়ে দিত, দাগ হয়ে যেত গায়ে, তখন মতি স্টেশনের পাশে বস্তিতে থাকত। শেষ একবার লোকটা এসেছিল একটা নুলো লোককে সাথে নিয়ে, সে নাকি তার ভাই, ডবল টাকা নিয়েছিল তার জন্য ইস্টিশনের খিলওয়ানদাদা। নুলো লোকটা যখন চেষ্টা করছিল প্রাণপণ, কিন্তু পারছিল না, খুব মায়া হচ্ছিল মতির। তখন হঠাত প্লাস্টিকের পর্দা সরিয়ে গুন্ডা লোকটা ঘরে ঢুকে এলো, আর দুহাতে যত্ন করে ধরে রইলো নুলোকে, একবার তাকে খেঁকিয়েও উঠলো। আর তার পর, যখন সাইকেলের ক্যারিয়ারে ভাইকে বসিয়ে চলে গেল গুন্ডা মত লোকটা, ইস্টিশনে হাওয়া উঠলো, একটু ঝড়ো----

নাইটিটা পরতে পরতে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে মতি লোকদুটোকে দেখছিল, ভাবছিল, ওরা কি আজ একই বাড়িতে ফিরবে, এক-ই তরকারী দিয়ে ভাত খাবে? মা আছে কি ওদের বাড়িতে, জেগে এখনো, ভাতের থালা বেড়ে, যেমনটা কিনা গেরস্ত ঘরে থাকে কিংবা সিনেমায়---

সেই গুন্ডা লোকটা একটা কথাও তেমন বলেনি তার সাথে

কখনো-কাত হয়ে শো' কিংবা নড়লে এক চড় মারব, এই সব ছাড়া।

বড় খেতে বসলে রাতে বড়র মুখটা তুলে দেখার চেষ্টা করে মতি, চিবুকে আঙ্গুল দিয়ে। সব মনে আছে, কিন্তু কোন গল্পটা নেবে সে?

বড় এক ঝটকা মেরে হাতটা ফেলে দ্যায় "খেতেও দিবিনে, নাকি!"

গল্পগুলো মতিকে ঘিরে ঘোরে, কিন্তু বৌদিমনিকে বলা যায়না, অমন সুন্দর বৌদিমনি, ফর্সা, গোল গোল হাত, এক এক থাবা মাংসে ভর্তি গাল, লাল ছোপ ধরা, বলতে সাধ যায়, কিন্তু উঁচু দাঁত দুটোকে দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে রাখতে হয়। এসব বুঝি নোংরা গল্প, কিন্তু মতি তো কই বোঝে না, কোনখানটা নোংরা, অমনিই তো, মানুষের গন্ধ, মাংসের গন্ধ, ধুপ, বই, বিড়ি, ঘামের গন্ধ, গল্পের গন্ধ, ময়লা নয় তো। আরামের কথাই তো সব।

অমন আরাম, যা মাঝে মধ্যে হয়, বিষ্টির জল গায়ে পড়লে, ইলিশ- কাঁটা বৌদিমণির কাছ থেকে চেয়ে এনে তাই দিয়ে টালির লাউ রাঁধলে, বাচ্চা বুকের দুধ টানলে। ঝুলনের রাতে রাসের গান শুনলে, এইরকম করেই তো আরামের গল্প জমায় লোকে, নাকি?

কি বৃষ্টিটাই না হলো আজ বিকেলে। রাস্তার ধুলো সব পেথ্থমে কাদা হলো, তারপর ধুয়ে লাল জল হয়ে নয়ানজুলিতে নেমে গেল সব হুড়মুড়িয়ে। এখন চাঁদের আলোয় রাস্তাটা কেমন পারা ওঠা আয়নার মত চকমকিয়ে উঠছে। ভিজে ঝুপ্পুস সব লোকজনেরা একটু আগেই সাতটার লোকাল থেকে নেমে কাদা মেখে ভ্যানে চড়ে বাড়ি ফিরেছে। অনেক দেরি হয়ে গেছে আজ মতির। দাদাবাবু ফিরতে দেরি করছিল, বৌদিমণি ধরে রাখলো, নৈলে এই বিষ্টি ভিজে পুকুরধারের রাস্তা দিয়ে ফিরতে কি আরাম, কি আরাম। সাধে কি বলে ভগোমানের জল! গায়ে পড়লো কি পড়লো না, চিড়বিড়িয়ে সব ঘামাচিরা মরে গেল, গাছের পাতাগুলিন

তেলতেলে সবুজ হয়ে উঠলো, জুঁই ফুলের কি খোশবাই। ওদিকে বিষ্টি হলেই আবার ট্রেনের তার ছিঁড়ে যায়, সবার বাড়ি ফিরতে দেরি। দাদাবাবুও এখনো ফিরলো না। ডিমের পরোটা মেখে বসে থেকে বৌদির মুখ হাঁড়ি। মতি বেরিয়ে এসেছে।

পুকুরধারের রাস্তা দিয়ে জল ছপছপিয়ে হাঁটবে এখন সে। হাওয়াই চটি হাতে খুলে নিয়ে।

বড় আর ছোট ফিরলো কিনা কে জানে। মাঝে মাঝেই ওরা ফেরে না। কিন্তু তার পর আবার ফিরে আসে। বিড়ালের বাচ্চার মত। খুব কিছু একটা চিন্তা হয়না মতির, কেন হয়না কে জানে। ইস্কুলে দিতে বলেছিল সবাই বাচ্চাগুলোকে। দিয়েও এসেছিল সে, মুনিসপ্যালিটির ইস্কুলে। কিন্তু ওরা ইস্কুলে গেলো না। এমনকি ইস্টিশান ছেড়ে যখন মতি এই বস্তিতে এলো, একখানা ঘর ভাড়া করলো, ওরা ইস্টিশনেই থেকে যেতো সারা দিন। শুধু খেতে আসতো মায়ের কাছে। এক এক দিন আসতো-ও না। ইস্টিশনে গিয়ে নিয়ে আসতে হতো। চায়ের দোকানের বেলালদাদা বলেছিল, ইস্টিশনে জন্মানো বাচ্চারা রেললাইন ছেড়ে কোথাও যায়না।

বলতে কি, যদ্দিন বাচ্চাগুলো বুকের দুধ খেতো, তদ্দিন-ই ওদের জন্য একটু হলেও হা-পিত্যেশ লাগতো মতির। আর তেমন লাগে না। আর একটা বাচ্চা হলে ভালো হয়, ভাবে মতি। আবার বেশ গায়ের মধ্যে বুকের মধ্যে তুলতুলে ধুকধুকে একটা ছোট্টো বাচ্চা।

কড়ি বলেছিল, শরীলের সুখ ভিন্ন কিছু বুঝিস না তু।

তা সুখ তো শরীলেই হয়। এই ঝিপিঝিপি বিষ্টিতে যে গায়ে কাঁটা হচ্ছে রোঁয়া রোঁয়া, গরম ভাতের থালাটি নিয়ে বসলে য্যামন সুখ হয়, গন্ধ সাবান গায়ে মাখলে, টুকুনদাদার বই থেকে গল্প শুনলে, আর রাতে গল্প গল্প স্বপ্ন থেকে উঠে পিছল ঘামে ভেজা, কুসুম-গরম মানুষের গায়ের ঝাপটানি খাওয়া, এই সবই তো সুখ, সবি শরীলের বটে তো।

দূর মড়া, ছেলেপুলের মুখের দিকে তাকিয়ে সুখ, ঘরে পুরুষমানুষ থাকলে সুখ, এসব বুঝিসনে তু?

ছেলেপুলের মুখের দিকে তাকিয়ে ত্যামোন সুখ হয়না মতির। মায়া হয়, মুখ্টুকু পুঁছিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, চান করিয়ে পোষ্কার করে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ছেলেপুলে সেসবের ধার ধারে না। গল্প শোনাতে ইচ্ছে করে। কেশবদাদুর গল্প, কেশবদাদু নাকি একসময় মস্ত চাকরি করত। তারপর একদিন, গাড়িতে ধাক্কা লেগে, বাম হাতটি অকেজো হয়ে গেলো। তখন, কেশবদাদুর চাকরিটে তার ছেলে পেলে, আর ছেলে বৌমা মিলে সব টাকা পয়সা লিখে নিয়ে বুড়োকে কেবল অপমান করতে লাগলো। অপমানের জ্বালায় নাকি বুড়ো দেশান্তরী হয়ে এই ইস্টিশনের ধারে কবেকার পুরোনো সে ভাঙ্গা পৈত্রিক বাড়িতে চলে এলো। অনেক দূর তার নিজের করা বাড়ি, সেখেনে সবাই হিন্দিতে কথা কয়, সেসব ছেড়ে, নিজের বৌকে ছেড়ে। বৌ দু একবার এলেও এখানে থাকতে পারতো না। তার পর বুঝি বৌটা মরেই গেলো।

রোজ সকাল সন্ধ্যে বেলায় কেশবদাদুর বাড়িটা মুছে দিয়ে আসতো মতি। ঘর অন্ধকার করে একটা টিমটিমে মোমবাতি জ্বেলে বসে থাকতো কেশবদাদু। মতি গিয়ে বসতো সেখানে। গল্প শুনতো। রেল্লাইন ধরে সোজা উত্তুর্মুখী গেলে নাকি কেশবদাদুর নিজের হাতে গড়া বাড়ি। সেখানে গমের খেত, সেখান থেকে র্যাশনে গম আসে, তাই দিয়ে শ্যামলী মিলে আটা হয়।

তখন বড়োটা পেটে। আস্তে আস্তে পেটে ভার আসছে, রোগা বলে তেমন বোঝা যেতো না যে মতি পোয়াতি। রাতবিরেতে তখনো ঘরে লোক ঢোকে। একদিন বেলালদাদা তাকে বল্লো, পুঁটুলি বাঁধ।

সোজা তাকে নিয়ে এলো কেশবদাদুর কাছে। বললো, মেয়েটাকে থাকতে দ্যান দাদু। আপনার সব কাজ করে দেবে। পোয়াতি মেয়েছেলে, ইস্টিশনে থাকে, এ তো শ্যালদা নয়, আমাদের মানে লাগে।

ঘোলাটে চোখ তুলে একবার দেখলো কেশবদাদু, চশমার মধ্যে দিয়ে। বিড়বিড় করে বললো, থাকবে? তা থাক।

অনেক দিন, কেশবদাদু মরে না যাওয়া অব্দি সেখেনেই রয়ে গ্যাছিলো মতি। বড় যদিও দিনদুপুরে, ইস্টিশনের মধ্যেই নামলো।

একদিন কেশবদাদু হাত রেখেছিলো তার পেটে। কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিলো, মানুষের আসার আওয়াজ শুনতে ইচ্ছে করে। বড় সুন্দর। তারপর অচেনা ভাষায় কি একটা বলেছিলো। টানটান পেটের চামড়ায় কুঁচকানো, বুড়ো হাত বুলিয়ে।

কথাটা বুঝতে পারেনি মতি। এখন একটু একটু বুঝতে পারে। শোনা যায়, আসার শব্দ। অম্নি। যেমন ট্রেন আসার শব্দ। বিষ্টি আসার আগে গমগমে আকাশ। আলো ফোটার আগে পাখিদের আসার শব্দ।

মানুষের আসার শব্দও আছে নিশ্চই। বই পড়লে জানা যায়। ভাবতে ভাবতে হাঁটছিল মতি।

সন্ধের ঝোঁকে পাতার থেকে জল পড়ে টুপটাপ। কার পায়ের আওয়াজ! ভয় পায় মতি। এ রাস্তা দিয়ে তো তেমন কেউ যায় আসে না। তারপর দ্যাখে, ওমা, এ তো দাদাবাবু। জলে, কাদায় চুপ্পুস।

দা'বাবু এ রাস্তায় যে!

চমকে তাকালো দাদাবাবু। বললো, ও, তুমি!

আমি বাড়ি যাই। বৌদিমনি আপনার আসার দেরি দেখে চিন্তা কর্ছিলো যে।

হুঁ, অন্যমনস্ক গলায় বলে দীপ্তেন। ও রাস্তায় গাছ পড়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালায় দীপ্তেন। দেখে ভারি খুশি হয় মতি, এমনি এমনিই। বৌদিমনির সাথে কাল ঝগড়া হয়েছিলো বুঝি। আজ আবার ভাব হয়ে যাবে। কাল সকালে আপিস যাওয়ার

সময় বৌদিমনি আদুরে মুখ করে গেটের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকবে, ফুচিকে বলবে, বাবাইকে টা টা করো তো মা!

বিষ্টি হলে গল্পেরা অম্নি বেড়ে যায়, খদ্দেররা কোথায় রেললাইনে বাজ পড়ে আটকে গিয়েছিল সে গল্প শোনায়, টালির চালে জল পড়ে টিপ টিপ, ঠান্ডা হয় রাত।

বৃষ্টি আর জলের রাতে ডাইনীবুড়িরাও নিশ্চই ঘুমোয়।

আনমনা একটা মেঘ করেছিলো সারাদিন। গরাদ দেওয়া জানলার ওপাশে ময়লা তোয়ালের মতো আকাশের দিকে চেয়ে ছিল দীপ্তেন, সারাদিন। কাজটাজ কিছু করেনি, কাজ তেমন কিছু জমেও নেই। দুপুরবেলা একবার রঞ্জিত পিওন একটা স্লিপ ধরিয়ে গেলো, বড়বাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন, দীপ্তেন যেন ছন্দা সিমেন্টের অর্ডার খাতাটা দেখে রাখে, কাল বিল আপডেট চাই।

হাই উঠছিল দীপ্তেনের, টিফিন না আনায় ক্যান্টিনে গিয়ে লোভে পড়ে একপেট চিলিচিকেন আর ফ্রায়েডরাইস সাঁটিয়ে এসেছে, এখন ঘুম পায়। অর্ডারের গোলাপি হলুদ কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে আরো। তারপর ময়লা তোয়ালে আরো ময়লা হয়ে উঠলো, তারপর কে এসে কাচাকুচি শুরু করলো, আকাশ ভেঙ্গে ঘ্যানঘেনে ময়লা জল, রাস্তায় কাদা, লোকজন বাড়ি ফিরতে পারবে না বলে হা-হুতোশ, বাড়িতে কি থাকে লোকের? তারপর ট্রেন বন্ধ, ভিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে স্টেশনে নেমে ভ্যান নেই তাই হেঁটে আসা। এর মধ্যে আকাশ ধুয়ে একটা চকচকে চাঁদ কে টাঙিয়ে রেখেছে। পায়ে কাদা লাগে, কিন্তু আকাশ আর হাওয়া বেশ পরিষ্কার, আরাম লাগছিল দীপ্তেনের। আনমনা, বেভুল একরকম আরাম, যেন সে বত্রিশ বছরের পুরোনো নিজের বাড়িতে যাচ্ছে না, একদম অচেনা, অন্য কারো বাড়িতে---হলেও তো হতে পারে এরকম!

এমন সময় হঠাৎ একটা মেয়ে সামনে এসে পড়ে বলে উঠল, অমা, দাদাবাবু যে।

ঘোর ভেঙ্গে যাওয়া মুখে সামনে তাকিয়ে ঠাওর করে দীপ্তেন দেখলো। তাদের কাজের মেয়েটা বোধহয়। অকারণে কৈফিয়তের সুরে কি একটা বলে হনহন করে এবার হাঁটতে থাকে দীপ্তেন। নাঃ, অনেকটাই রাত হয়েছে।

আজকে খাবার টেবিলে সবাই একসাথে। জলখাবারের ডিমের পরোটা ডিনারে চলে এসেছে, সাথে আলুর দম, দেখে রাতে খৈ দুধ খাওয়া বাবাও আমায় দুটো দাও তো নীতা, বলে এসে বসে পড়লেন। নবনীতার মেজাজ ঝটাকসে ভালো হয়ে যায়। রান্না ভালো করে সে,খাওয়াতেও ভালোবাসে। ফুচি ঠান্ডায় তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে, তাতে দীপ্তেনও কেমন কাঁচুমাচু অপরাধী মুখে বাড়ি ঢুকলো, ট্রেনের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় এত দেরি। কত ভিড় হয়েছিল ট্রেনে। আরো দুটো পরোটা চেয়ে খায়। বড্ড মায়া হয় নবনীতার। সকালে কিছু খেয়ে যায়নি, দুপুরে খায়নি হয়তো।

আকাশ জুড়ে চাঁদ, ঠিক মাথার ওপর। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘদেহী ছায়া দেখতে পায় দীপ্তেন, তার উপর পড়ছে। চমকে পিছন ফিরে দেখলো বাবা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছেন, ঘর থেকে, বারান্দায় দাঁড়াতে এসেছিলেন কি? ছায়াটা গায়ের উপর থেকে সরে যেতে দেখে কেমন ভয় পায় দীপ্তেন, ডেকে ওঠে " বাবা!"

স্বরটা একটু আর্ত হয়ে গিয়েছিলো কি? বাবা দ্রুত ফিরে বললেন কি রে!

লজ্জা পায় দীপ্তেন, পাশের চেয়ারটা নির্দেশ করে বলে, এখানে বসবে, বাবা? বোসো না।

তোর অসুবিধে হবে না তো, ফিরে আসতে আসতে বলেন টুকুন।

বুঝতে পারে দীপ্তেন, বাবা ভেবেছিলেন সে এখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।তাড়াতাড়ি বলে, না না, কোনো অসুবিধে হবে না।

চেয়ারে এসে বসেন বাবা। সরাসরি বাবার দিকে তাকায় না অনেকদিন দীপ্তেন। কোনো কারণ নেই, কিন্তু কেমন যেন মাঝখানে নিজের বড় হয়ে যাওয়াটা এসে দাঁড়িয়ে থাকে, নিজের বাবা হয়ে যাওয়াটা--আজও তাকায় না। মেঝের ছায়াটার দিকে তাকিয়ে থাকে। থাকতে থাকতে বলে, কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে।

ছায়া ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। খানিক পরে বলে, তোমার বন্ধুরা আর কেউ আসে না তো বাড়িতে, দীপু?

বন্ধুরা? দীপ্তেন চিন্তা করে। কারা আসত বাড়িতে? রণেন আসত, সে এখন কোথায় কে জানে, উৎসব একটা বেসরকারি ব্যাঙ্কে চাকরি করে, ফোনে কথাবার্তা হয়, কিন্তু হ্যাঁ, বাড়িতে আর কেউ আসে না-

অফিসের কলিগদের সেদিন ডেকে খাওয়ালাম যে বাবা, ফুচির জন্মদিনে?

তারা তো অফিসের লোক, দীপু, বন্ধু কি তারা?

একথা শোনা যায় না, কিন্তু দীপ্তেন শুনতে পায়। আরো একটা কিছু শুনতে পায়, একটা শ্বাস, একটা বয়ে যাওয়া হাওয়ার হিমেল স্পর্শ পায়, কে যেন পাশ দিয়ে সরে গেলো। ছ্যাঁত করে ওঠে দীপ্তেনের বুক।

বাবা উঠে পড়েছেন, একটু হাঁফ ছাড়া ধরার আওয়াজে টের পায় দীপ্তেন, বাবা চলে যাচ্ছেন। ঘরে। মনে মনে ডাকতে থাকে দীপ্তেন, বাবা, বাবা, যেও না। এতো সুন্দর চাঁদ উঠেছে আজ। আর একটু দেখো।

বাবার ঘরে ছোট্ট টেবিলল্যাম্প জ্বলে ওঠে।

এত ভোর সকালে উঠিছিস যে, মতি?

মতি তার বোকা হাসি হাসে। কাল তার ফাঁকা রাত গেছে, তাই সকাল সকাল ভেঙ্গে গেছে ঘুম। কলতলা থেকে জলের বালতিটি তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিতে নিতে বলে তুমি নাও গো দিদিমা, আগে।

অন্ন কলতলায় নিজের বালতিটি আগে পেতে নেন। ছোঁয়া বাঁচিয়ে অবশ্য। জল এখনো আসেনি, সবাই একে একে বালতি রেখে যায়। সাড়ে পাঁচটায় জল আসবে মুনিসপ্যালের কলে। অতক্ষণ কে ডাঁড়িয়ে থাকে।

তা হ্যাঁ লা মতি, কাজকম্ম কেমন করছিস বাবুপাড়ায়? হেসেই তো আছিস সারাক্ষণ। এ যেন অন্নর অনুযোগ, কেন যে মতি হেসেই থাকে তা বুঝে উঠতে পারেননা তিনি। শেষটায় স্থির করেন দাঁতগুলো উঁচু বলেই অম্নি লাগে।

মতি অবশ্য অন্নর অনুযোগের সার পায় না, বলে, ভালো ই গো দিদিমা। দাদাবাবু বৌদিমণি সবাই ভালো মণিষ্যি।

হ্যাঁ, তোর কাছে তো সবাই ভালো। এই ভোরে যাস, রাতে ফিরিস, ছেলে পিলে দুটিকে একটু দেখিসও না। ভিখিরি বলে কি ভিক্ষে মেগেই খেতে হবে?

এ অভিযোগের আর উত্তর দেয় না মতি। অপরাধীর মতো মুখ করে থাকে। তাই দেখে অন্ন আরাম পান। কাউকে তো উচিত কথা কইতে হবে, বিড়বিড় করেন। তা তুমি যতোই হাপ গেরস্ত হও না, মা তো বটে।

ফুচি বাগানের সামনের রাস্তায় টলমল করে হাঁটে। কাদা হাতে তুলে খিলখিল করে হাসে। দাদাবাবু চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। অন্যমনস্ক চোখ। লোহার গেট ঠেলে ঢুকতে ঢুকতে দেখে মতি চেঁচিয়ে ফেললো-ও ফুচিমণি, মাটি খেওনি!

কোথা থেকে দৌড়ে এলো বৌদিমণি, ফুচিকে কোলে তুলে নিল। দাদাবাবুর দিকে তাকিয়ে ভীষণ বিরক্ত গলায় বললো, খেলা দিতে পারো না, তো দেখতে নেওয়া কেন? সামনে মুখে মাটি দিচ্ছে, দেখতে পাও না?

দাদাবাবু বলে দেয়নি তো মুখে। আমি দেখছিলাম। আর একটু মাটি মুখে দিলে কিছু হয় না। ইমিউনিটি বাড়ে।

তবে আর কি, মাটি খাওয়াও। ধুপ করে ফুচিকে বারান্দায় বসিয়ে চলে যায় নবনীতা। ফুচি গোল গোল চোখ তুলে বাবার দিকে তাকায়।

দাদাবাবু নীচু হয়ে ফুচির পেটে আঙুল দিয়ে সুড়সুড়ি দ্যায়। অম্নি হেসে কুটিপাটি হয়ে যায় ফুচি। আঙুল ধরে টেনে বলে -খেলবে।

কি খেলবে মা?

বল খেলবে।

দাঁড়িয়ে মজাটা দেখছিল মতি। নবনীতা চিৎকার করে, হ্যাঁ, তুই-ও ওখানে দাঁড়িয়ে আদিখ্যেতা দ্যাখ, আমি বাসনগুলো মাজি।

জিভ কেটে কাজে যায় মতি। ঠাকুরঘর থেকে টুকুনদাদামশায়ের ঘন্টার আওয়াজ ভেসে আসে।

দীপ্তেন ঠিক করে ফ্যালে, আজ অফিস যাবে না। সারাদিন বাড়িতেই থাকবে। কোনো সই করবে না। এটা ঠিক করে ফেলেই তার মনে খুব শান্তি হয়। চেয়ারে গা এলিয়ে বসে।

সেঁকা পাঁউরুটি আর মাখন হাতে নিয়ে নবনীতা যখন বারান্দায় এসে বসে, তখন দীপ্তেন তাকে বলে, আজ অফিস যাবো না।

শরীর ঠিক আছে তো? নবনীতা একটু উদ্বিগ্ন হয়।

হ্যাঁ হ্যাঁ শরীর ঠিক আছে, বাড়ি থাকার কোনো অজুহাত খুঁজে পায় না দীপ্তেন, তারপর হঠাৎ বলে ফেলে, আসলে এক বন্ধুর বাড়ি যাবো ভাবছিলাম বিকেলে, তাই--

কে বন্ধু গো?

তুমি চিনবে না, ছোটোবেলার বন্ধু। আমরা তখন স্টেশনের ওদিকে ভাড়া থাকতাম। যা হোক একটা কিছু বলে দেয় দীপ্তেন, হুড়মুড়িয়ে।

ও আচ্ছা। আর আগ্রহ দেখায় না নবনীতা। দীপ্তেনও বেঁচে

যায়।

মতি কুয়োর পাশে নিচু হয়ে চোখে মুখে জল ছিটোয়। রাতের বৃষ্টির পর রোদ্দুরটি উঠেছে দুপুরের বড় কড়া। গা চিড়বিড় করে। আজ দা'বাবু বাড়ি থাকায় খাওয়া দাওয়া তাড়াতাড়ি চুকলো। খানিক দাওয়ায় শুয়ে ছিলো সে, টুকুন দাদামশায়ের হাল্কা নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো। এখন আর পাচ্ছেনা, দাদামশায় বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছেন। পা টিপে টিপে কুয়োর দিকে যেতে গিয়ে জানলা দিয়ে দেখলো বৌদিমণি দাদাবাবুর গায়ে পা তুলে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, খোলা, মোটা, কলার থোড়ের মতো পা, সাদা। দেখে মতির মুখে হাসি এলো, সুখ সুখ হাসি।

সিনিমায় গল্প দেখলে এরকম হয়। ছুঁতে হচ্ছে না তোমায়, চটকাতে হচ্ছে না, মেখে দেখতে হচ্ছে না অথচ দেখ কি না দ্যাখ রুটি হোলো, তরকারি হোলো, সেসব খেয়ে দ্যাখাও গেলো, কড়ির ঘরে ছোটো টিভি আছে, তাইতে এসব দেখা যায়। আরো লোকের বাড়িতেও আছে, কিন্তু সে বাড়িতে মতিকে ঢুকতে দ্যায় কে। এবাড়িতেও টিভি আছে, কিন্তু সে রাত্তিরে চলে, তখন মতি বাড়ি যায়।

তার চেয়ে বই ভালো। ডাইনীবুড়ির গল্পটা আর শোনাই হোলো না। ডাইনিবুড়ি নিশ্চিত দখিমায়ের মতো হবে, সাত বুড়ির এক বুড়ি তাকে কে ইস্টিশনে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলো, বুড়ি মরলো তো না-ই, দিব্বি হেঁটে বেড়াতে লাগলো তুরতুর করে। তারপর যখন সব্বাই দখিমা'কে ঘর করে দেবে বল্লো, তখন একদিন বুড়ি পুট করে মরে আমগাছের গোড়ায় পড়ে রইলো। তার হাঁ-মুখের কাছে মাছি উড়ছিলো, মুনিসপ্যালিটির গাড়ি না আসা অবদি মতি বসে বসে মাছি তাড়িয়ে দিয়েছিলো। সারা বেলা। ঘেন্না লাগেনি।

এখন মতি মাঝে মাঝে ভাবে, বড়োটাকে বেশ করে সাবান মেখে চান করিয়ে দেবে। ওকে সবাই ঘেন্না করে। খুব নোংরা। কিন্তু বড়ো ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দ্যায়। ঘেন্না পেলে ভিখিরিরা বেশি পয়সা পায়।

বেশ গরম দিয়েছে। ঘুমন্ত নবনীতার পা গায়ের থেকে আস্তে আস্তে নামিয়ে খাট থেকে নামে দীপ্তেন। সন্তর্পণে খোলে ছিটকিনি। পিছন পানের দাওয়ায় বেরিয়ে আসে। একটা সিগারেট হলে ভালো হতো। কিন্তু আবার ঘরে ঢুকতে হবে, নাঃ থাক। রান্নাঘরের লাগোয়া কুয়োতলার কাছে কাজের মেয়েটা চোখ মুখ ধুচ্ছে। পুরোনো ইঁটের পাঁজা, বর্ষার আগাছায় ঢেকে গেছে। দাওয়ায় রাখা একটা প্লাস্টিকের চেয়ার টেনে বসে দীপ্তেন। নিজের বাড়ির পিছনদিকটা কেমন অচেনা, আশ্চর্য তো! এতোটা জায়গা আছে এখানে, বেশ ভালো একটা বাগান হতে পারে। সামনের দিকে অনেকটা বাগান করেছে নবনীতা, কিন্তু খেদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই বলে, ওর হাতে গাছ বাঁচে না।

চাকরিটা ছেড়ে ভালো করেনি নবনীতা। মনে হয় দীপ্তেনের। কেমন আটকে গেছে ও, বাড়িটার সঙ্গে, এই মফস্বলী একাকিত্বর সঙ্গে, আজকাল বাপের বাড়ি গিয়েও থাকতে চায় না, বেকবাগানের দু-কামরার বাসায় ওর দম আটকায়। ভাইও বড়ো হয়েছে, ঘরের অভাব।

পড়াশুনোয় এমন কিছু ভালো ছিলো না দীপ্তেন, ভালো রেজাল্টও করেনি কোনোদিন, গড়িয়ে গড়িয়ে পাস করে গেছে, বি কম পাস করে হঠাৎ এই লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের পরীক্ষা লেগে যেতে চাকরি নিতে আর দ্বিধা করেনি সে। বরং বাবার খানিক আপত্তি ছিল, মাস্টার্সটা হল না--এ বংশে সকলেই--

মাস্টার্স করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না দীপ্তেনের। তাড়াতাড়ি চাকরিতে ঢুকে এসব পালা চুকিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল, রোগা, অমিশুক, বোকাটে, অন্যমনস্ক দীপ্তেন। অবাক কান্ড, চাকরিতে তার ভালই উন্নতি হতে লাগল। লোকে তার অন্যমনস্কতাকে ভারি পাত্তাও দিতে লাগল-মুহুরিবাবু বলেন, দত্ত আমাদের বড়বাবুকে পকেটে পুরে রেখেছে। বড়বাবু ভাবেন সে বুঝি অনেক অফিস পলিটিক্স বুঝে ফেলেছে। তার মিটমিটে হাসি,

অন্যমনস্কতা যে আসলেই বুদ্ধির পরিচায়ক কিছু নয়, দীপ্তেন যে অম্নিই, সে কথা অগত্যা চাপা পড়ে গেলো।

তেমন কোনো অশান্তি নেই দীপ্তেনের। কোনো অভিযোগও তেমন নেই। বন্ধুরা অনেকেই বেশ ভালো ভালো জায়গায় আছে, সে নিয়েও ভাবে না সে, সে তো তেমন একটা উজ্জ্বল ছাত্র ছিল না। নবনীতাও বি এ পাশ, কিছুদিন চাকরিও করেছে, মাঝে মাঝে বনে, মাঝে মাঝে তুমুল অশান্তি হয়, হিসহিসে অশান্তি, কখনো একটা সিনেমা দেখা নিয়ে, কখনো একটা সিগারেটের ছাই ঝাড়া নিয়ে, কিন্তু এতোদিনে জেনে গেছে দীপ্তেন, ঐ অশান্তিগুলোই নবনীতার শরীরের চাবিকাঠি। তার পরেই শরীর-জ্বর ছেঁকে ধরে তাদের, এছাড়া বিনোদনটাই বা কি?

নাঃ, ঘাড় নাড়ে দীপ্তেন। বড্ড চেনা চতুর্দিকটা। ভীষণ চেনা। সর্দিমোছা ন্যাকড়ার মতো, জ্বরো রোগীর গন্ধে ভরে থাকা ঘরের মত। ভাল্লাগে না।

কাজের মেয়েটা সামনে এসে বলল, চা করি দেব?

মাথা নাড়ল দীপ্তেন। বেশ কয়েকবার।

মেয়েটা কিছু বলল না। বোকা বোকা মুখে তাকিয়ে রইল। বিরক্ত হয়ে দীপ্তেন মুখে বলল-না। বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ করে।

এবার বোধহয় বুঝল মেয়েটা। ঘাড় হেলিয়ে সরে গেলো। বেশি দূরে নয়। রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসল। ওখানে ওর মাদুর পাতা আছে।

দীপ্তেন দেখল, অদ্ভুত শান্ত মুখে মেয়েটা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রায় মৃত দৃষ্টিতে। সামনে দুটো নীল ফড়িং উড়ে যাচ্ছে একে অন্যকে ঘিরে, গোল গোল---

ফুচির বাবার কোনো বন্ধু নেই।

সন্ধ্যের ঝোঁকে টিভি খুলে বসলো নবনীতা। তারপর আবিষ্কার করলো, কেবল এর অর্ধেক চ্যানেল আসছে না। মেজাজ বিগড়ে

গেল তার। বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল, কি করে এখন। রাত্রের রান্না সকালেই হয়ে গেছে, মতি রান্নাঘরে বসে রুটির আটা মাখছিল, সেখানে গিয়ে বসল। একটা পুরোনো সাইকেল নিয়ে কোথায় বেরোলো দীপ্তেন, বন্ধুর বাড়ি নাকি।

মতি, এখন বাড়ি গিয়ে কি করিস?

ফিক করে হাসল মতি, বাড়ি যেতে যে এক পোয়া রাত হয় গো। গিয়ে আর কি করব।

অনেকটা সময় লাগে বুঝি যেতে? স্টেশনের কাছে নয় তোদের বস্তি?

মতি অপাঙ্গে একবার বৌদিমণিকে দেখে নেয়। বোকা মানুষ সে, বুঝে সুঝে উত্তুর দিতে হয়, কাজলমাসীর শেখানো।

ইস্টিশনের কাছে, কিন্তু তোমরা যে রাস্তা দে' যাও, ঐটে নয়, হাঁটা পথ গো। বড় পুকুরের পাশ দিয়ে যেতি হয়।

ওটা পুকুর নাকি, ছড়িয়ে বসলো নবনীতা, ওতো পচা ডোবা!

না গো, ঐতে মাছ আছে, উপ্রে শেওলা, নিচে কতো মাছ, তাদের চোখ পুটি পুটি করে জলে ভাসে।

মাছ ধরিস বুঝি তোরা?

আমি? না, আমি দেখি। পুকুর পেরিয়েও অনেক যেতে হয়, কামালিপাড়ার মদ্দি দিয়ে, আদ্যিদাদার সাইকেল রাখার দোকান, তার পর গে হোলো, ইস্টিশনের দিকে হুই রাস্তা গেছে, আর একদিকে দেখবা, ভুরুর মতো বেঁকে গেছে রাস্তা। সেই দিকে যেতে হয়।

ভুরুর মতো রাস্তা? নবনীতার মুখে হাসি ফোটে, বেশ কথা বলিস তো তুই, গল্পের মতো।

লজ্জা পায় মতি, তারপর বলে সত্যি অমন।

নবনীতা ভাবে, সত্যি কতদিন একটাও গল্পের বই পড়া হয়

না, অথচ কতো বই পড়ত সে, বিয়ের আগে, বিয়ের পরেও, ভারী বই নয়, নেহাত গল্পের বই, প্রতিভা বসু, আশাপূর্ণা--

মতি দেখল, বৌদিমণির চোখ দুটো অনেক দূর কোথায় চলে গেলো। এরম হয়, জানে সে। কেশবদাদুর হত। একরাতে তার উপরে গোঙাতে থাকা মাস্টারের মুখটা তুলে সে দেখেছিল, চোখদুটো কোথায়, ভিতরপানে, অনেক ভিতরে আছে ধূপের বন, সেইখানে ছাতা হাতে মাস্টারনী হেঁটে যায়। মাস্টার বলেছিল।

আটার লেচি কেটে, সাদা প্লাস্টিকের কৌটোয় তরকারি ভরে মতি চলে গেল। ওঘরে টুকুনদাদামশায়ের সাথে ফুচি খেলতেই লাগল, রান্নাঘরের মেঝেতে বসেই রইল নবনীতা। জল পড়েছে মেঝেতে, তাই আঙুলে করে নিয়ে একজোড়া ভুরু আঁকল। তাতেই ফুরিয়ে গেল জলটুকু।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যেতে থাকলে ডাইনিবুড়ি চক্কর কাটে এদিক ওদিক। তার ঝাড়ুর হাওয়া লাগে মানুষের গায়। চাঁদের গায়ের থেকে এক খাবলা আলো খসে গড়িয়ে পড়ে একলা পথচলতি লোকের গায়।

চমকে উঠে মতি দেখল, আজও দাদাবাবু ঐ রাস্তা ধরে আসতেছে। আনমনা বেভুল চোখ। সাইকেল হাঁটিয়ে।

মতি দাঁড়াল। কিছু বলল না।

দীপ্তেনও দাঁড়াল। তারপর অপ্রস্তুত গলায় বলল, নিজেকে অবাক করে বলল, রাস্তাটা খুব সুন্দর, না? গল্পের মত।

মতিকে উদ্দেশ করেই বলল বোধহয়।

মতি ফিক করে হেসে দিল। দুটো দাঁত আরো একটু বেরিয়ে এল। তারপর দুটো বোকা মানুষ উল্টো দিকে হেঁটে বাড়ি ফিরতে লাগল। যে যার গল্পের দিকে।

সেই রাতে মতির ঠোঁটের মধ্যে একটা একেবারে অচেনা ঠোঁট যখন ডুবে যাচ্ছিল, তখন আঁকুপাকু করে নিজেকে বের করে

এনে মতি হাঁফ ধরা গলায় জিগেশ করলো, তোমার নাম কি গো বাবু? তোমার নাম?

খসখসে একটা গলা উত্তর দিল, কালু। তারপর আবার ডুবে গেল।

বালিশে রাখা মাথা একটু কাত করে মতি দেখে, একটা ডুরে শার্ট, পকেট থেকে একটা গোলাপি কাগজ বেরিয়ে আছে। পানমশলার গন্ধ। বিড়ির। আর টালির ফাঁক দিয়ে, চাঁদের আলোর সঙ্গে ঘরে নেমে আসছে গুছি গুছি গল্প। মাটির মতো। ফুচির মতো। বড়োর মতো।

ডাইনিবুড়ির চুল।

বোকা বোকা হেসে আরামে চোখ বুজল মতি।

প্রাথমিকভাবে গুরুচণ্ডা৯ র টইপত্তরে প্রকাশিত।

লেজপুরাণ

আহমেদ খান হীরক

গতরাতের ঘটনাটা যে নিছক দুঃস্বপ্ন ছিল এটা ভেবে তোমার ভেতর একটা স্বস্তি, এমনকি খানিকটা আনন্দও তৈরি হয়। হেসে ফেলো তুমি। মাথার ওপর সাঁ সাঁ করে ঘুরে চলা ফ্যানের দিকে তাকিয়ে তোমার মনে হয় একটা এসি ঘরে লাগানো জরুরী হয়েই পড়েছে। এই ফ্যান শ্রাবনের এই সকালেও ঘরটাকে আর ঠাণ্ডা রাখতে পারছে না। জানালার কাচ আর ভারী পর্দা গলিয়ে আসা বাইরের তাপ ঘরের ভেতর এখনো বদ্ধ। তোমার পিঠের নিচে এখনো রাত্রের ঘাম। আর বুকের ভেতর রাতের ভয়ানক দুঃস্বপ্ন।

কিন্তু এখন তোমাকে অফিস যেতে হবে। স্মার্টফোনের ততোধিক স্মার্ট অ্যালার্ম বেজে বেজে বন্ধ হয়ে গেছে। তোমাকে উঠতে হবে, ব্রাশ করে নিজেকে পরিস্কার করে, কেতাদুরস্ত পোশাক পরে বেরোতে হবে। আর বাইরে বেরোলেই একঝাঁক হল্লা তোমাকে আক্রমণ করবে। তোমার দায়িত্ব হবে সেই হল্লা আর বিবিধ গ্লানিকে পাশ কাটিয়ে, নিজের পোশাকের ভাঁজ এতটুকু নষ্ট হতে না দিয়ে অফিসে পৌঁছানো। অফিসে তোমার যতটুকু দাম, তোমার নিভাঁজ পোশাকের দামও তারচেয়ে কম কিছু না। মার্কেটিং অল অ্যাবাউট আগে দর্শনধারী পরে গুণবিচারী!

তা তোমার গুণবিচার অবশ্যই হয়েছে। গত ছয়টা বছরে তোমার উত্থান তোমার বন্ধুদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক বন্ধু, যে ল পাশ বা ফেল করে এখন আদালতে কিছু একটা করে, সে সেদিনও বলছিল তার পেশা পরিবর্তনের কথা। বলছিল সে তোমার পেশায় চলে আসবে কিনা ভাবছে...কারণ

পৃথিবী এখন কেবলই বাণিজ্যের। সুতরাং, আইন কপচিয়ে আর আয়-রোজগার কই? তুমি তেমন কোনো উৎসাহ দেখাওনি। না দেখানোর পেছনে অন্য অনেকগুলো কারণের একটা এই যে এই বন্ধুটি তোমার খুবই কাছের ছিল। সম্ভাবনাও ছিল তার। তুমি চাওনি তোমার পেশাতে বন্ধুটি এসে তোমাকে ছাড়িয়ে যাক। শত্রু উন্নতি করলে রাগ হয়, কিন্তু বন্ধু উন্নতি করলে যে জ্বালা হয় তা সারা জীবন বহন করতে হয়। সেই জ্বালা তুমি এমনিতেই বহন করে চলেছো উনিশ মাস ধরে।

উনিশ মাস আগে তোমারই আরেক বন্ধু, যার ছিল একটা হতাশাপূর্ণ জীবন, মাস্টার্স শেষ করে স্রেফ বসে ছিল ঘরে, যাকে তোমরা ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে কেবলই করুণা করতে শুরু করেছিলে, যাকে ফোন দিয়ে লাইফ ইজ বিউটিফুল বলে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করতে করতে বুকে বকুল ফুলের সুবাস অনুভব করতে এই ভেবে যে আহা বন্ধুটাকে কতই না হেল্প করে চলেছো তোমরা...সে হঠাৎই একদিন দুম করে কানাডা চলে যায়। তার চাচা বা খালু বা ফুপা বা এরকম কোনো সূত্রতা ধরে। তারপর আর কোনো খোঁজখবর থাকে না তার। তোমরা প্রথম দিকে অভিমান করো--আচ্ছা তো সে একটা! কোনো খবরই নিলো না আমাদের! তোমরা নিজেদের আড্ডায় তার প্রসঙ্গ উঠলে বেশ গালাগাল করো। শালা একটা বেইমান! শালা আমাদের কাউকে কিছু না জানিয়ে কেমন কানাডা চলে গেল!

তারপর তোমরা ভাবতে শুরু করো মালয়েশিয়ায় যেমন হয়, মধ্যপ্রাচ্যে যেমন হয়, কানাডাতেও কি তেমনই হয় বাংলাদেশী শ্রমিকদের?তখন কেউ কেউ বলে কানাডা দারুণ সুখের জায়গা। ওখানে অনেক কাজ। আর অনেক টাকা। কানাডার টাকার সাথে বাংলাদেশের টাকার ফারাক জেনে তোমরা স্তম্ভিত হয়ে পড়ো। কানাডাকে তোমাদের স্বর্গ মনে হয়।

ফলে তোমাদের মেজাজ তিরিক্ষি হতে থাকে। আর বন্ধুটা যে জাতীয় বেইমান এই ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত হতে থাকো।

এর মধ্যেই একটা উড়ো খবর আসে যে তোমার ওই বন্ধুটি কানাডায় খুব ভালো আছে। একটা শপিং মলে সে এখন কাজ করে। দিনরাত কাজ করে। আর তার ব্যাংক ব্যালান্স নিত্যই ফুলে ফেঁপে উঠছে। সে একটা গাড়ি ইতিমধ্যেই কিনে ফেলেছে, এবং ফ্ল্যাট কিনবে বলে খোঁজ করছে। বন্ধুটি ফেসবুকে নেই বলে এসব খবর পেতে তোমাদের দেরী হয়ে যায়। তখন তোমরা বলতে থাকো যে বন্ধুটি যদিও মাস্টার্স পাশ তবুও একটা মূর্খ বিশেষ; কেননা সে ফেসবুক চালাতে পারে না। আর সারাদিন গাধার মতো কাজই করে যায়। এর থেকে তোমাদের জীবনই অনেক সুখের। সন্ধ্যায় অন্তত একটা চায়ের আড্ডায় বসতে পারো তোমরা আর নিজের দেশের নিজের মানুষদের সাথে কথা বলতে পারো। কানাডায় তো বাংলা বলার কেউ নাই। তখন তোমাদের হঠাৎ করে অনেক দেশপ্রেম জেগে ওঠে। আর তোমরা ভাষা, কালচার, ঐতিহ্য ইত্যাদির বিপরীতে তোমার ওই বন্ধুকে ফেলে দিয়ে তাকে প্রায় মীরজাফরে ভূষিত করো।

অবশ্য এর মধ্যেই তুমি চেষ্টা করো কানাডাপ্রবাসী বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করতে। তার এক ভাগ্নের কাছ থেকে কানাডার ফোন নাম্বার জোগাড় করে ফেলো তুমি। কিন্তু জোগাড় করার পরেও বেশ কিছু দিন কাটে যোগাযোগহীন। কারণ সেই সময়টা তুমি ভীষণ ব্যস্ত থাকো তোমার অফিসের কাজ নিয়ে। একটা নতুন প্রোডাক্ট বাজারে নামাতে যাচ্ছে কোনো এক মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি। সেই প্রোডাক্টের মার্কেটিং নিয়ে তোমার মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা হয়। রাত-দিন এক করে তোমাকে খাটতে হয়। কারণ এমন একটা অবস্থা তৈরি হয় এক সময় যে কাজটা প্রায় ফসকে যেতে ধরে তোমার হাত থেকে। তোমার বস, যার অনেকগুলো মাথা ও পা এরকমটাই তুমি বিশ্বাস করো,তিনি তোমাকে ডেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিন দিনের মধ্যে প্রজেক্ট জমা দিতে না পারলে কাজটা তোমার জুনিয়রকে দিয়ে দেয়া হবে। তোমার পৃথিবীটা দুলে ওঠে আর তোমার মনে হয় আসলে তিন দিনের মাথায় তোমাকে ফায়ার করার ঘোষণা দিয়ে দেয়া হয়েছে।

চাকরি হারানোর ভয়ানক একটা অনুভূতি নিয়ে নিজের ডেস্কে ফিরতে ফিরতে তোমার চোখের সামনের সব আলো ঘোলা হয়ে আসতে থাকে। কম্পিউটার স্ক্রিন অভাবিতভাবে কাঁপতে থাকে। আর তোমার আঙুলগুলো কি-বোর্ডের ওপর নেচে উঠতে পারে না। মনে হয় আঙুলগুলো প্যারালাইজড হয়ে গেছে। তুমি প্রজেক্ট তৈরি করতে পারো না, কখনো পারবে এরকম ভরসাও হয় না তোমার। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেলেও তুমি চুপচাপ অফিসে বসে থাকো। এমনকি তার পরের দিনও তুমি একইভাবে বসে থাকো অফিসে। আর অফিসের সবাই ফিসফাস করে বলতে থাকে যে এই মাসে অন্তত এক জনের চাকরি নিশ্চিত যাবেই যাবে! তুমি বেসিনের আয়নায় নিজেকে কুয়াশাচ্ছন্ন দেখ।

দারুণ ভীতি নিয়ে তুমি লাঞ্চ করো। প্রিয় গরুর মাংসও তোমার গলা দিয়ে নামে না। এমনকি রোদেলার ফোনকলও বিশ্রী লাগে। রোদেলা বারবার জানতে চায় কী হয়েছে? তুমি তাকে জানাও যে তুমি কানাডা চলে যেতে চাও। কারণ এই দেশে চাকরির কোনো নিশ্চয়তা নেই। তারচেয়েও বড় কথা মানুষ হিসেবে কোনো সম্মান তো নেই-ই এখানে! রোদেলা তোমাকে শান্ত করার চেষ্টা করে কিন্তু তুমি শান্ত না হয়েই সন্ধ্যার রাস্তায় নেমে পড়ো। এবং ঘুরতে ঘুরতে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে আবিস্কার করো বসের ফ্ল্যাটের সামনে। তুমি অনেকক্ষণ বাড়ির সামনে অনর্থক ঘোরাঘুরি করো। তুমি জানো না ফ্ল্যাটের কোন তলায় তোমার বস থাকে। কিন্তু তোমার মনে হয় তৃতীয় তলার ব্যালকনিতে বসের মেরুন শার্টটা একলা ঝুলতে দেখো। তুমি সেই শার্টটাকে লক্ষ্য করে একটা ঢিল ছুঁড়তে চাও, শার্টটাই যেন বস এই ভেবে তুমি সেটাকে ছিঁড়েফেড়ে ফেলতে চাও, কিন্তু পারো না--তার আগেই বসের গাড়ি হুশ করে বেরিয়ে আসে ফ্ল্যাটের পেট থেকে। আর বসেরা পারিবারিকভাবে তোমাকে দেখে ফেলে। আর তুমিও এখানে যে এসেছো এক বন্ধুর কাছে ইত্যাদি বলতে বলতে গলে যাও। বসের বউকে তুমি ম্যাডাম ম্যাডাম বলে কেন্নর মতো ছোট হতে থাকো। বসের ছোট্ট ছেলেটাকে কোলে

তুলে নাও তুমি এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘাড়েও। বস এমনকি তোমাকে তাদের সঙ্গে রেস্তরাতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালে তুমি তাতে সাড়া দিয়ে তোমার কাল্পনিক বন্ধুকে উড়িয়ে ফেলো। আর তাতে তোমার অফিসের তৃতীয় দিনটা আনন্দে ভরে ওঠে। কারণ তোমার জমা দেয়া প্রোজেক্টটা পাশ হয়ে যায়। জুনিয়র জুনিয়রই থেকে যায়, আর নতুন প্রোজেক্ট নিয়ে তুমি মার্কেটিঙে ঝাঁপিয়ে পড়ো। তোমার মনে হয় তোমার কানের পাশ দিয়ে একটা গুলি বেরিয়ে গেছে। ফলে বেশ কিছু ফুল আর চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে আনানো ফরমালিনহীন আমের ঝুড়ি নিয়ে তুমি এবার সরাসরি বসের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ো। সরষে-ইলিশ দিয়ে মাখিয়ে মাখিয়ে ম্যাডাম ম্যাডাম বলে ভাত খাওয়ায়। আর পরের ছুটির দিনে বসের পরিবারের সাথে তুমি ফ্যান্টাসি কিংডম ঘুরে আসো। এভাবেই তোমার অফিস বিভক্ত হয়ে পড়ে--সকালে ডেস্কে বসো তুমি আর সন্ধ্যায় বসের ড্রইঙে।

রোদেলা তোমাকে ফোন দিয়ে দিয়ে আর পায় না।

অবশ্য কিছু দিন পর রোদেলাকেও তুমি ফোন দিয়ে দিয়ে পাও না। রোদেলা তখন সদ্য একটা চাকরিতে ঢুকেছে বলে তুমি শুনেছো এবং এও শুনেছো তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে তারই অফিসের কোনো উচ্চপদের সাথে। তুমি যখন হন্যে হয়ে রোদেলাকে খোঁজা শুরু করে ব্যর্থ হয়ে পড়ো তখন তোমার ভেতরে এক দেশদ্রোহী গর্জন করে ওঠে--কী হবে এই দেশে থেকে? এই দেশের সবাই স্বার্থপর সব্বাই বেইমান!আর বেইমান বলার সাথে সাথে তোমার সেই কানাডাপ্রবাসী বন্ধুর কথা মনে পড়ে। যার ফোন নাম্বার তুমি নিয়ে রেখেছিলে তোমার স্মার্টফোনে। সেটি খুঁজে বের করে এক রাতে তুমি তাকে ফোন দিলে সে ধরে না। তখন তোমার বুঝতে বাকী থাকে না যে তোমার বন্ধুটি আসলেই এক ইতরে পরিণত হয়েছে। না হলে বন্ধুর ফোন কেন ধরবে না সে? কিন্তু তুমি চেষ্টায় ত্রুটি রাখো না কোনো। ফোনকল আর টেক্সট ম্যাসেজে দিনরাত ভরিয়ে তোলো। আর এক গভীর রাতে অজানা নাম্বার থেকে ফোন আসে।

ঘুমের মধ্যে থাকায় ফোনটা বাজতে দেখেও কেটে দিতে চাও তুমি...কিন্তু তখনই তোমার কানাডার কথা মনে পড়ে। ফলে কাচা ঘুম ভাঙার পরেও মধু ঢেলে তুমি হ্যালো বলে ওঠো। আর ওপ্রান্তে তোমার বন্ধুটিও প্রায় উচ্ছ্বাসের মতো একটা শব্দ করে। কিন্তু তার কণ্ঠে বিত্তের ঝনঝনানি তুমি টের পাও। ফলে মনে মনে অনুভব করো একটা গভীর বিতৃষ্ণা। অথচ দারুণ ভালোবাসার টোনে তুমি কথা চালিয়ে যাও। আর চালাতে চালাতে তুমি জানতে পারো তোমার অন্যান্য অনেক বন্ধুই আসলে গোপনে গোপনে কানাডাপ্রবাসী বন্ধুর সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছে। এবং তারা সবাই, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, ইনিয়ে-বিনিয়ে জানিয়েছে তারাও আসলে কানাডা চলে যেতে চায়। কারণ এই দেশ বেইমানের, এই দেশে কিছু নাই, এই দেশে আর মানুষ থাকতে পারে না!

তুমি নিজের কথা আর বলতে পারো না। কিন্তু তুমি আবার ফোন দেয়ার কথা বলে ফোনটা কেটে দাও। এবং তোমার অফিসসূচি বাড়িয়ে ফেলো। তোমার অনেক কাজ। অনেক অনেক কাজ। অফিসের কাজ। অফিসের বসের বাসার কাজ। সব কাজ সামলাতে সামলাতে নিজেকে তোমার রিক্ত মনে হয়। মনে হয় তুমি যা শ্রম দিচ্ছো তার সমান তো দূরে থাক তারচেয়ে আসলে অনেক অনেক কম আয় করছো। তোমার কিছুই হচ্ছে না। না গাড়ি হচ্ছে, না বাড়ি হচ্ছে, না ব্যাংকে জমছে কিছু। তুমি হঠাৎই খুব ভীত হয়ে পড়ো এই ভেবে যে হঠাৎ যদি কোনো দূরারোগ্য অসুখ হয় তাহলে তোমার এমন কোনো সঞ্চয় নেই যে তুমি নিজের চিকিৎসা চালাতে পারো। তোমার মনে হয় তোমার অন্য কোথাও চাকরি করা উচিত। কিন্তু অন্য কোথায় গেলে তুমি এর চেয়ে ভালো আয় করতে পারবে কিনা বুঝে উঠতে পারো না! তুমি তখন নিজের বিজনেসের কথা ভাবো। কিন্তু তার জন্য প্রবল অর্থকড়ির দরকার বলে সে চিন্তা বাদ দাও। আর তুমি আবার কানাডাপ্রবাসী বন্ধুকে ফোন দিয়ে ফেলো। সে তখন তার সুখের কথা শোনায়। জানায় সেখানে কাজের ক্ষেত্রে মিনিট-সেকেন্ড কাউন্ট হয়। তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলো। সে জানায় একটা ফ্ল্যাট দেখে

রেখেছে সে--যে কোনো দিন ইরানি বান্ধবীকে নিয়ে সেই ফ্ল্যাটে উঠে যাবে। ইরানি মেয়ের কথা শুনে তোমার হতাশা আরো তীব্র হয় আর হঠাৎই রোদেলার কোমল গ্রীবার কথা মনে পড়ে যায়। তাতে কথা শেষ না করেই ফোন রেখে তুমি রোদেলাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ো। সিনেমায় দেখানো অতীত ঘটনার মতো রোদেলার সঙ্গে বেড়ানোর নানান স্মৃতি মনে পড়ে যেতে থাকলে ওই রাতেই তুমি রোদেলাকে ফোন দিয়ে ফেলো। আর তুমি জানতে পারো সেদিনই রোদেলার বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু রোদেলার সাথে কোনো কথা তোমার হয় না। তার হয়ে কথা বলে তার উচ্চপদের স্বামী। যদিও রোদেলার রিনরিনে হাসির শব্দ ফোনের আবহে তুমি পেতে থাকো। স্বামীটি তোমাকে দাওয়াত দিয়ে বসে এবং জানায় বউয়ের প্রাক্তনের সাথে দেখা করতে তার নাকি অনেক ভালো লাগবে। এতে ওপাশ থেকে রোদেলা কিছু বলে উঠলে তারা নিজেদের মধ্যে কথাকেলিতে ব্যস্ত পড়ে। তুমি সম্ভবত একটা গালিই দিয়ে ফেলো উচ্চস্বরে তাতে ওদিকে হাসির হুল্লোড় ওঠে। ফোন ফেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে বাকী রাতটা তুমি পার করে দিতেই পারতে এর পরে। কিন্তু অজানা কারণেই হয়তো সে রাতে তোমার বেশ ঘুম হয়। কিন্তু ঘুমের মধ্যে তোমার সাথে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে। এবং মনে হতে থাকে ঘটনাটি তোমার ঘুম ভাঙার পরেও ঘটে যেতে থাকে। তোমার মনে হতে থাকে তোমার পিঠের নিচে, নিতম্বের একটু ওপরে ঘটনার সূত্রপাত। প্রথমে সেখানে মৃদু ব্যথা অনুভব করো তুমি। যেন চামড়ার ভেতর থেকে কেউ ধাক্কা দিচ্ছে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য। চেষ্টা করেও তুমি তোমার হাত সেখানে পৌঁছাতে পারো না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেখানে পৌঁছানোর নানা কসরত তুমি করতেই থাকো আর তোমার মনে হতে থাকে তোমার পেছনে চামড়া ফেটে কিছু একটা বেরিয়ে আসছে। তীব্রভাবে বেরিয়ে আসছে। আর চামড়া ফাটার সাথে সাথে তোমার ব্যথার মাত্রা বাড়তে থাকলে তুমি গোঙাতে শুরু করো। কাটা মুরগির মতো ছটফট করতে থাকো বিছানায়। আর এরই মধ্যে সপাৎ

ধরনের আওয়াজ করে কিছু একটা সত্যি বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে। আর সেখানে পৌঁছানো মাত্র তোমার হাত একটা পেলব কিন্তু আঁঠালো কিছুকে ধরতে পারে। একটা লম্বাটে সাপ? নাকি অন্য কিছু? জিনিসটাকে ধরে তুমি তোমার চোখের সামনে নিয়ে আসতে চাও...তোমার দারুণ ব্যথা হয়...কিন্তু তুমি চেষ্টা করতেই থাকো...আর অবশেষে কোমর থেকে বক্রাকারে ঘুরে জিনিসটা যখন তোমার চোখের সামনে হাজির হয় অন্ধকারের ভেতরেও তুমি স্পষ্ট বুঝতে পারো এটা একটা লেজ। তেলতলে, আঁঠালো, জন্মমজ্জা মিশ্রিত একটা লেজ। যার ডগায় একগুচ্ছ মিহি চুল। তোমার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। তুমি চিৎকার করে ওঠো। তোমার হাতের ভেতর লেজটা জীবন্ত প্রাণের মতো তার শরীরটা মোচড়াতে থাকে।

আর দুঃস্বপ্নটার কথা ভেবে শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে এখনও তুমি হেসে ওঠো। ঝরনা থেকে শীতল পানি নেমে এলে তুমি চোখ বন্ধ করে ফেলো আর তখন হঠাৎই অনুভব করো তোমার পেছন দিকে একটা বাড়তি প্রত্যঙ্গেও ঝরে যাচ্ছে শীতলতা। এবার তুমি আৎকে ওঠো না। বরং বাড়তি অংশটিকে তোমার খুবই প্রিয় মনে হয়। মনে হয় এ অংশটা এতদিন তোমার ভেতরে গোপন ছিল— এবার তার মুক্ত হওয়ার সময় এসেছে। বন্ধ চোখেই প্রত্যঙ্গটা তুমি একবার নাড়াতে পারো, তারপর ক্রমাগত সেটা নাড়াতেই থাকো, নাড়াতেই থাকো।

তুমি প্রস্তুতি নাও চোখ খোলার। ধীর এবং শীতল প্রস্তুতি। যেন এই প্রথম নিজেকে দেখবে। তোমাকে এবার শুধু একটা আয়নার সামনে দাঁড়াতে হবে...

ছবি: দেবরাজ গোস্বামী

কাঠগড়া

কৌশিক দত্ত

লক আপ থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে বসাকের মনে হল লোকটাকে আরেকটা লাথি মারা প্রয়োজন। অভিজ্ঞ রাঁধুনিদের যেমন আন্দাজ থাকে নুন মিষ্টি কোথায় আরেকটু লাগবে, দুঁদে পুলিশ অফিসারদেরও তেমনি এসব আন্দাজ পাক্কা। একটা লাথি কম পড়ে গেছে। ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে, অবজ্ঞা করতে নেই।

অগত্যা ফিরে গিয়ে ফের পা চালায় বসাক। যুতসই হল না। পায়ের পাশের দিকে লাগল। তবে লাথিটা খাবার পর লোকটা ভারি সুন্দর পজিশনে এসেছে। এই অবস্থায় তার তলপেট, লিঙ্গ, অণ্ডকোষ একসাথে কভার করে বুটের তলা দিয়ে একটা আগুন নেভানো গোছের দুরমুশ লাথি না মারতে পারা পেনাল্টি মিস করার মতো অপরাধ। অগত্যা মারল বসাক, বাধ্য হয়েই খানিকটা। লোকটা এবার আর চিৎকার করল না, কঁক করে একটা হাল্কা আওয়াজের সঙ্গে কেঁপে উঠল শুধু। চেঁচালে বেশ উৎসাহ নিয়ে দুটো পাল্টা খিস্তি দেওয়া যেত, সাথে দু-একটা বাড়তি লাথি। আওয়াজের অভাবে থ্রিল তৈরি হল না। নির্বাক যুগের কোনো অ্যাকশন মুভি দেখেনি, তাই কিঞ্চিৎ বিমর্ষ বসাক বেরিয়ে এল লক আপ ছেড়ে।

টেবিলে চায়ের কাপটা রেখে গেছিল ছোটন। দুধহীন, লেবুহীন, চিনিগোলা কালো চা, তার ওপর ঠাণ্ডা। দুই চুমুকে শেষ করে মেজাজটা আরো খিঁচড়ে গেল। শালারা পেয়েছে কী? কাপটা তুলে আছাড় দিতে গিয়েও ঠক করে টেবিলে নামিয়ে রাখল বসাক। মাত্র দু'মাস আগে পাওয়া বোন চায়নার সেট, প্রমোদ মেহেতা দিয়েছিল। ফোকটে পাওয়া হলেও কয়েদীর উপস্থের মতো সস্তা

নয়, যে ইচ্ছেমতো লাথানো যাবে। অবশ্য আজকাল তেমন তেমন আসামীদের প্যাঁদানোর জো নেই, হিউম্যান রাইটসওয়ালারা চলে আসবে। নেহাত এই লোকটার আদৌ কোনো ব্যাকগ্রাউণ্ড নেই বলে। পুলিশের রেকর্ডে নাম নেই, কোনো রাজনৈতিক কানেকশন জানা যাচ্ছে না, বাড়ির লোকও কেউ নেই। এই কোনোকিছুই না থাকাটা সবচেয়ে অস্বস্তি দিচ্ছে সবাইকে। এরকম হয় নাকি? কে লোকটা? দেড় দিন চেষ্টা করেও কেস গোটানোর মতো কিছু জানা গেল না। এদিকে কাল আবার কোর্টে পেশ করতে হবে। শালা এর মধ্যে মরে যাবে না তো? একবারে এত লাথানো ঠিক হয়নি, মাঝে বিশ্রাম দিয়ে মারা উচিত ছিল।

মঙ্গলবার যথারীতি ভিড় জমেছিল হামিরপুর মহকুমা আদালতে। এজলাস কটার সময় বসবে, তার নিশ্চয়তা থাকে না কোনোদিনই, তবু দশটা না বাজতেই "এই বুঝি শুরু হল" ভাব নিয়ে পাগড়ি বাঁধে গোটা চত্বর। সামনের বড় দরজা দিয়ে আনাগোনা কম, সবাই ঢোকে উত্তর দিকের গেট দিয়ে লম্বা করিডোর পেরিয়ে। ওদিকেই মোক্তার আর উকিলবাবুদের ছাউনি। অজস্র বেঞ্চ, টেবিল, কালো কোট, টাইপরাইটার। তার মধ্যেই চায়ের দোকান... "অ্যাই শ্যামল, চারটে এদিকে, একটা চিনি ছাড়া।" বিস্কিট, কেক, কুরকুরে আর জলের বোতল পাওয়া যায় ছাউনির উত্তরতম কোণায়, স্টেশন যাবার শর্টকাট গলি রাস্তা থেকে ঢোকার ফটকের পাশেই। আরো অনেক কিছু পাওয়া যায় এই চৌহদ্দিতে, যেমন নানা মূল্যের সরকারি শীলমোহর করা উৎকৃষ্ট বণ্ড কাগজ, নোটারি করা অ্যাফিডাভিট, বিচার, আশ্বাস, পরবর্তী শুনানির ডেট, ইত্যাদি।

"স্ট্যাম্প পেপার এখন নেই দাদা, আসছে না। আচ্ছা, দেখি কিছু করা যায় কিনা। ওদিকে চলুন। দশ টাকা করে হবে না কিন্তু। পাঁচটা আড়াইশ' লাগবে। না হলে ছেড়ে দিন। আরে, কী করব? পাব কোথায়? থাকলে দিতাম না?"

(কাট টু হ্যাণ্ড হেল্ড মিড শট)

"টেনশন নিচ্ছেন কেন? ওনার বেইল হয়ে যাবে আজ। না, বেশি কথা বলার দরকার নেই। এগুলো অন্য ব্যাপার আছে। হয়ে যাবে, ব্যাস। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি আমাকে সাড়ে চার হাজার দেবেন।"

(কাট টু লং শট)

"দিদি, ও দিদি, ওই বেঞ্চটায় বসবেন না। ওধারটায় গিয়ে বসুন। হ্যাঁ, ওটায়।"

আদতে এমন ক্রমান্বয়ে হয় না কিছুই। কাট নেই, ওভারল্যাপ আছে। এই মন্তাজ দৃশ্যে একটা খণ্ডদৃশ্য শেষ হবার পর আরেকটা আসে না, সব একসাথে চলতে থাকে। ফোর গ্রাউণ্ডে বিদ্ধস্ত মেয়েটি হেঁটে যাবার সময় ব্যাকগ্রাউণ্ডের মোটর সাইকেলটা অফ ফোকাসে আবছা হয়ে যায় না, নজর পাবার জন্য নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় নামে সাবজেক্টের সাথে। তার ফলে কেউ আলাদা নজর পায় না, সবকিছুই সকলের নজর এড়িয়ে যায়, তবু ঘটতে থাকে চোখের সামনে। ছেচল্লিশজন কুশীলব একসাথে নিজের নিজের ডায়লগ বলেন। সামান্য দূর থেকে তা শোনায় বাঁশপাতার সমবেত ঝিরিঝিরির মতো। কারো কথা পাঁচকান হয় না। দোকান-পাট চলতে থাকে সাবলীল।

এগারোটা পঞ্চান্নর সময় পুলিশের কালো গাড়িটা ফ্রেম ইন করতেই দু'ঘন্টাব্যাপী মন্তাজ শেষ হয়। তার পনেরো মিনিট পর আসে প্রিজন ভ্যান, জেল কয়েদীদের নিয়ে। দোতলার ঘরে সিভিল-দেওয়ানি শুনানি বোধহয় শুরু হয়ে গেছে একটু আগে। ফৌজদারি মামলার শুনানির জন্য যাঁরা বসে ছিলেন, অভিযুক্তদের জ্ঞাতি-গুষ্টি বা ফরিয়াদিপক্ষ, তাঁরা এবেলা গুটিগুটি করিডোর বেয়ে একতলার এজলাসে বেঞ্চি দখল করতে এগোন। হাউজফুল। বেঞ্চে স্থান সংকুলান হয় না, গাদাগাদি লোক পিছনের দিকে, দরজার মুখ যথাসম্ভব আটক করে। লোকাল ট্রেনের নিত্যযাত্রী অনেকেই, কীভাবে দরজার কাছে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আর কীভাবে গুঁতো মেরে ঢুকতে-বেরোতে হয়, সকলেরই জানা।

একজন প্রৌঢ় রুগ্ন কনস্টেবল সমবয়সী এক লাঠির ভরসায় “অ্যাই অ্যাই কেউ এখানে নয়, সব বাইরে, সব বাইরে” হুঙ্কারে দরজার মুখ থেকে ভিড় খেদাচ্ছে। সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে ঢেউ তাড়ানোর মতো ঈর্ষণীয় সাফল্য তার। সামান্য পিছিয়ে গিয়ে জনতা আবার ফিরে আসছে নিজের পুরনো জায়গায়। তা দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হচ্ছে না অভিজ্ঞ কনস্টেবল। পাঁচ-দশ মিনিট ঠাণ্ডা মাথায় অগ্রাহ্য করছে সবকিছু, তারপর ফের, “অ্যাই, সব বাইরে।“ রিটায়ারমেণ্টের বছর দুয়েক বাকি। দীর্ঘদিন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে এটুকু জানা হয়েছে যে মানুষের বালুচর থেকে ঢেউ সরাতে হয়, ঢেউ চলে যাবে এমন আশা নিয়ে নয়, বরং ওটাই তার একমাত্র কাজ বলে। হয়ত এভাবে এটুকু জানিয়ে দেওয়া হয়, “এখানে ঢুকে পড়েছ বটে, কিন্তু এটা স্থলভূমি, এ আদালত।“ হয়ত। তবে এসব জানানোর সিদ্ধান্ত তার নয়, এ কাজ তার উপর এসে পড়েছে, তাই করতে হচ্ছে, যেমনভাবে মানুষ জীবনের আর পাঁচটা কাজ করে, করতে হয় বলে। খুন, শুনানি, বিচার, সাজা, মিটমাট, সব এভাবেই করে মানুষ।

এই ঢেউয়ে ভেসেই এজলাসে ঢুকেছিল নীল জামা পরা লোকটা। এগারোটা থেকেই উকিল-তাঁবু এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল সে। কোনো টেবিলে কারো সঙ্গে কোনো বিষয়ে কথা বলেনি, একমাত্র চায়ের দোকানে এক কাপ চা আর একটা প্রজাপতি বিস্কুট চাইবার সময় ছাড়া। ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অগোছালো পরিচালকের খামখেয়ালি ক্যামেরার মতো। বলা উচিত, জগতে মানুষ সাধারণত যেভাবে ঘোরে, সেইভাবে। জীবনের অধিকাংশ বিচরণ, এমনকি আলাপপর্ব বা কাজকর্ম যেমন স্রেফ ঘটে যায় বলেই ঘটে, সেভাবেই। তারপর সকলের সঙ্গে কোর্টঘরে প্রবেশ করে সে নিজের মতো আরেকজনকে খুঁজে পায় রোগা কনস্টেবল অথবা তার ক্ষয়জাত প্রৌঢ়ত্বের মধ্যে। এই আরেকটা লোক, যার কোনো লক্ষ্য নেই; কর্ম আছে, কিন্তু ফলের আশা নেই। “অ্যাই অ্যাই” তাড়া খেয়ে বারবার পিছিয়ে যায় নীল জামা, কিন্তু ফিরে এসে একটু একটু করে এগোতে

থাকে আদালতের ভিতরবাগে, পুলিশের দিকে। একটু একটু করে ভালোবেসে ফেলে কনস্টেবলের পোড় খাওয়া আধপোড়া উপস্থিতিকে।

পৌনে একটা নাগাদ যখন বিচারক পুরনো কাঠের রেলিং-ঘেরা ফুটখানেক উঁচু মঞ্চের উপর মস্ত টেবিলের পিছনে লুকনো চেয়ারটিতে এসে বসলেন, ততক্ষণে লোকটা চলে এসেছে অনেক ভেতরে, বসার বেঞ্চগুলোর ঠিক পিছনেই। ওখান থেকে মঞ্চের দৃশ্য ভালো দেখা যাচ্ছিল। যুবক বিচারক, মাঝারি উচ্চতা, সুন্দর করে ছাঁটা চুল, দীর্ঘ জুলফি, গোঁফ-দাড়ি নিখুঁত কামানো, রীতিমতো সুদর্শন। সিনেমায় যেসব বৃদ্ধ গম্ভীর বিচারপতি দেখায়, একেবারেই সেরকম না, বরং মিথ্যা কেসে ফেঁসে কাঠগড়ায় দাঁড়ানো নায়কের সঙ্গে আকৃতিগত সাদৃশ্য বেশি।

রেলিং ঘেরা বিচার-মঞ্চটাকে একটা ফ্রি সাইজ কাঠগড়া মনে হয় লোকটার। সেই ঘেরাটোপে আটকে পড়েছেন একজন সুন্দর জুলফিওয়ালা সুদর্শন যুবক। কে যেন তাঁকে জোর করে গরাদ-ঘেরা টেবিল-চেয়ারে বন্দী করে বলেছে, "এই নে, তুই বিচারক!" অথচ তিনি ওখানে আসার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, ওখানে তাঁর আসার কথাই নয়। তিনি নায়ক, নিদেনপক্ষে নায়কোচিত। তিনি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ষড়যন্ত্রের শিকার হবেন, আঙুল তুলে "ইনসাফ" বলে চিৎকার করে পুলিশ ভ্যানের রক্ষীকে কাত করে অথবা জেলের প্রাচীর ডিঙিয়ে দুরন্ত ছুটে যাবেন পাহাড় পিছনে ফেলে। তারপর অনেক যুদ্ধবিগ্রহ পেরিয়ে শেষ দৃশ্যে, একদম শেষ দৃশ্যে সুন্দরী নায়িকার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে (যে নায়িকা, নিশ্চিত বলা যায়, অসামান্য জুলফিদ্বয়ের প্রেমে পড়েছিল)। সেই তিনি এভাবে ফাঁদে পড়েছেন। এখন তাঁকেই কানুনের বাঁধা গত শোনাতে হবে। একটা বেখাপ্পা মাপের কালো আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে দেবার ফলে কাঠের বেড়া টপকে তিনি পালাতেও পারছেন না। এভাবেই বিচারকদের বন্দী করে ফেলা হয়, আলখাল্লায় মুড়ে। জুন মাসের গরমে এমন একটা পোষাক! কালো তার ওপর! মাথার ওপর একটা পুরনো পাখা ঘুরছে।

বেচারা এতক্ষণে পাহাড়ের সিনে থাকতে পারত ষোলো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে, স্রেফ কাঠগড়া ডিঙোতে পারলে।

খুব মন দিয়ে এবং সস্নেহে যুবক বিচারককে নিরীক্ষণ করে নীল জামা। বিচার প্রক্রিয়া থেকে কিছু পাবার না থাকলেই একমাত্র এত ভালো করে বিচারককে লক্ষ্য করা সম্ভব। অবশ্য সেই বিষয়ে লোকটা কিছু ভাবে না, সে দেখে। দ্রষ্টা হিসেবে প্রতিটি মুহূর্তে সম্পৃক্ত থাকার সুযোগ সে নষ্ট করে না। ক্রমশ বিচারকের প্রতি তার সহানুভূতি জন্মায়, স্নেহও। আদালতে দাঁড়িয়ে বিচারকের প্রতি আর কারো সহানুভূতি বা স্নেহ জন্মেছে কি? কেন জন্মায় না? কে আটকে দেয় স্নেহকে? কাঠগড়া? কালো শামলা?

মঞ্চের ওপর বিচারকের চেয়ারের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছে আরেক পুলিশ। স্বাস্থ্যবান, যৌবন ছেড়ে যায়নি এবং গোঁফজোড়ায় প্রবল পৌরুষ। সে রোল কল শুরু করেছিল। অনেকগুলো কেস আছে আজ। কেসের নাম্বার ধরে ডাকা হচ্ছিল চিৎকার করে। মাঝে মাঝে দু-একটা নামের উল্লেখ। এক-একটা মামলার ডাক পড়লে কিছু লোক, সম্ভবত সেই কেসের সঙ্গে জড়িত, হুড়মুড়িয়ে পিছন দিক থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের সামান্য হাঁ হয়ে থাকা মুখ আর হাঁটার তীব্রতা দেখে মনে হয় তারা পুরো প্রক্রিয়াটার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত এবং কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অভিযুক্ত মানুষটিকে বাঁচাতে, ফিরে পেতে আগ্রহী। একটা মানুষকে মুক্ত করতে, বাড়ি নিয়ে যেতে আরো কিছু মানুষ উদ্গ্রীব, যাদের অনেকেরই আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, বাড়িতে জায়গা কম এবং একজন মানুষ কম থাকলে গ্রীষ্মের রাতে হাত-পা মেলে শুতে সুবিধা। এই অযৌক্তিক অথচ স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপারটা দেখে লোকটার হাসি পেল না, বরং ভালোই লাগল খানিকটা। পরপর কয়েকটা দলের আসা-যাওয়া দেখল সে। বেশিরভাগ সময় তারা সামনে অব্দি পৌঁছনোর আগেই কেস সংক্রান্ত কোর্টের কর্মকাণ্ড শেষ। কোনো আইনজীবী উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলে না, শুনানির বালাই নেই। রোল কল করেই সেই পুলিশ বিচারকের দিকে কিছু কাগজ বাড়িয়ে দিচ্ছে, তাতে দস্তখত হচ্ছে।

বছর তিনেক আগে লাটুগড় গ্রামীণ হাসপাতালের আউটডোরে যেতে হয়েছিল, মনে পড়ে লোকটার। একজন ডাক্তার, আড়াইশ' রুগী। অতিমানবিক দ্রুততায় ওষুধ লিখে দিচ্ছিল গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলানো এক বেঁটেখাটো ব্যক্তি, যার মধ্যে একমাত্র লক্ষণীয় বস্তু ছিল ঠিক মাথার মাঝখানে চারিদিক ঘেরা গোলাকৃতি টাক, যা নির্মাণের নিপুণতায় অতুলনীয়। ওরকম জায়গায় ইন্দ্রলুপ্ত অনেকেরই থাকে, কিন্তু অমন সুগোল আর নিখুঁতভাবে ঘেরা হয় না। তার মাথার উপরটা কেউ দেখছে বা দেখতে পারে, সেই বিষয়ে একেবারেই সচেতন না থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে একের পর এক প্রেস্ক্রিপশন লিখছিল ডাক্তার। স্টেথো গলাতেই ঝুলছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রুগীকে ছুঁয়ে দেখার তেমন প্রয়োজন হচ্ছিল না। সব কথা শোনারও প্রয়োজন হচ্ছিল কিনা বলা মুশকিল। লাইনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল ডাক্তার নির্ঘাত পিশাচসিদ্ধ, আগে থেকে সব জানে। নইলে পারে কী করে এত দ্রুত? বর্তমান আদালতের বিচারপ্রক্রিয়া ক্ষিপ্রতায় সেই ডাক্তারকে পরাস্ত করছে অনায়াসে। দেখে লোকটার মনে হল, সেদিন আরেকটু দাঁড়িয়ে থেকে সাহস করে ওষুধটা নিলেই হত। আদালত আর চিকিৎসকের ওপর ভরসা রাখা উচিত।

দু-একটা মামলায় একটু সময় লাগছে। পাতা উল্টে দেখার প্রয়োজন হচ্ছে। সেই অবসরে পরিজনেরা পৌঁছে যাচ্ছে সামনের দিকে। এমনকি তারা শুনতেও পাচ্ছে বিচারক কী বলছেন, যা এত দূর থেকে শুনতে পায় না নীল শার্ট। দু' বার সামনের বেঞ্চ থেকে জনা দুয়েক কালো কোটকে উঠে দাঁড়াতে দেখা গেল। কিছু বক্তব্য ছিল নিশ্চয়, তা শোনা গেল না। কার জামিন হল, কার পিসি, কার জেসি, সব বোঝা গেল না, কিন্তু মানুষের উদবেগ যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক মনে হল লোকটার। শুধু এই দ্রুত ছুটে আসা আর মাথা নেড়ে গুনগুনিয়ে ফিরে যাওয়া দেখতে, একজনের জন্য এতজনের দাঁড়িয়ে থাকা দেখতেই আদালতে আসা যায়। একেকটা দল এলেই কাঠগড়ায় ভাগ্যবান আসামীটিকে খোঁজে নীল শার্ট, কিন্তু কাঠগড়াটা কই?

বিচারমঞ্চের পাশে যেখানে কাঠগড়া থাকার কথা, সেখানে তেমন কিছুই নেই। এই হলঘরের এক পাশে দেওয়ালের বদলে একটা বিরাট লোহার গরাদ। তার ওপাশে একফালি ঘর বা করিডোর, খাঁচা বললেও হয়। সেখানে পাশাপাশি কুড়ি-বাইশজন আসামীকে দাঁড় করানো আছে। কে কোন কেসে অভিযুক্ত, তা বোঝার বিশেষ উপায় নেই। একদিক থেকে ভালো। বিচারক যদি আলাদাভাবে আসামীর মুখ দেখতে না পান, তার মুখের রেখাগুলো, যা নমনীয় অথবা নিষ্ঠুর, তাহলে সেসবের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হবেন না, শুদ্ধ যুক্তি আর প্রমাণাদির ভিত্তিতে বিচার করতে পারবেন, মানে মিনিটখানেকের মধ্যে যতটা সম্ভব। সে বেশ ভালো কথা।

খাঁচার লোকগুলোকে দেখে সে মন দিয়ে। সে একা নয়, আরো অনেকে দেখছিল।

"ওই দেখ, কালু শেখ, গ্রিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে দেখেছিস? সিরাজপুরের ডাকাতির কেসে ধরা পড়েছে।" পিছন থেকে একজন বলে।

"ও তো বুড়ো একটা," বিস্ময় প্রকাশ করে পাশের সবুজ চেক জামা গায়ে ছোকরা।

"দেখতে ওরম। হেব্বি ডেঞ্জার ডাকাত।"

নীল শার্ট খাঁচা খুঁজে বুঝতে পারে কাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ষাটের ওপরেই বয়স হবে লোকটার। মাথার সব চুল সাদা, দিন দুয়েক দাড়ি কামানো হয়নি। ক্লান্ত দেখতে, হয়ত অসুস্থ, কিন্তু চোখদুটো উজ্জ্বল এবং দাঁড়িয়ে আছে সোজা। সর্দার গোছের ডাকাত হলেও হতে পারে। এমনিতে পাড়ায় দেখলে মাস্টারমশাই মনে হত, কিন্তু ডাকাত বলে জানার পর বোঝা যাচ্ছে ডাকাত হওয়া সম্ভব, তা সে যতই বৃদ্ধ বা অসুস্থ হোক।

"এই বয়সে ডাকাতি করতে পারছে? দারুণ তো! এরা আসলে ব্যয়াম করে নিয়মিত।" এতক্ষণে কথা বলে নীল জামা।

“আরে না, উনি ডাকাত নন,” সামনের ঝোলা ব্যাগ কাঁধে লোকটি ঘাড় ফিরিয়ে বলে।

“আপনি কী করে জানলেন?”

“আমরা তো ওনার জন্যেই এসচি। দেবীপুকুর দীঘিরক্ষা কমিটির লোক আমরা। উনি চেয়ারম্যান।“

“ও! তাহলে হাজতে কেন?”

“আন্দোলন থামানোর জন্য অ্যারেস্ট করেছে। উনি স্পটেই ছিলেন না।“

“তাহলে জামিন হয়ে যাবে তো আজই।“

“তা হবে না দাদা। ডাকাত হলে হয়ে যেত।“

আরেকবার বুড়ো লোকটিকে দেখে নীল জামা। নাহ, মাস্টারমশাই বলেই মনে হচ্ছে। ডাকাত হতেই পারে না। তারপর ফের বিচারককে দেখে। তরুণ বিচারপতি, ঝকঝকে কালো কোট এবং সুদৃশ্য জুলফি। এমন মানুষ একজন বৃদ্ধ মাস্টারমশাইকে জামিন দেবেন না? হয়ত ওই গুঁফো পুলিশটার ভয়ে নিজের ইচ্ছেমতো রায় দিতে পারছে না বাচ্চা ছেলেটা। কাঠগড়া আর কালো শামলায় বাঁধা পড়ে কাতরাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। একবার ওখান থেকে বেরিয়ে কোট খুলে আসামী হয়ে দাঁড়াতে দিলেই “ইনসাফ” বলে সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মাস্টারের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিত সে, আর সাথে সাথে ভেঙে যেত খাঁচার গরাদ। আদালতের সেটটা আসলে ঠিকমতো সাজানো হয়নি, ভুল লোককে ভুল রোল দিয়ে প্রতিভার অপচয় করেছে! ডিরেক্টর কে? এত অমনোযোগী কেন?

এইসব দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক লোকটি চলমান মানুষের ধাক্কায় এগোতে পিছোতে থাকে। বিশেষ বিচলিত বোধ করে না অবশ্য, সারাজীবন সে এভাবেই দুলেছে অন্যের চলনের তালে। সে একাই নয়, অনেকেই, সবাই সম্ভবত। মানুষের অবস্থা আর

অবস্থান, কোনোটাই তার ইচ্ছাধীন নয়, ঘটনাচক্রের অংশ। এক এক ঝাঁক মানুষ ছুটে সামনের দিকে গেলে খানিক ডাইনে সরে যায়, আর বিপরীতমুখী স্রোতের ঠেলায় পিছোয়। এইভাবে নড়তে নড়তে একসময় একটা তিনদিকে রেলিং ঘেরা ছোট পাটাতনের পাশে পৌঁছয় সে। জায়গাটা ফাঁকা আছে দেখে সেখানে উঠে রেলিং ধরে দাঁড়ায়। এখান থেকে অনেক ভালভাবে আর নিশ্চিন্তে বিচারপ্রক্রিয়া দেখার সুযোগ পায় সে। দেখতে থাকে।

চারটে দশ নাগাদ কোর্টের কাজ শেষ হয়। বসার জায়গাগুলো এতক্ষণে ফাঁকা। কাজ মিটতে সবাই চলে গেছে নিজের স্বার্থ বগলদাবা করে। আদালতের প্রতি কারো কোনো আকর্ষণ নেই, সহানুভূতি নেই বিদ্রোহী নায়ক হতে না পারা তরুণ বিচারকের প্রতি। নিজের প্রয়োজনটুকু মিটলে বা মিটবে না জানতে পারলেই সবাই চলে যায় এই কক্ষ আর বন্দী ন্যায়াধীশকে পিছনে ফেলে। লোহার গরাদের ওপাশ থেকে আসামীদের সরিয়ে নিয়ে গেছে পুলিশ। বিচারক স্বয়ং উঠে যাচ্ছেন। গাত্রোত্থানের মুহূর্তে এজলাসের পিছনদিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললেন, "ও কে? ওখানে কী করে? কত নম্বর?" রোল কল করা পুলিশও অবাক চোখে তাকায়। হলঘরের পিছন দিকে, শেষ বেঞ্চের থেকে কিছুটা ব্যবধানে রাখা ছিল আসামীর কাঠগড়া। সময়ের অভাবে আজকাল আসামীদের এক এক করে তোলা সম্ভব হয় না সেখানে। পড়েই থাকে অব্যবহৃত, প্রায় পরিত্যক্ত বলা চলে। আজ সেখানে, নিশ্চয় বিচারের প্রতীক্ষায়, দাঁড়িয়ে এক আসামী। গায়ে নীল শার্ট, উচ্চতা সাড়ে পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি, বয়স পঁতাল্লিশ-পঞ্চাশ, মাথায় চুল একটু কম, দাড়ি-গোঁফ কামিয়েছে সম্ভবত গতকাল। নাম কী? কত নম্বর কেস?

কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা গেল কোনো কেস বাকি পড়ে নেই। লোকটার কথা থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বা সন্দেহজনক কিছু জানা গেল না। তাতে সমস্যা আরো জটিল হয়ে উঠল। আসামী যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে যখন। অথচ নথিতে কিছু নেই। তার মানে অপরাধ সম্ভবত এতটাই জটিল

বা প্রচ্ছন্ন, যে চার্জশিট তৈরি তো দূর, নথিভুক্তিই সম্ভব হয়নি। লোকটি নিজেও তার অপরাধ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনো সূত্র দিতে পারছে না, আসলে দিচ্ছে না। এ তো আদালত এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্রোহ একধরণের। কোন থানায় ছিল? দেখা গেল থানা বা জেলের রেজিস্টারে নামই নেই। কোথাও ছিল না লোকটা। তাহলে ছিল কোথায়? এল কোথা থেকে? গ্রেপ্তারি এড়িয়ে সোজা এসে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে! এ তো পুলিশ-প্রশাসন তথা আইন ব্যবস্থাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া। আদালতে পেশ হবার একটা পদ্ধতি আছে, সেসব অগ্রাহ্য করে যে কোনো অপরাধী নিজের ইচ্ছেমতো কাঠগড়ায় উঠে পড়লে তো অপরাধ ব্যবস্থার ওপর প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণই থাকবে না।

এসব প্রবণতা বাড়তে দেওয়া যায় না। স্থির হল, কাঠগড়ায় উঠে পড়ার আগেই লোকটাকে গ্রেপ্তার করতে না পারার ভুল শুধরে "বেটার লেট দ্যান নেভার" পদ্ধতিতে এখন আটক করা হবে। লোকটা শুরুতে আপত্তি করেছিল। গোঁফওয়ালা রোল-কল পুলিশ দাবড়ে দেবার পরেও প্রশ্ন তুলছিল। তখন বিচারক, যাঁর বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল, হাত তুলে পুলিশকে থামিয়ে নিজে সরাসরি নীল জামা আসামীর সঙ্গে কথা বললেন। লোকটা অবাক হয়ে দেখল, প্রায় ছ' ফুট লম্বা খাকি উর্দি পরা পুলিশ অত পুরুষ্টু গোঁফ থাকা সত্ত্বেও অল্প বয়সী ছেলেটার ইঙ্গিতেই থেমে গেল, শুধু তার ঠোঁট নয়, তার পুরুষালি গোঁফের নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে গেল "হ্যাঁ স্যার" শব্দদুটি বলা শেষ হওয়া মাত্র। স্নেহভাজন তরুণ বিচারপতির এহেন অনায়াস জয়ে সে তৃপ্ত ও গর্বিত বোধ করল। তখনই মনে মনে ঠিক করল, এরপর যা হবে, তাই মেনে নেবে।

সাড়ে তিন ঘণ্টায় গুটি পঞ্চাশ শুনানি শেষ করতে গিয়ে বিচারক এতক্ষণ তাড়াহুড়ো করছিলেন ঠিকই, কিন্তু আদতে তিনি ধীরস্থির ভদ্রলোক। প্রায় আড়াই মিনিট সময় ধরে যত্ন নিয়ে বোঝালেন, কেন এই পরিস্থিতিতে আসামীর, অর্থাৎ অভিযুক্তের, মানে এক্ষেত্রে অনভিযুক্তের, গ্রেপ্তার হওয়া আবশ্যক। আইন বা বিচারব্যবস্থা কোনো এলোমেলো অগোছালো সিস্টেম নয়,

ব্যক্তিগত আবেগ বা আপত্তি মেনে এমন একটা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা চলতে পারে না। ন্যায় বিচার দাঁড়িয়ে থাকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আর তথ্য-প্রমাণের উপর। বাই ডেফিনিশন, ওটা আসামীর কাঠগড়া। অতএব ওখানে যে দাঁড়ায়, সেই আসামী। এটুকু ধরে নিতে না পারলে বিচারের অনুষ্ঠানটাই করা যায় না। তা না হলে হয়ত আসামী নিজেকে উকিল বা বিচারক বলে দাবি করবে, আর কালো কোট পরা কেউ হয়ে যাবে অভিযুক্ত। এই ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা এড়ানোর জন্য ডেফিনিশন ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রত্যেক নাগরিকের উচিত বিচারের পদ্ধতিগুলোকে মেনে নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। আপাতত উদ্দিষ্ট নীল জামা অনভিযুক্ত শ্রীযুক্ত অমুককে অনুরোধ করা হচ্ছে সহযোগিতার সেই হাত পুলিশের দিকে বাড়িয়ে দেবার জন্য, যাতে তারা বিনা বলপ্রয়োগে সেই হাতে হাতকড়া পরাতে পারে। আসামীর কী অপরাধ, তা হয়ত সে নিজেও জানে না, বিচারকও জানেন না। সেটা খুঁজে বের করা এবং প্রমাণ করার দায়িত্ব পুলিশের। এ বিষয়ে পুলিশ বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং দক্ষ, সুতরাং তাদের ওপর ভরসা না করার কোনো কারণ নেই। তার মানে এই নয় যে আসামীর শাস্তি হবেই। আদালত সব অভিযুক্তকে ন্যায় বিচারের আশ্বাস দেয়। বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হলে বেকসুর খালাস হবে। এমনকি পুলিশ যদি তার অপরাধ প্রমাণে অকাট্য যুক্তি দেখাতে না পারে, তাহলেও বেনিফিট অব ডাউটে তাকে এলবিডাব্লিউ দেওয়া হবে না। তবে তার আগে আদালতকে জানতে হবে কত নম্বর ধারায়, কোন অপরাধে তাকে শাস্তি বা মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই অপরাধটা খুঁজে বের করার জন্য আপাতত পুলিশের সাথে সহযোগিতা করাই একমাত্র পথ, এটা তার ভালোর জন্যই।

বিচারক খুব সুন্দর বলেন। নীল জামা আরো মন দিয়ে দেখছিল, কথা বলার সময় তাঁর ডান হাত বিভিন্ন মুদ্রায় আন্দোলিত হয়, কিন্তু জুলফিদ্বয় সামান্যও নড়ে না। মনে পড়ে গেল, অমিতাভ বচ্চন যখন ভিলেনের পিছনে দৌড়তেন, হয়ত কাটারি হাতে,

তখন চুল উড়ত না। কথাটা মনে পড়তেই মন ভালো হয়ে গেল। বিচারক এখন বসে নেই, দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। আদালত ছেড়ে বেরিয়ে যাবার অভিপ্রায়ে রওনা হয়েছিলেন, এখন তাঁর নিজস্ব মঞ্চ বা বিচারকের কাঠগড়ার একদম ডানদিকের কোণায় তিনি দাঁড়িয়ে। অনেক বেশি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাঁকে। গায়ের কালো আলখাল্লাটা খুলে ফেলায় অনেক বেশি মুক্ত লাগছে তাঁকে। ওখানে দাঁড়িয়ে যেন তিনি আঙুল উঁচিয়ে বলছেন "ইনসাফ"! এতক্ষণে চরিত্রটি পূর্ণতা পেয়েছে যেন। এমন সুদর্শন যুবকের ডায়লগ শুট করার সময় ফ্রেম যেমন হওয়া উচিত, প্রায় নিখুঁত। তিনি এখন নায়ক, তাঁর কথায় কোনো ভুল থাকতে পারে না। পুলিশের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় লোকটা।

থানায় সে এসে পড়ে সুবীর বসাকের জিম্মায়। নানাভাবে জেরা করেও কোনো কাজের কথা জানা যায় না লোকটার কাছ থেকে। সব প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছে, তবু কোনো জরুরি তথ্য জানা যাচ্ছে না। এই অভিজ্ঞতা দুঁদে পুলিশ অফিসারের কাছেও বিচিত্র। অপরাধী হয় চুপ করে থাকবে, নয় মিথ্যে বলার চেষ্টা করবে, যেটা খানিক বোঝা যাবে, অথবা সত্যি কথা ফাঁস করবে। এ তো কোনোটাই করে না। একমাত্র ভুল করে ধরে আনা লোকেদের ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, একদম আদালতের কাঠগড়া থেকে একে আনা হয়েছে। থানা হয়ে আদালত যাবার বদলে আদালত হয়ে থানায় আসার এই বিপরীত সিকোয়েন্সটাও যে বসাকদের কিছুটা সমস্যায় ফেলেনি, তা নয়, তবে সে খুব বড় সমস্যা নয়। পুলিশের চোখে হাজতে রাত কাটাতে আসা মানুষমাত্রেই অতিথি, তাদের আসার কোনো নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বা কারণ থাকে না। বৈশাখী বাতাস হঠাৎ মাতাল হয়ে যেমন করে বাড়ির বারান্দায় এনে ফেলে শুকনো পাতা, তেমনি করে ঘুর্ণি ওঠে পাড়ায়-পাড়ায়,হাটে-বাজারে, আর কুটোর মতো উড়িয়ে আনে মানুষ।

উড়ে আসা মানুষের কাছ থেকে হাজতবাসের উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহ করায় সুনাম আছে বসাকের, কিন্তু মাঝে মাঝে তার

মতো অভিজ্ঞ নাবিকও থৈ পায় না। অথচ সে সারেঙ, হাল ছাড়তে পারে না। দো বাঁও ... তিন বাঁও মেলে না, তবু তাকে জল কেটে এগোতে হয়। মাঝে মাঝে নৌকো কথা শোনে না, নদীকে অচেনা লাগে। সারেঙ তখন রেগে যায়, বৈঠা ছুঁড়ে মারে। লোকে বলে পুলিশ অত্যাচার করে, তারা বোঝে না বসাকের অসহায়তা। এই থানা তার কাঠগড়া, এই উর্দি তার শেকল। এই চাকরি তাকে করতে হয়। প্রমোশনের চেষ্টা করতে হয়, অন্যের কথা শুনতে হয়, হাত পেতে টাকা নিতে হয়, হাত উপুড় করে দিতেও হয়। সবই ঘটনাচক্র, যেভাবে আরো অজস্র মানুষের দ্বারা অজস্র ভালো ও মন্দ কাজ হতে থাকে। আপাতভাবে অনেকেই অনেক কাজ স্বেচ্ছায় করে, কেউ তাদের জোর করে না, কিন্তু সেটাই চরম সত্যি নয়। রমেনের হোটেলে ভাত খাওয়ার মতো একটা কাজও স্রেফ নিজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না, খিদের তাড়না ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে। না, ব্যাপারটা অতটাও সোজা নয়। রোজ একইসময়ে একইরকম খিদেও পায় না, তবু খেতে হয়, কারণ সেটা খাবার সময়, সেই সময়ে খাওয়াটাই নিয়ম। হয়ত খিদের অমোঘ নিত্যতা সম্বন্ধে এক পূর্বধারণা রমেনের দোকানের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায় দুপুর দুটো নাগাদ। দূরনিয়ন্ত্রিত সেইসব চলমান খাদ্যান্বেষীকে দেখলে কিন্তু মনে হয় স্বয়ংক্রিয়। বসাকও তেমনি। কয়েদীদের জেরা করে, কারণ সেটাই করার কথা। ঘুষ নেয়, উপরওয়ালা এলে উঠে দাঁড়ায়, প্রমোদ মেহতাকে চেয়ার এগিয়ে দেয়, তারক সূত্রধরের এফ আই আর নিতে চায় না, সন্তুকে দেখলেই থাবড়ায়, কারণ এসব করতে হয় বলেই সে জেনে এসেছে। আপাত দৃষ্টিতে খাকি উর্দির লোকটাকে স্বয়ংচালিত এমনকি স্বয়ংশাসিত মনে হতেই পারে। এই মনে হওয়ার কথা বসাকও জানে এবং এজন্য কাউকে দোষ দেয় না, কারণ যে তাকে পাষণ্ড ভাবছে, সে বেচারার দৃষ্টি আর ভাবনাও তেমনিভাবে ফেঁসে গেছে অভ্যাসের চক্করে, যেমনভাবে বসাক আটকে গেছে এই আঁটোসাঁটো উর্দিতে।

মাঝেমাঝে তবু থৈ পায় না বসাক। এমনকি অভ্যাস তাকে

রক্ষা করতে পারে না। তখন সে অসহায় বোধ করে। তখন তার রাগ হয়...নিজের ওপর, ডিএসপির ওপর, ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের ওপর, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চায়ের ওপর, মেহতার দেওয়া নতুন কাপের ওপর, পুরনো সিলিং ফ্যানের ওপর, দুপুর থেকে থমকে থাকা বাতাসের ওপর। এদের কারো ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না। বিস্ফোরণে উর্দি ছিঁড়ে ছাতি বেরিয়ে আসা আটকানোর মরিয়া চেষ্টায় তখন সে ভেতরে জমে ওঠা বাষ্পের উত্তাপ তার শরীরেই ঢেলে দেয়, একমাত্র যাকে দগ্ধ করা যায় বলে সে জেনে এসেছে। আসলে এ তার আত্মরক্ষার চেষ্টা মাত্র, নিজের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা, নইলে লোকটাকে সে একবারে এতগুলো লাথি মারত না।

লোকটার কথাবার্তা ভারি আজগুবি।

- আদালতে কী করছিলেন?

- ঘুরতে ঘুরতে চলে গিয়েছিলাম ওদিকে। গিয়ে দেখি খুবই ইন্টারেস্টিং জায়গা। তাই দেখছিলাম।

এরপর সে তার আদালত ভ্রমণ আর বিচার দর্শনের বিবরণ দেয়। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়, অথচ লোকটা পাগল নয় সে বিষয়ে বসাক নিঃসন্দেহ।

-বেশ, মানলাম আপনি দেখতেই গেছিলেন। দর্শকদের জন্য তো বসার জায়গা আছে, দাঁড়ানোর জায়গা আছে। সেসব ফেলে কাঠগড়ায় কী করছিলেন?

-উঠে পড়েছিলাম। তারপর দেখলাম, ওখান থেকেই দেখতে সুবিধে হচ্ছে। আহা, কি সুন্দর জজসাহেব!

-উঠে পড়লেন কী করে? কেন উঠে পড়লেন ওখানে?

-আনসার্টেইনটি প্রিন্সিপল মতে শুনবেন, না কেওস থিওরি?

-মানে?

-মানে হল, একজন মানুষ কখন কোথায় অবস্থান করবে এবং কোনদিকে কত গতিবেগে ধাবিত বা বিচ্যুত হবে, তা নির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। একে বলে আনসার্টেইনটি প্রিন্সিপল। আর মানুষটির অবস্থান বা বিচ্যুতি তার একার ওপর নির্ভরও করে না, যদিও তার আপাত বিশৃঙ্খল গতিবিধি একেবারে দুর্বোধ্য নয়। আদালতে অন্য লোকেদের নড়াচড়া থেকে শুরু করে ব্রাজিলে প্রজাপতির ডানা নাড়া, অনেককিছুর প্রভাবেই কোনো সাদামাটা ভদ্রলোক কাঠগড়ায় বা কয়েদঘরে পৌঁছতে পারে। বুঝতে পারলেন? একে বলে কেওস থিওরি। অঙ্কের ব্যাপার। এটা আসলে...

এই অব্দি শুনে লোকটার গালে প্রথম থাপ্পড়টা মেরেছিল বসাক। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, লোকটা পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। পাকা ক্রিমিনাল তার মানে। অগত্যা “আপনি” ছেড়ে তুই-তোকারিতে নেমে আসতে হয়। তাতেও কাজ হয় না। দুই বগলের তলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয় রাত্রিবেলা। থাক শালা সারারাত। সকালে যখন নামানো হল, হাত নাড়তে পারে না আর। তবু মুখে হাসি। লোকটার সবচেয়ে মারাত্মক দোষ এই হাসি। পুলিশকে ভয় পায় না! সন্ত্রাসবাদী নয় তো? ডিএসপি সাহেব এসপির সঙ্গে কথা বলে আজ সকালেই জানিয়েছেন, লোকটাকে ইউএপিএ দিতে হবে। তাতে করে নিম্ন আদালতে জামিন হওয়া আটকানো যাবে আর তদন্তের জন্য অনেকটা সময় পাওয়া যাবে। সাহেব তো বলেই খালাস। ইউএপিএ দিতে গেলেও তো কেসটা সাজাতে হবে, অথচ এতক্ষণেও তো কিছুই বোঝা গেল না। আর জামিন হবেই বা কী করে, দেবেই বা কে? কেউ খোঁজ নিতেও আসেনি, লোকটাও কারো নাম ঠিকানা দিতে পারেনি। এমন হয় নাকি? একটা মানুষের কেউ নেই? একেবারে কেউ নেই? যাদের সংসার থাকে না, তাদের পার্টি থাকে, ইউনিয়ন থাকে। এ কোন পার্টির লোক তবে? কেউ তো ছাড়াতে এল না কোনো পার্টি থেকেও! সাধু-সন্ন্যাসীও নয়, দিব্যি প্যান্ট-শার্ট পরে ঘুরছে। কে তবে? গুপ্তচর? কোন দেশের? কোন সংগঠনের?

সকালবেলা দড়ি খুলে নামিয়ে লোকটাকে চেয়ারে বসায় বসাক। একটু মায়া হল। এক কাপ চা এগিয়ে দিল, আবার একটু নরম করে শুরু করা যাক। হাত তুলে কাপ ধরতে পারল না লোকটা। হবারই কথা, সারারাত চাপ পড়ে দুই হাতের সব স্নায়ু অবশ হয়ে গেছে। বসাক চায়ের কাপ তুলে তার ঠোঁটের কাছে ধরল।

-থ্যংক ইউ।

-হাতদুটো নড়ছে না, তাই না? ব্যথা হচ্ছে? অকারণে ঝুললেন সারারাত। কেন খামোখা কথা লুকোচ্ছেন?

-আপনি খুব ক্লান্ত, তাই না? আমার মতো আপনারও ভালো ঘুম হয়নি কাল রাতে। তাই না?

-ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার দলের নামটা বলুন।

-আপনার গোঁফটা ভারি সুন্দর, জানেন? বাঁদিকের কোণাটা আরেকটু ছাঁটতে হত। সকালে তাড়াহুড়োয় বোধহয়...

আর থাকতে না পেরে লোকটার মুখে অবশিষ্ট চা ছিটিয়ে দেয় বসাক। চেয়ার সমেত ঠেলে ফেলে মাটিতে। তারপর লাথি। তারপর আরো লাথি। একসময় প্রশ্ন করা বন্ধ হয়ে যায়, মার চলতে থাকে। গত পুজোয় ছেলেকে একটা চাবি দেওয়া ড্রাম বাদক কিনে দিয়েছিল বসাক। চাবি ঘুরিয়ে দিলেই দমাদম দমাদম, যতক্ষণ না দম ফুরোয়। তেমনি অটোম্যাটিক পুতুল হয়ে ওঠে বসাক।

বিস্বাদ চায়ের কাপ ঠক করে নামিয়ে রেখে চেয়ারে বসে আঙুল মটকাতে গিয়ে বসাকের হঠাৎ মনে হয়, এই বিটকেল লোকটা তাকে নিদারুণভাবে হারিয়ে দিল, আর সেই পরাজয় সহ্য করতে না পেরেই এত হিংস্র হয়ে উঠল সে। শুধু যে বিচিত্র এক কেসের মুখে দাঁড় করিয়ে ডিপার্টমেন্টকে সমূহ বিপত্তিতে ফেলেছে লোকটা, তাই নয়, বসাকের এক দুর্বল তন্ত্রী ছুঁয়ে ফেলেছে সে। সেখানে

সূচীপত্র

ছুঁতেই ঝঙ্কার! মানুষের ভয়-সম্ভ্রম পেতে অভ্যস্ত বসাক, এমনকি ঘৃণাও। এগুলো চেনা প্রতিক্রিয়া, প্রত্যাশিত। ঘেন্না নিয়েও তাই সমস্যা হয় না আজকাল। এই লোকটা সেই চেনা পথে হাঁটল না। গালি খেয়ে, মার খেয়েও তার মুখে হাসি, অথচ সে উন্মাদ নয়! সারাররাত ঝুলে থেকে হাত নাড়তে না পারা লোকটা বসাকের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল, যেন করুণায় গলে যাবে এখনই। পুলিশকে এভাবে কোনো কয়েদী কখনো জিজ্ঞেস করেনি সে ক্লান্ত কিনা, রাতে ঘুমিয়েছে কিনা। ভাগ্যিস করেনি, ভাগ্যিস জিজ্ঞেস করে না কেউ! নইলে সব গুলিয়ে যেত এতদিনে। তখন হয়ত লক আপের ছাদ চুঁইয়ে ঝরে পড়ত সেই ছোটবেলার স্কুলের পাশের ছাতিম ফুল-ধোয়া শিশির। কেস সাজানোয় গোলমাল হয়ে যেত। প্রমোশন হত না, ট্রান্সফার হয়ে যেত প্রত্যন্ত এলাকায়। স্কুল বদলাতে বদলাতে মল্লিকবাবুর মেয়ের মতো গম্ভীর, নির্বান্ধব হয়ে যেত সুবীর বসাকের ছেলেটা। সর্বনাশ হয়ে যেত। ভাগ্যিস কেউ পুলিশের চোখের দিকে ওভাবে তাকায় না!

কি নির্ভুল সত্যি বলেছিল লোকটা! কাল সারারাত বসাকের ঘুম হয়নি। উথালপাতাল ভেবেছে সে, শুধু এই কেস নিয়ে নয়, শুধু এই লোকটাকে নিয়ে নয়, জীবনের এলোমেলো খুঁটিনাটি নিয়ে। নিরাপদবাবুর কথা মনে পড়ছিল, বাঙলা পড়াতেন। কলেজের সেই মেয়েটির কথা, সুমিত্রা। বছর পাঁচেক আগে বউকে নিয়ে উদয়গিরি-খণ্ডগিরি গিয়েছিল, সেইসব কথা... কতগুলো বাঁদর বসে ছিল পথের পাশে। তাদের তৃপ্ত করার জন্য ছোলা আর ভয় দেখানোর জন্য লাঠি, এই দুইয়ের ভরসাতেই পাহাড় চড়া। একেবারে প্রশাসন চালানোর মতো কায়দা সেখানেও। মানুষ আসলে বাঁদর থেকেই তো এসেছে, কত আর তফাৎ হবে? এসব ভাবতে ভাবতে রাত পেরিয়ে গেছে। সকালে তাড়াহুড়ো করে অফিসে এসেছে, তার আগে ডিএসপির ফোন।

থানায় এসেই আবার সেই লোকটা, তার অসহায় ঝুলে থাকা আর মায়াবী চোখ। সেই চোখ আর হাসির মুখোমুখি হয়ে আতঙ্কিত বোধ করেছে বসাক। তার আন্তরিকতাকে মিথ্যে প্রমাণ করতে

না পেরে বিধ্বস্ত বোধ করেছে। পুলিশের ঢাল ভেঙে গেলে, খাকি ছিঁড়ে গেলে পড়ে থাকে গেঞ্জি পরা বুক। নিজেকে সহসা অসম্ভব দুর্বল মনে হয় বসাকের। তার বিপন্ন প্রতিষ্ঠা আর ভরসা রাখতে পারে না সুপুষ্ট গোঁফের ওপরেও, বিশেষত সেই গোঁফ যখন কয়েদীর কাছ থেকে সপ্রশ্রয় প্রশংসা পেয়ে নিজের ভয় জাগানো পৌরুষ অনেকাংশে খুইয়ে বসে আছে। এইরকম পরিস্থিতিতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া আহত বেড়ালের মতো লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বসাক। হেরে গেল, হেরে গেল!

না, এবার জানতেই হবে কে এই মানুষটা? কেন সে এমন ওলটপালট করে দিচ্ছে আদালত আর থানার সব হিসেব? কী প্রমাণ করতে চায় সে? লোকটা চোর-ডাকাত নয়, গুপ্তচর নয়, সন্ত্রাসী নয়, দলীয় ক্যাডার নয়, এতক্ষণে বুঝে গেছে বসাক। লোকটা এই সবকিছুর থেকে ভয়ঙ্কর। প্রহেলিকার মতো, প্রশ্নচিহ্নের মতো সবাইকে বিব্রত করতে চাইছে সে, হারিয়ে দিতে চাইছে একা এতজনকে। কেন?

আবার লক আপের দরজা খুলে ঢোকে বসাক। লোকটা তেমনি শুয়ে আছে। বসাককে দেখেও নড়ে না, হাসে না? শালা, হাসছে না কেন? বসাক ঝুঁকে তার গলার কাছে নাড়ির গতি পরীক্ষা করতে চেষ্টা করে। খুঁজে না পেয়ে লোকটার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায় বসাক এবং ছিটকে সরে আসে। যেখানে লোকটা শেষবার নিঃশ্বাস ফেলেছিল, সেই বাতাসে ছাতিম ফুলের গন্ধ! ধাঁ করে মনে পড়ে যায় নিরাপদবাবুর কথা। "শান্তিনিকেতনেও আমাদের স্কুলের মতো ছাতিমতলা আছে, জানিস? সেই গাছের নিচে বসেই দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করেন..."

খানিক বড় হয়েও বসাক বাঙলা সাহিত্য পড়ছিল, কবি হবার স্বপ্ন দেখত বাবা মারা যাবার আগে। সুমিত্রা জানত ছাতিম গন্ধের কথা, মালবিকা জানে না। সে ওসির বউ।

আর্য

রুখসানা কাজল

অবিশ্বাসী মন নিয়ে নদীপারের পাকা রাস্তায় বসেছিল ওরা। ওদের পায়ের নিচে, কিছুটা দূরে বহু পদভারে ব্যবহারে ব্যবহারে দীর্ণ চর। পাশেই বয়ে যাচ্ছে মধুমতী। শীর্ণ, অসুন্দর, অসতেজ, স্রোতহারা, দুঃখিনী বুড়ি নদী। বয়সী মায়ের চোখের মত ঘোলাটে হলদে তার জল। দিনশেষে সেই নদীর জলজ বুক থেকে ‘আর তো পারিনা’ গোছের কাতর কাকুতি উঠছে যেন !

চমকে উঠে ওরা, নদীও ক্লান্ত হয় ! দু’মনে দুজনে একসাথে এক ভাবনায় বিষণ্নবিদুর হয়ে যায়। তবে কী সময় হল চির বিচ্ছেদের! শত শত অপেক্ষার রক্তাক্ত পথ পেরিয়ে আজও ওদের ছেঁড়া কলিজা এক হতে পারল না!

তর তর করে নেমে গেল আর্য। চরের সেই আদিগন্ত ধূ ধূ চেহারা আর নেই। মানুষের দখলদারি থেকে বেঁচে যাওয়া সামান্য খোলা জায়গায় গজিয়ে উঠেছে ঝোপ ঝোপ শণ আর কাশের গুচ্ছ গুচ্ছ গাছ। তাদের লম্বা চিরল পাতায়, সূর্যের শেষবেলার আলো পড়ে জমাটি করে তুলেছে আসন্ন সন্ধ্যাকে। সংকুচিত হয়ে পশ্চিম আকাশের অল্প জায়গা ঘিরে রঙের বজরা নিয়ে ডুবে যাচ্ছে সূর্য। মরা নদীর করুণ জল উজিয়ে সেদিকেই হেঁটে যাচ্ছে আর্য।

গুটানো জিন্সের নিচে ওর খালি পা। রোমশ, শির তোলা, বয়স্ক, দৌড়পটু পেশি ফুলে আছে নানা আঁকিবুঁকিতে। একপাটি স্যান্ডেল উল্টে গেছে। মুখ গুঁজে অচেনা দেশের মাটি শুঁকছে উল্টে যাওয়া নতুন স্যান্ডেলের একপাটি।

এশার বহু পরিচিত খাদিমের স্যান্ডেল সু। ওর বাপির প্রিয় ব্র্যান্ড। খুব পরত আগে। এখন আর পায় না তাই পরে না। বাপির মতে, খাদিমের নামে এদেশে যা আসে তার অরিজিন্যালিটি নাকি সন্দেহমূলক। তাই খাদিমের বদলে বাংলাদেশের বাটা বা এপেক্সের স্যান্ডেল কিনে নেয় আজকাল। চকিতে এশার মনে হয় 'অরিজিন্যাল নয়' এই কথাটি বাপির বাহানা নয়তো? হয়তো ছেড়ে আসা নিজের জন্মভূমিকে এগিয়ে রাখার এটা এক আবেগি কৌশল !

এশা জানে তার মোহাজের বাপি কিছুতেই ভুলতে পারেনি মুর্শিদাবাদের সেই মাটি, বাগান, গেটের উপর সাজানো সিমেন্টের হাতি মূর্তি, একতলার জাফরিকাটা জানালা, মোহররমের বাজি পোড়ানো, পুজোর ছুটিতে দল বেঁধে কলকাতায় ঘুরতে যাওয়া, আকবর মিয়াভাইয়ের এক্কা দোক্কা ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়ার গলায় ঝুলিয়ে রাখা সোনা রুপা জরির মালার দুলুনি আর রাত জেগে জলসায় জলসায় গান শোনা, নাটক দেখা, বিরিয়ানি খাওয়া।

উল্টো স্যান্ডেল দেখে এশার মনে পড়ে, মা কাকিমারা উল্টানো জুতা স্যান্ডেল দেখলেই বলে উঠত, ওরে যা যা তাড়াতাড়ি ঠিক করে দিয়ে আয়। জুতো স্যান্ডেল উলটে থাকলে নাকি ঝগড়া বাঁধে, আপনজনদের ভেতর মন কষাকষি হয়, দূরত্ব বেড়ে যায়।

এশার অদম্য ইচ্ছা করে স্যান্ডেলটা সমান করে দিয়ে আসতে। কিন্তু ও যেন মাটির সাথে গেঁথে গেছে। মরা নদীর পারে ঘাস, লতাপাতা, কাঁথাঝুলি, বুনোপালং, শেয়ালকাঁটা ঝোপের সাথে এক অবসন্ন গাছ হয়ে বসে থাকে এশা।

দূরত্বের শিকড়গুলো মায়াভরে বেড়ে উঠে ওর মন থেকে পায়ে, পা থেকে সমস্ত শরীরে। আর বুঝি দেখা হবে না আর্যর সাথে। কেন মনে হচ্ছে এই শেষ ?! আর্য আর আসবে না, আসার জন্যে পাগল হয়ে উঠবে না, জ্বর হলে, দুঃখ পেলে, সুখী হলে যখন তখন আর ফোন দেবে না। বাপির সাথে যুক্তি করে মাকে একটার পর একটা রান্নার অর্ডার দিয়ে জ্বালাবে না।

নদী চরে পড়ে থাকা ভাঙা নৌকার মত এশার মগজে বেড়ে উঠে সম্পূর্ণ ক্ষয়ের অমোঘ অপেক্ষা। খুলে খুলে যাচ্ছে এশার হাত পা মন।গলে মিশে যাচ্ছে আর্যর কাছে পাওয়া প্রথম আর একমাত্র মাতৃত্বের সুখানুভূতি। চিৎকার করে এশার বলতে ইচ্ছা করে, "আমি মরে যাচ্ছি আর্য। প্লিজ সব ভুলে ফিরে আয়।"

ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে আর্য। বেশ দূরে, তবু দেখা যাচ্ছে ওকে। ছপ ছপ করে পেরিয়ে গেল হাঁটু জল নদী। পারে উঠে কী যেন খুঁজছে। একবার ঘুরে তাকায়। চোখ দেখা যায় না। কেবল চশমার কাঁচে পড়ন্ত সূর্যের শতকোটি রঙিন আলোকচ্ছটা জ্বলে জ্বলে উঠে নিভে নিভে গেল।

আর্য কি ওর হিংস্র দাঁত, নখ ঢাকতে দ্রুত সরে গেল ওর কাছ থেকে? সহসা পেরিয়ে গেল জাতি, জাতি পরম্পরায় ঘৃণ্য সুনির্দিষ্ট শত্রুকে হত্যা করার মহাপাপ চিন্তা থেকে নিজেকে বাঁচাতে? নাকি প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম জমে থাকা প্রতিশোধের আগুনকে অশোক পাকুড় অশত্থ বটের পাতায় লুকিয়ে রাখতে চলে গেল ওপারে?

এরচেয়ে গলা টিপে মেরে ফেললেও শান্তি পেত এশা। কেন যে কাল রাতে আর্যর শক্ত দুটি হাত শেষ মূহূর্তে থেমে গেল! মরতে এশার কোন কালেই ভয় নেই। পঁচিশ বছর আগে আর্য যখন বলেছিল, "চল আমরা একসাথে মরে যাই", সেদিনও খুব রাজি ছিল এশা।

এশার চোখ বেয়ে জল ঝরে। প্রেম; সে তো মরে গেছে কত আগে। বাকি ছিল বন্ধুত্বের এই সুতীব্র টান, এবার বুঝি তাও গেল। এত ক্রোধ জমে ছিল আর্যর বুকে? এত?

প্রতিটি দিন তারিখ, শাসকের নাম ধরে আঘাত করছিল এশাকে। "বল্, সোমনাথের মন্দির লুট করেনি মুসলমানরা ? বল্, ছেচল্লিশে নোয়াখালিতে হিন্দুদের মেরে কি রক্তগঙ্গা বইয়ে দিসনি তোরা? একাত্তরে কেন হিন্দুদের টার্গেট করে হত্যা করেছিল

তোর জাতভাই মুসলিম পাকিস্তানিরা? কেন পালিয়ে যেতে হল আমাদের? বল্, বল্, কেন স্বাধীন সার্বভৌম অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে থাকতে পারলাম না আমরা ? কেন ঘর পুড়িয়ে, মন্দির ভেঙে মালাউন বলে তাড়িয়ে দিলি তোরা? এখনো কেন আমাদেরই ঘর পোড়াস, মন্দির ভাঙিস, কেন আমাদের ঘরের মেয়ে বউদের ইজ্জত লুটে নিস্, তোরা?”

প্রতিটি প্রশ্নের সাথে সাথে লোহার মত শক্ত দু'হাত গেঁথে যাচ্ছিল এশার গলায়। আর্যর হাত পরিণত এখন। ইস্পাত কঠিন চাপে হিংস্র হয়ে উঠেছিল আর্য। পঁচিশ বছর আগের তারুণ্যের কাঁপুনি নেই এই হাতে। দম বন্ধ হয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিল এশা। তবু কী এক খুশিতে ও ভয় পায়নি। আর্যর হাত জড়িয়েই ছিল। বাধা দেয়নি এককফোঁটা।

প্রতিটি দমবন্ধ করা চাপে ওর মনে হয়েছিল এটাই তো হওয়ার ছিল। এরকম কথাই তো হয়েছিল ওদের, আগে এশা মরবে, তারপর আর্য। তাহলে ওদের আর কাউকে হারানোর কষ্ট বইতে হবে না দিনের পর দিন।

ওপারে কিছু বড় বড় গাছ, শিমূল, মান্দার, অশোক, কৃষ্ণচূড়া আর বট, পাকুড়, অশ্বথরা ঘন মায়া বিছিয়ে রেখেছে। একটি চওড়া কাঠ বেঞ্চির মতো, গাছের সাথে ফিট করে দোকান চালাচ্ছে কেরামত মুন্সিভাই। বিড়ি সিগারেটের ফাঁকে ফাঁকে গাঁজা, নেশারু সিগারেট, ফেন্সিডেল তো নস্যি, ইয়াবাও বিক্রি হয় এখানে। ওদিকে টং দোকান করেছে দত্ত বাড়ির মিন্টুদা। আরো দু'টি দোকান আছে, কিন্তু তাদের মালিককে চিনতে পারছে না আর্য।

কেরামতভাই আর মিন্টুদা ন্যাংটোকালের বন্ধু। আর্য জানে মিন্টুদার এই দোকান এ কেরামতভাইয়ের সাহায্যেই করা। মিন্টুদারা খুবই গরিব ছিল। ওর বড়লোক জ্যেঠুর মিষ্টির দোকানে কাজ করত ওরা বাবা ছেলে। জ্যেঠুরা হঠাৎ দেশ ছেড়ে গেছে। যাওয়ার সময় মিন্টুদারা জানতে পারে ভিটে দোকান সব, শহরে

নতুন আসা নিজড়া গ্রামের ওদুদ উকিলের কাছে বিক্রি করে দিয়ে গেছে গোপনে। একবারও মিন্টুদের কথা ভাবেনি। কিছু টাকা ধরিয়ে জেঠু বলে গেছে, "তোগের ওপারে বয়ি নিতি পারব না রে ভাই। এই নিয়ি এহেনে কিছু করি বাঁচি খা।"

বোঁচকা বুচকি, ভাঙা পলা তোলা থালা বাসন আর তিন তিনটে মেয়ে নিয়ে জামরুল গাছের নিচে দিশেহারা বসেছিল মিন্টুদার মা। ভিটেবাড়ি দখলের জন্যে ওদুদ উকিল কাগজ আর পুলিশ নিয়ে হাজির হয়ে গেছিল সাথে সাথে। পুরানো মালিকের কাউকে থাকতে দেবে না ওদুদ উকিল। সময় অবশ্য দিয়েছিল ওরা, কিন্তু কোথাও আশ্রয় জোটাতে পারেনি মিন্টুদার বাবা। শেষ পর্যন্ত মন্দিরের সেবাইতের কাছে গিয়েছিল যদি মন্দিরের পতিত জায়গায় ঘর তুলে থাকতে দেয় কিছুদিনের জন্যে।

সেই সময়ে কেরামতভাইয়ের বাবা যাচ্ছিল বাজারে অই পথে, মিন্টুদা আর মিন্টুদার বাবা আসার আগেই বাড়ি নিয়ে গেছিল ওদের। পুকুর ধারে এক চিলতে জায়গা দিয়ে বলেছিল, আমার এইটুকুই দেবার আছে। পারলি ঘর তুলে নে থাক তোরা।

বয়সে বড় ছিল দুজনেই। একটু সংকোচ লাগে আর্যর। কিন্তু নিজেকে যে লুকোতে হবে।

সজারু কাঁটার মত ফুঁসে ফুঁসে ফুলে উঠছে রাগ। এই সেদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হিন্দুদের উপর নেমে এসেছে অমানুষিক হামলা। টিভি নিউজ দেখতে দেখতেই ক্ষেপে উঠেছিল সে। সব কেনো'র উত্তরে এশাকেই টর্চার করেছে অমানুষের মতো। এক অক্ষরের একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি এশা।

আর্য জানে, ওর হাতে মরতে এশার কোন ভয় নেই। তাই বলে ও কী করে মারতে গেল এশাকে ? তবে কি ও নিজেও চিরায়মান এক সাম্প্রদায়িক অমানুষ ? উপরে উপরে অসাম্প্রদায়িক, নকল উদারতার শুকনো বক্তৃতা ঝাড়া অমানুষ ?

শুধু গরুর মাংস খাওয়ার অপরাধে যখন ভারতে এক

মুসলিমকে মেরে ফেলে, ছেলেকে আহত করে বা মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করে ও তো প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল ! সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে যাবতীয় ঘৃণা উগরে দিয়েছিল সাম্প্রদায়িক ঘৃণাবাজসহ তার দেশের সরকারের বিরুদ্ধে।

এশাও ত লড়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে। সংখ্যালঘুদের অধিকার আদায়ে ছুটে যাচ্ছে মিছিলে, সাহায্যে, লেখায় প্রতিবাদের সরব মিটিংএ ! তবে? কী হল তার ? হঠাৎ করে সে কেন এমন উৎকট হিন্দু হয়ে ওঠল?

কেরামত ভাইয়ের চোখে সস্তা দামের পাওয়ারফুল চশমা। ভারে ঝুলে আছে। কাঁচের পেছনে রস জবজবা লিচুর মত লাগে চোখদুটিকে। অন্ধ হতে বেশি দিন বাকি নেই আর। সিন্দুকে তুলে রাখা সাত রাজার ধন স্থানীয় মাতৃভাষায় সিগ্রেট চেয়ে হাত বাড়ায় আর্য। টাকাটা হাতে নিয়ে কেরামতভাই সিগ্রেট দেয়। একবারের জন্যেও তাকিয়ে দেখে না কে নিলো সিগ্রেট। কেমন জুবুথুবু হয়ে বসে আছে এক সময়ের শক্তপোক্ত মানুষটা। যেন পৃথিবীর সব কিছু জেনে গেছে কেরামতভাই। এবার মলাট বন্ধের অপেক্ষা শুধু।

"এহেনে এডডু বসলাম।"

সিগারেট না ধরিয়েই তক্তার বেঞ্চিতে বসে পড়ে আর্য। ওপারে রেখে এসেছে এক ছিন্নভিন্ন মানচিত্র। অনেক আগের দেশহারা দেশছাড়া অই মানচিত্রকে সে চেনে ছেলেবেলা থেকে। হাতের তালুর মত। শরীরের প্রতিটি লোমের মত। প্রতিটি হাড়, কোমরের ভাঁজ, মাতৃদাগ, বুকের ভেতর জড়িয়ে থাকা নিশ্চিন্ত শরীর। নিঃশ্বাসে এখনো ভাসে ওই মানচিত্রের চুলের গন্ধ, শরীরের স্বেদ, স্থলপদ্মের মত নৈবেদ্যর দান দুটি ফুল। সে মানচিত্রে কেবল একটি দেশ, তার নাম আর্য।

পুজোর ফুল তুলতে গিয়ে পরিচয়। ঠাকুরদের বাগানঘেরা বাড়িটার সাথে কলকাতার বাড়ি বদল করে চলে এসেছিল

ওরা পূর্ব পাকিস্তানে। আর্যদের ছোট শহরে এরকম কয়েকটি পরিবার ছিল। ভারত থেকে মোহাজের হয়ে ওরা ভেসে এসেছিল সাতচল্লিশের দেশভাগের ধাক্কায়। ওদের বলা বাংলাভাষার সাথে আর্যদের বাংলা মিশ খেত না। তবু আপ্রাণ চেষ্টা করত ওরা এদের সাথে মিলেমিশে থাকতে।

সেদিন এশাদের বাগানে কোন ফুল ছিলনা। আগেই কারা যেন তুলে নিয়ে গেছিল। খালি সাজি হাতে আর্য তাই একটি ছোট পাথরে লাথি লাথি মারতে মারতে ফিরে যাচ্ছিল। এশাই ডেকেছিল, "এই এই শোন না।"

আর্য অবাক হয়, "এই মেয়ে তাকে ডাকছে!"

"ফুল নেবে তো? এদিকে এসো"

সসংকোচে আর্য সেদিন এশার সাথে ভেতর বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। এই বাড়ির ভেতরে তারা কোনোদিন ঢুকতে পারেনি। শুনেছে এই বাড়ির ঠাকুরদা সকাল হলেই কলকাতা থেকে আনা গঙ্গার পুণ্যজল ছিটিয়ে মন্ত্র পড়ে শুদ্ধ করে নিত বাড়ির ঘোরানো বারান্দা। কায়স্থ যারা, তারা তবু কিছুটা কাছে যেতে পারত। আর্যর বাবা কাকারা অই বাগান পর্যন্ত গিয়েই ধন্য হয়ে যেত। শুদ্র নমঃশূদ্রের আবার জাত কী রে! ঠাকুরদা ছ্যা ছ্যা করত, "ওরে ও নিবারণ ছুঁয়ে দিস না কিন্তু বাবা। তোরা ছুঁলেও যা, ন্যাড়ারা ছুঁলেও তা। এ বয়সে আর স্নান করাস না, সরে যা, সরে যা, তফাত রেখে দাঁড়া বাপ!"

সেই দেখা এশার সাথে। তারপর কত একসাথে খেলা, ঝগড়া, মারামারি, ভাব ভালোবাসা আর এক সময় সত্যি ভালোবাসায় দুজন দুজনের সাথে জড়িয়ে যাওয়া। আর্যর জীবনে এশা ছিল পরী। ভার্সিটিতে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে একসাথে চলেছে দুজন। মিছিলে মিটিংএ একসাথে এক প্রাণ হয়ে থাকত দুটিতে।

এর মধ্যে ঘটা করে বিয়ে করে ফেলেছে মৃনালদা সিলভি আপা। ধর্ম অধর্ম নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। প্রশ্নও করেনি।

সবাই জানত এটা ঘটবেই। আর্য এশাও এগিয়ে যাচ্ছিল। সবাই ভাবত এটা তো ঘটবেই। শুভেচ্ছা, শুভেচ্ছা রে তোদের।

বুকে বড় ব্যাথা বাজে আর্যর। শুভেচ্ছার ফুলে এত কাঁটা ছিল ! উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আর্য। পাঁজরে পাঁজরে এত ব্যথা কেন যে বেজে উঠে সময় অসময়ে!

বিসিএসের প্রিপারেশন নিচ্ছে আর্য এমন সময় ওদের ছোট শহরে বেজে উঠে সাম্প্রদায়িকতার ডঙ্কা। এক রাতে লুট হয়ে যায় আর্যর বাবার দোকান। হুমকি আসে বোনকে তুলে নেওয়ার।

সেদিন পাড়ার সবাই আশ্রয় নিয়েছিল এশাদের বাড়ি। এক সময় পরিস্থিতি শান্ত হয়ে গেলেও শুরু হয় এক এক করে ওপারে পাড়ি জমানো। শেষরক্ষা কিন্তু হয়না। কারা যেন আর্যর বাবাকে মেরে অর্ধমৃত করে রেখে যায় বাজারে। অনেকের সামনে। দিনে দুপুরে। সবাই দেখেছে কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি সাহস করে।

আর্য শুনেছে এশার বাবাও ছিল সেই দর্শনার্থীদের দলে। সেই শুরু ওর রাগের। যদিও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আর্যর বাবা, মা, বোনকে উনিই আগলে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত বর্ডার পার করে ঘরে ফিরেছিলেন তবু আর্যর রাগ পড়েনি, আবার ভালোবাসাও কমেনি। একই নদী পদ্মা গঙ্গার মত আর্যও বাংলাদেশ ভারতের হয়ে দুলে গেছে। ওর মনে স্বদেশ হয়ে কোন দেশের ঠাঁই হয়নি।

অথচ কী আশ্চর্য ওপারে পৌঁছেই আর্যর বাবা মা বোন প্রচন্ড সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠল। মা তো তিনবেলা পুজো দিয়ে পাড়া পড়শিদের সাথে গল্প করত, ভাগ্যিস নিজের দেশে ফিরে আসতে পেরেছি।

জন্ম জন্মান্তরের পাশাপাশি থাকা, ভাব ভালোবাসা সব কিছু ভুলে মা বাবা ধর্মের তত্ত্বকে সাচ্চা বলে ভারতকে স্বদেশ বলে মেনে নিয়েছিল। বোন বাঙালত্ব মুছতে দ্রুত রপ্ত করে নিয়েছিল কলকাতার ভাষা আর ওর বয়সী ছেলেমেয়েদের কালচার।

আর্য অবাক হয়, তবে কী ভাঙনের বীজ আগেই রোপিত ছিল

হিন্দু মুসলিমের মনে? কবে থেকে? সোমনাথের মন্দির লুটের সময়? পানিপথে? আওরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে ? সিপাহি বিপ্লবে ? বঙ্গভঙ্গে? ছেচল্লিশের সেপ্টেম্বরে?

এই যে দেশ, ওর বাবা মা বা তাদের চৌদ্দ পুরুষের কারো নয়। অথচ মা কী অম্লান মুখে বলে দিল, নিজ দেশ ! বাবা বেঁকে বসল, কী হবে বিসিএস দিয়ে যখন ওই দেশে আর আমরা থাকবই না!

মার মুখে ছলনা খেলে যায়, "দেখ বাবা তখন বলিনি এখন বলছি, এশাকে ভুলে যা। তেল জল যেমন এক হয় না হিন্দু মুসলিমও কখনো এক হবে না। ওই কাগজের বিয়ে ছিঁড়ে ফেললেই হল। কে আর জানবে এখানে!"

আর্য ভালই জানে, জানলেও ওর কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু এশা?

ওরা যেদিন বিয়ে করে, এশার বাপি শুধু বলেছিল, বেটা সবাই কিন্তু তলোয়ারের ভয়ে ইসলাম গ্রহন করেনি। জাতভেদের অত্যাচার, নিগ্রহ, ঘৃণা থেকে বাঁচতে অনেকেই মুসলিম হয়েছিল। তোমার বাবা মা কষ্ট পাবেন। তারা নিজেরাই ত জাতভেদের নিগূঢ় সংস্কারে বাঁধা। মুসলিম মেয়ে---

আর্য কথা শেষ করতে না দিয়েই বলেছিল, "কাকাবাবু এই সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষের জীবনে ধর্ম এক ভুল এক্সটেনশন মাত্র। একমাত্র ধর্ম নিয়েই বাঁচতে হবে এটা এখন খুব জরুরি নয়। আমরা আমাদের মত থাকব। কারো মানা আর না মানায় আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ তার্কিক আর্য বিশ্বাসের কথার কোন জবাব ছিলনা এশার অতি সাধারণ বাবার কাছে। শুধু বলেছিলেন, "দেখ তোমার বাবা মার ক্ষমা চেয়ে নিও। আমার কাছে আমার মেয়ের সুখই প্রধান।"

আর্যর মা কথা বলেনি। পুজোর ঘরে খিল তুলে বসেছিল।

বাবা দু একটি কী বলেছিল মনে নেই। এশা আর্যর বাবার পা ছুঁয়ে শুধু বলেছিল, “কাকু আমি তোমার দেবতাকে পুজো দিলে তিনি কি নেবেন না?”

আর্যর বুকের ব্যথাটা মাথায় উঠে আসছে। গলা খুলে কাঁদলে কি ব্যথাটা কমে যাবে ? সিগারেটে আগুন ধরাতে দড়িটা টেনে নেয়। আর সেই মূহূর্তে কেরামতভাই বলে উঠে, “কবে আইছ?”

হাত ফস্কে ছুটে যায় দড়ি। নিভু নিভু ম্লান আগুন ঝলকে উঠে হলদে তীব্রতায়। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে কিছু ঝুরো আগুন। নিচের শুকনো পাতারা দগ্ধ জিভে টেনে নেয় সে আগুন। তাড়াতাড়ি পা দিয়ে চেপে নিভিয়ে দিয়ে আর্য বলে, “আদাব কেরামতভাই।”

“আদাব, এশার অসুখ শুনি আসিছ তাই না? আহা বড় ভাল মেয়ে গো আরজ্জো। মরি যাবি শুনি বড় দুঃখ লাগিচ্ছে ভাইডি গো।”

মিন্টুদা কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, “একবার ইন্ডিয়া নিয়ে যাও ছোটভাই। ভাল ডাক্তার দেখায়ে দেখ বাঁচাতি পারো কিনা ! কত জনই তো বাঁচি ফেরে এই অসুখে! ঈশ্বরের কত লীলা!”

কী ? আর্যর শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়। তিনদিন ! ঠিক গুনে গুনে তিনদিন হয় বাংলাদেশে এসেছে আর্য। এশার বাবা মা কেউ ত কিছু বলেনি! এশাকেও ত কখনো সামান্য উহু আহা বা শুয়ে থাকতে দেখেনি সে। সামান্য রোগা হয়েছে এই ক মাসে। ফোনে অবশ্য বলেছিল, ডায়েট করছে।

“কী মুটকি হচ্ছি জানো!” এর মধ্যে দু’দিন সে ফোনে পায়নি এশাকে, “কই গেছিলি মুটকি বান্দরি?” এশা হেসেছিল, “জিম করছি। এবার এলে নায়িকা দেখবি। তোর বউ নায়িকা হয়ে গেছে। প্রাউড হচ্ছিস না?”

আর্য এক গাদা মুখ খারাপ করে গালাগাল করেছিল। এশার সে কী হাসি।

আর্যর অনেক বান্ধবী। বিছানা বালিশেও তারা মাখামাখি। কিন্তু কেউ আর্যর অফিসের টেবিল কিম্বা ঘরের দেয়াল জুড়ে গোলগাল এশাকে সরাতে পারেনি। চেষ্টা করলেই আর্য তাকে ধুয়ে মুছে ফেলে দেয়। একবার বাবা মাও নরম হয়ে বলেছিল, সবাই বউমা নাতি দেখতে চায়। এশা আর তীর্থকে নিয়ে আয় না একবার বাবা।

না,আর্য সামান্যটুকুও নরম হয়নি। এশা আর তীর্থ এ বাড়ির দেয়াল জুড়ে আছে,তাই থাকবে।

ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে আর্য বলেছিল, আমার বউ, ছেলেকে কেবল দেওয়ালে দেখবে তোমরা। কখনো ছুঁতে পারবে না। ওরা শুধু আমার। যেমন আমাকে তোমরা ভেবেছ আমি শুধু তোমাদের। কেবল তোমাদের ছেলে তেমনি।

প্রায়ান্ধকার সেই সন্ধ্যায় পাগলের মত নাম্বার প্রেস করে আর্য, "তীর্থ পিক আপ, পিক আপ মাই বয়, মাই এঞ্জেল! তীর্থরে তোর মা মরে যাচ্ছে তুই কী জানতিস বাপ?"

"হাই ড্যাডা! তুমি! কাজে ছুটছি।" তীর্থের গলায় খুশির চকমক, "মাকে জ্বালাচ্ছ না তো বাবাই?"

হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে আর্য... "তীর্থ, তীর্থ, বাপ আমার, আমি মরে যাচ্ছিরে। তুই আয় চলে আয়—"

"ড্যাডা হাই ড্যাডা, বাবা বাবাই কী হয়েছে?"

আর্য ছোটে। নদীর জলে সূর্য গুলে যাচ্ছে লাল হয়ে। তীর্থকে সত্যিটা জানিয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছে সে জল ভেঙে ভেঙে। তার পৃথিবী তার প্রাণ, তার বাঁচা মরার সোনারূপোকাঠি, শেয়ালকাঁটার বনে হলুদ ফুল হয়ে হাসছে। ওই তো উঠে দাঁড়িয়েছে। আর্য পড়ে যাবে না তো, সেই আশংকা সমস্ত চোখ মুখ বুক জুড়ে।

সূর্যের শেষ আলো অনিন্দিত রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে এশাকে।

থাকুক পড়ে ভারত। থাকো পড়ে হে বাংলাদেশ। থাক তোরা

হিন্দু মুসলিম।

একটু পরেই অন্ধকার আকাশ ঝুরে নামবে পৃথিবীতে। সব কিছু কালো হয়ে হারিয়ে যাবে এক রঙে। না এশাকে হারিয়ে যেতে দেবে না আর্য। কিছুতেই না।

ছবি: চিরঞ্জিত সামন্ত

নিরুদ্দিষ্টের অশেষ যাত্রা

অমর মিত্র

উপন্যাস এক অশেষ যাত্রা। উপন্যাসের আসলে শেষ নেই। আসলে লেখক যেন একটি উপন্যাসই সমস্ত জীবন ধরে লেখেন। হয়তো ঠিক তা নয়, কিন্তু কখনো যেন এমন মনে হয়। নদী নিয়ে লেখা ফুরোয় না দেবেশ রায়ের। তিস্তা পারের বৃত্তান্ত, তিস্তা পুরাণের পর করতোয়া নদীকে তিনি খুঁজতে বেরিয়েছেন নদী ও শহরের 'যুগলগীতি শীর্ষ' নামে লেখা বেশ কয়েকটি আখ্যানে। উপন্যাস কাহিনীকথন নয়, যদিও কাহিনীকথনই এক জাতীয় পাঠক পছন্দ করেন বেশি। কাহিনীর বৃত্তায়নই পছন্দ বহুজনের। ইচ্ছাপূরণের কাহিনী আরো বেশি পছন্দ মানুষের। যেমন সিনেমায় হয়। কিন্তু পাঠকের তো রকমফের আছে। কেউ বিভূতিভূষণ পড়েন, কেউ পড়েন নীহার গুপ্ত। লেখক যদি পাঠক ধরতে লেখার কথা ভাবেন, তাহলে তিনি সেই অচেনা ব্যক্তিকে মাপবেন কীভাবে ? কে পছন্দ করবে তাঁর লেখা, তা আন্দাজ করা দুরূহ। তার চেয়ে এমন তো হতে পারে, তিনি যাঁকে চেনেন সবচেয়ে তাঁর জন্যই লিখতে পারেন। সেই ব্যক্তিটি তিনি নিজে। নিজেকে মাপাও সব সময় হয়ে ওঠে না। তবুও একটি কথা নিজে নিজে টের পাই, নিজের জন্যই লিখি আমি। নিজে সন্তুষ্ট না হতে পারলে শেষ অবধি সে লেখা হয়ে ওঠে না। কীভাবে তা হয় বলছি। আমি ১৯৮০ নাগাদ, তখন তিরিশে পৌঁছাইনি, একটি নভেলেট লিখেছিলাম, শিলাদিত্য পত্রিকায়। সম্পাদক ছিলেন সুধীর চক্রবর্তী। 'বিভ্রম' ছিল সেই নভেলেটের নাম। একটি ঘোড়ার গল্প। দীঘার সমুদ্রতীরের এক হোটেলওয়ালার একটি ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি প্রতি আশ্বিনে পালায়। সুবর্ণরেখা এবং সমুদ্রের মোহনার কাছে বড় একটি চর ছিল। আশ্বিনে

সেই চরে চারদিক থেকে ঘোটক ঘোটকীরা পালিয়ে আসে সবুজ ঘাস এবং প্রেমের নেশায়। মদ্দা ঘোড়া এবং মাদী ঘোড়ার ভিতর ভালবাসা হয় সেই সময়। কিন্তু সেই বছর বৈশাখে সে অদৃশ্য হয়েছিল। নিখোঁজ সেই ঘোড়া খুঁজতে যায় হোটেলওয়ালার আশ্রিত ভানুদাস। মধ্যবয়সী ভানু ছিল হা'ঘরে। দুনিয়ায় কেউ কোথাও ছিল না তার। আমি দীঘায় গিয়েছিলাম শীতের সময়। ডিসেম্বর মাস। একটি হোটেলে মাস-চুক্তিতে আমি ঘর ভাড়া করেছিলাম। সেই হোটেলের মালিকেরই ছিল ঘোড়াটি। দেখতাম আমার ঘরের জানালার ওপারে নিঝুম বেলায়, নিঝুম রাতে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ভানু কোথায় যেত ঘোড়াটির খোঁজে, তা জানা যেত না। রাহা খরচ নিত গাঁজাড়ু হোটেলওয়ালার কাছ থেকে। মনে হয় ঘোড়া খোঁজার নাম করে সে নিজের একটা ইনকামের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু ভানু আশ্চর্য সব জায়গার নাম করত হঠাৎ হঠাৎ। মীরগোদার জাহাজ ঘাটার দিকে দেখা গেছে নাকি একটি ঘোড়া। রানিসাই গ্রামের একজন খবর দিয়েছে সেদিকে একটি ঘোড়া দেখা গেছে। যাই হোক ভানুর সঙ্গে আমিও ঘোড়া খুঁজতে গিয়ে নুনের খালারি দেখে এসেছিলাম। কিন্তু যে কথা বলতে চাইছি, আশ্বিনে যার পলায়নের কথা সে বৈশাখে কেন পালিয়েছে? গেল কোথায় সেই বুড়ো টাট্টু ? ভানু জানে না। লেখক জানবে কী করে?

বাস্তবতা ছিল ঘোড়াটি নিখোঁজ হয়েছে। কিন্তু কেন তা কেউ বলতে পারছে না।

বাংলাদেশের খুব শক্তিমান নবীন কথা সাহিত্যিক স্বকৃত নোমান তাঁর "কাল কেউটের সুখ" উপন্যাসে গোঁড়া এক হিন্দু ব্রাহ্মণের ইসলাম নেওয়ার কথা লিখেছেন। উপন্যাসটি খুব সাহসের সঙ্গে লিখেছেন তিনি। একজন সত্য দ্রষ্টার মতো করে দেখেছেন সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ। বাংলাদেশে নীরবে অনেক হিন্দু পরিবারেই কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হয়ে যান। এই প্রবণতা আছে। আমি আমার একটি গল্প 'অলীক ক্রন্দনধ্বনি' তেও এই নিঃশব্দ ধর্মান্তরের কথা লিখেছিলাম, খুলনার একটি কম বয়সী

মেয়ের কাছে, তাদের পরিবারের গল্প শুনে। তার নানা মুসলমান, নানী সনাতন ধর্ম পালন করেন। ১৯৭১ এর ষোলই ডিসেম্বরে বাংলাদেশের জন্মের পর হিন্দু মানুষটি ইসলাম নেন ছোট মেয়েটিকে নিয়ে। বড় মেয়ে এবং স্ত্রী হিন্দু থেকে যান। একই বাড়িতে দুই ধর্ম পালন হতে থাকে। আমি গল্প প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। কিন্তু কেন সেই মানুষটি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, তা কেউ খুঁজে বের করতে পারেননি। আন্দাজ করা যায় মৌলবীদের চাপে হয়তো। আবার অন্য কারণেও হয়। বিশ্বাস বদলে যেতে পারে। স্বকৃত নোমানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম কেন গোঁড়া হিন্দু মানুষটি ইসলাম নিল, তা তুমি লেখনি। সে আমাকে বলেছিল, বাংলাদেশে এমন ঘটনা ঘটেই যায়, কিন্তু তার কারণ জানা যায় না।

আমি বলেছিলাম, লেখকের কাজ সেই কারণ খুঁজে বের করা।

স্বকৃত আমাকে বলেছিল, চেষ্টা করব এবার থেকে।

জীবনের অনেক রহস্য খুঁজে বের করা যায় না সত্য। অনেকেই তা প্রকাশ করেন না। লেখক তো তৃতীয় নয়নের আধিকারী, তিনি সেই রহস্য কি উন্মোচন করতে পারবেন না?! আমি ভানুকে কতবার জিজ্ঞেস করেছি, তার অশ্ব কেন নিরুদ্দেশে গেল। হোটেলের ঠাকুর বলল, কেউ হয়তো চুরি করে নিয়ে গেছে। সোজা কথা। এতে করে নিরুদ্দেশের রহস্য শেষ হল। কিন্তু ভানুদাস আমাকে বলেছিল,

-“না দাদা, বুড়ো ঘোড়াকে কে চুরি করবে?”

-“তাহলে সে পালাল কেন, এখন তো আশ্বিন নয়?”

ভানু উত্তর দিতে পারেনি। পরের ডিসেম্বরে আমি চলে আসি দীঘা থেকে। তখনো রাহা খরচা নিয়ে ভানু সেই পলাতককে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বদলি হয়ে চলে আসার পর আমার ভিতরে প্রশ্নটি ছিল, সে পালিয়েছিল কেন বৈশাখে? আশ্বিনের বদলে বৈশাখে কেন? উত্তর নেই। আমি উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম নিজের

ভিতরে। নভেলেট লিখতে আরম্ভ করেছিলাম সেই ঘোড়াটিকে নিয়ে। সেই সময়েই যেন স্বপ্নোত্থিতের মতো, এক ভোরে আমি লিখতে বসে পেয়ে গিয়েছিলাম পলায়ন রহস্য। সে ছিল যেন প্রকৃতি এবং জীবনের রহস্য উদ্ধার।

সেদিন ছিল ভয়ানক বৈশাখ। ঘোড়ায় চেপে ঘোড়ার মালিক ফিরেছিলেন গ্রাম থেকে দীঘায়। রোদে ঘোড়াটির জিভ বেরিয়ে এসেছিল। সে দাঁড়িয়েছিল একটি নিম গাছের ছায়ায়। নবীন তরুর ছায়া ছিল না বেশি। ফলে বৈশাখের রোদে পুড়ছিল। গরম বাতাস বইছিল। বালিয়াড়ি তেতে গিয়েছিল ভীষণ। ঘোড়াটি ধুঁকছিল। এরপর দুপুরের শেষে আকাশের ঈশেন কোণে মেঘের সঞ্চার হয়। ধীরে ধীরে ঘন কালো মেঘ ছেয়ে ফেলে সমস্ত আকাশ। সমুদ্র দিগন্ত থেকে মেঘ উঠে আসতে থাকে উপরে। ঘোর অন্ধকার হয়ে আসে। ঝড় এল। তারপরই বৃষ্টি। প্রবল বর্ষণে ভেসে যায় সব। উত্তাপ অন্তর্হিত হল। বৃষ্টি থামে ঘন্টা দেড়েক পর। সন্ধে হয়ে আসে। সবদিক ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঘোড়াটি বৃষ্টিতে ভিজেছে কত। ঠান্ডা হয়েছে শরীর। আরাম হয়েছে তার। সেদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। সন্ধের পর চাঁদ উঠল। আশপাশের বালিয়াড়ির ধারের গর্তে, রাস্তার কোথাও কোথাও জল জমেছিল। রাত হলে চাঁদ আকাশের মাথায় উঠে এলে জোছনা পড়ল, জমা জলে। আকাশে দেখা গেল, পেঁজা তুলোর মতো মেঘ ভেসে চলেছে নিরুদ্দেশে। ঘোড়াটি অবাক হয়ে আকাশ মাটি দেখল। বাতাসে ঘ্রাণ নিল। তার মনে হল, আশ্বিন—শরৎকাল এসে গেছে। সকাল থেকে দুপুর পযর্ন্ত ছিল ভয়ানক গ্রীষ্ম। দুপুরের শেষে এল বর্ষা। তারপর আশ্বিনের পূর্ণিমা। শরৎকাল। একই দিনে দুই ঋতু পার করে আশ্বিনে এসে গেছে সে। সুতরাং চল নিরুদ্দেশে। সেই যে সুবর্ণরেখার মোহনায় চর জেগেছে সবুজ ঘাস নিয়ে, সেখানে এসে গেছে ওড়িশার ভোগরাইয়ের মাদী ঘোড়া, আগের বছর তার সঙ্গে প্রেম হয়েছিল তার। মিলন হয়েছিল। সে খুটো উপড়ে পালাল, এই বিভ্রমে। সারারাত ছুটেছিল সে জোছনার ভিতর দিয়ে। সকাল হতে ফিরে এল বৈশাখ। রোদ তেতে উঠতে

লাগল। সে টের পেল আর ফেরার উপায় নেই। ভয়াবহ গ্রীষ্ম ফিরে এসেছে। বিভ্রম হয়েছিল। বিভ্রমে সে সমস্ত রাত ধরে মৃত্যুর দিকে ছুটেছে। অশ্বচরিত উপন্যাসের খসড়া ছিল এই। ১৯৮১-র ফেব্রুয়ারিতে শিলাদিত্য পত্রিকায় ছাপা হয় 'বিভ্রম' নামের সেই নভেলেট।

এই নভেলেট প্রকাশিত হলে অনেকের ভালো লেগেছিল। অচেনা লেখকের লেখা ছেপেছিলেন সুধীরবাবু, পাণ্ডুলিপি পড়ে। আমার তখন একটি দুটি বই বের হচ্ছে প্রকাশকের ঘর থেকে। কিন্তু বিভ্রম নিয়ে আমার ভিতরে দ্বিধা ছিল। মনে হতো আরো কিছু লেখার আছে। আমি লিখতে পারিনি। বছর সাত বাদে ১৯৮৮ নাগাদ আমি আবার লিখতে আরম্ভ করি উপন্যাসটিকে। সামনে সেই নভেলেট। লিখেছিলাম। এক প্রকাশকের হাতে দিয়েছিলাম প্রকাশের জন্য। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্য, তিনি পাণ্ডুলিপি হারিয়ে ফেলেছিলেন। মনে হয়েছিল, বিভ্রম আর বই হয়ে বের হবে না। আমি আরো নভেলেট লিখেছি এই সময়ে, 'আসনবনি' নামের নভেলেট তো গল্পের বইয়ে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু 'বিভ্রম' আমার মাথার ভিতরে একটি কাঁকড় ফেলে দিয়েছিল। গল্পের বইয়ে রাখিনি। আরো লিখতে হবে। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম না নভেলেটটি নিয়ে। পড়েই থাকল আরো দশ বছর। ১৯৯৭-এ রাজস্থানের মরুতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরনের পর আমি আবার নভেলেটটিকে সামনে রেখে নতুন উপন্যাস লিখতে শুরু করি। বিস্ফোরণের দিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা। আমার ঘোড়াটি পালিয়েছিল সেইদিনই। আমি তা ১৯৮১ সালেই লিখেছিলাম। এই ১৭ বছরের মাথায় সেই বুদ্ধ পূর্ণিমাই হয়ে গেল পথ। রাজপুত্র গৌতমের অশ্ব কন্থক হয়ে গেল সেই বুড়ো টাট্টু। ভানু হয়ে গেল গৌতমের সারথি ছন্দক। তারা তপোবনে দিয়ে এসেছিল রাজপুত্রকে। তিনি ফিরবেন এই হিংসার পৃথিবীতে। ভগবান বুদ্ধ ফিরবেন। সারথি ছন্দক আর অশ্ব কন্থক অপেক্ষা করছে তার জন্য এই সময়ে। সময় ১৯৯৮। রাজপুত্র ফিরে এলে পৃথিবী হিংসা মুক্ত হবে। পলাতক ঘোড়া বিভ্রমে পড়েছিল। বিভ্রম

তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। ছুটতে ছুটতে সে হিরোসিমায় গিয়ে পড়ে। সেখানে তখন কালো বৃষ্টি।

একটি উপন্যাস লিখতে সতের বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। লেখক নিজেই বোঝেন লেখা হয়েছে কি হয়নি। তিনি নিজেই নিজের পাঠক। নিজের জন্যই প্রথমে লেখেন। অশ্বচরিতের পর নিরুদ্দেশ যাত্রাই হয়ে ওঠে আমার বিষয়। শেষ হয়নি সেই লেখা। 'ধ্রুবপুত্র' এক নিরুদ্দিষ্ট কবির কথা। কবি নিরুদ্দেশ হলে মেঘও অন্তর্হিত হয় নগর থেকে। এরপর নিরুদ্দিষ্টের উপাখ্যান লিখি এক নিরুদ্দিষ্ট জুটমিল শ্রমিককে নিয়ে। ধনপতির চর নিয়েই নিরুদ্দেশ যাত্রা করে চরবাসী। সোনাই ছিল নদীর নাম এক নিরুদ্দিষ্ট নদীর কথা। আর অতি সম্প্রতি লেখা পুনরুত্থান উপন্যাসেও নিরপরাধ পুলিশ কর্মী নিরুদ্দেশে যায় নিজেকে বাঁচাতে, এবং ফিরেও আসতে চায় লক-আপে হত মানুষটির পুনরুত্থান ঘটিয়ে। মর্গ থেকে বেরিয়ে আসে মৃত। চাপা পড়া খনি থেকে উঠে আসে নিরুদ্দিষ্ট। একটি উপন্যাসই যেন শেষ হচ্ছে না। বারবার লিখতে হচ্ছে নিরুদ্দিষ্টের কাহিনী নানা রকমে। হ্যাঁ, এই শরতেও বর্তমান শারদীয়তে লিখেছি শেষ অবধি এক নিরুদ্দিষ্ট কন্যার কাহিনী, বহ্নিলতা।

জলের মাদুর

সম্বুদ্ধ আচার্য

অনেক সকালে ঘুম ভেঙে গেলো বাবাইয়ের। অনেক সকাল মানে, অনেকটাই সকাল। ভোরের একটু পরে, যখন আকাশের লাল রংটা ফিকে হয়ে আস্তে আস্তে নীল এর সাথে মিশে যায়। হাল্কা বেগুনি বা গোলাপি থেকে আস্তে আস্তে সোনালী হতে থাকে দিনটা। ঘড়িতে ক'টা বাজে,সেটা আর খেয়াল করেনি। ওদের বাইরের ঘরে একটা অজন্তার মিউজিক্যাল ঘড়ি আছে, প্রতি ঘন্টায় সুন্দর বাজনা বাজে ব্যাটারির সার্কিটে। সকাল সাতটায় সাধারণত ঘুম ভাঙে বাবাইয়ের। সাড়ে আটটা থেকে প্রাইভেট টিউশনি শুরু হয়। তারপর দশটা কুড়ি থেকে স্কুল। প্রতিটা পিরিয়ড হয় পঞ্চাশ মিনিটের। চারটে ক্লাসের পর আধঘন্টা ব্রেক, তারপর আবার চারটে ক্লাস। অনেক সময় শেষ ক্লাস টা হয় না, যদি ফিজিক্সের স্বরূপবাবু বা কেমিস্ট্রি র সুজয়বাবুর ক্লাস থাকে, তখন দুজনেই সাধারণত ছুটি দিয়ে দেন প্রাইভেট ক্লাসের জন্যে। স্কুলের অনতিদূরেই সাধনবাবুর বাড়ি। সেখানে একতলায় একটা ছোট ঘরে স্বরূপবাবু আর সুজয়বাবু প্রাইভেট পড়ান। বহু পুরোনোদিনের বাড়ি। তার এক কোণে ভারী কাঠের কড়ি বর্গা বসানো একটা ছোট ঘর, কালো আলকাতরা দিয়ে তার ছাদ, দরজা জানলা রং করা। সিমেন্টের ঠান্ডা মেঝে। আলোআঁধারি একটা অদ্ভুত পরিবেশে বাবাইরা পড়ে, বল, ত্বরণ, ভ্রামক, নি:সঙ্গ ইলেক্ট্রনযুগল। অনেক সময় গরমকালের শেষের দিকে ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নামে, কড়িবর্গার ছাত দিয়ে চুঁয়ে চুঁয়ে জল নেমে আসে। তখন পড়া বন্ধ। বাবাইরা জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখে, অনেক সময় স্যাররাও দেখেন। ঘরের ভেতর মিশকালো অন্ধকার আস্তে আস্তে ছায়ার মতো ঘিরে আসে। সাধনবাবুর বৌ এসে মোমবাতি বা

সূচীপত্র

কাঁচের ল্যাম্প দিয়ে যান। ঠান্ডা হাওয়ার ঝটকায় মাঝে মাঝে সেই মোমবাতি নিভে যায়। বাবাইয়ের খুব ভালো লাগে এরকম একটা ঘর। এরকম ঠান্ডা হাওয়া, সোঁদা মাটির গন্ধ, কনকনে ঠান্ডা সিমেন্টের মেঝে। আর ভালো লাগে শর্মিষ্ঠাকে। শর্মিষ্ঠা তিনটে জায়গায় ওর সাথে একসাথে টিউশন পড়ে। সুজয়, স্বরূপের কাছে কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স আর রতন বাবুর কাছে জীববিজ্ঞান। শর্মিষ্ঠা পড়ে ব্রজবালা স্কুলে। স্কুল ছুটি হওয়ার সাথে সাথে, একটা লাল হিরো সাইকেলে চেপে সাধনবাবুর বাড়ি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়তে চলে আসে শর্মিষ্ঠা। আর শনিবার সকালে কোর্টপাড়ায় রতনবাবুর বাড়িতে বায়োলজি। স্কুলে যাবার সময় লাল পাড় সাদা শাড়ি আর সাদা মোজা, কেডস জুতো, মাথায় লাল ফিতে বাঁধলে শর্মিষ্ঠাকে ভীষণ ভালো লাগে বাবাইয়ের। আর প্রাইভেট পড়তে আসার সময় একটা পিঙ্ক রঙের চুড়িদার পড়লে চোখ ফেরাতে পারে না বাবাই। যদিও পুরোটাই এক তরফা।

সকালে ঘুম ভেঙেই বাবাইয়ের শর্মিষ্ঠার মুখটা মনে পড়ে গেলো। পাশবালিশ জড়িয়ে একটু আদর করল মনে মনে, তারপর উঠে পড়লো বাবাই। আজ শনিবার। একটু বাদেই রাতনবাবুর বাড়ি যেতে হবে। সেখানেই দেখা হবে। মশারি তুলে নেমে জানলার পাশে দাঁড়াল বাবাই। জানলায় হাল্কা গোলাপি রং এর পর্দা। মা গত বছর সেল থেকে কিনেছিল; রেলবাজারের ফুটের একটা দোকানে। পর্দা তুলে বাইরে তাকালো বাবাই। বাগানের জবা গাছে অনেক জবা ফুটে আছে, চারটে এমনি জবার সাথে একটা পঞ্চমুখী জবা গাছ। রতনবাবুর কাছে পড়েছে বাবাই জবা গাছ হলো গুল্ম প্রজাতির। সেই গুল্মের মাঝে দাঁড়িয়ে ঠাম্মা সাজিতে ফুল তুলছে। প্রতিদিন সকালে তোলে।আগে একটা বেতের সাজি ছিল, কয়েকমাস আগে বাবা একটা প্লাস্টিকের লাল রঙের সাজি কিনে এনেছে। সেটাতেই স্থান হচ্ছে হাল্কা গোলাপি আর গাঢ় লাল রঙের জবাফুলের। একটা হাই তুলে কলতলার দিকে এগোলো বাবাই। দেরি করা উচিৎ হবে না; কোর্টপাড়ায় যাওয়ার সময় যদি সাইকেলে মুখোমুখি দেখা হয় শর্মিষ্ঠার সাথে।

পাশের বাড়িতে টেপে সক্কাল সক্কাল কে নীলাঞ্জনা চালিয়েছে। গান গাইতে পারলে শর্মিষ্ঠার নাম দিয়ে একটা গান বানিয়ে গাইত বাবাই।

রাস্তায় নামতেই বিশুর সাথে দেখা। বিশু বাবাইয়ের ভালো বন্ধু, ভালো নাম বিশ্বনাথ ব্যানার্জি। সড়কপাড়ায় বাড়ি। বাবা নামকরা উকিল রানাঘাট কোর্টে। স্কুলের মধ্যে মারপিট, স্কুল পালিয়ে ক্রিকেট, স্কুলের কেমিস্ট্রি ল্যাবে সব কেমিক্যাল মিশিয়ে বিদঘুটে সাবস্টেন্স বানানো থেকে স্কুল বাংক করে মর্নিং শোতে বি গ্রেড সিনেমা দেখা, সবেতেই বাবাইয়ের সাথে থাকে বিশু। বিশু ছাড়াও বাবাইয়ের অনেক বন্ধু আছে, কিন্তু বিশুর সাথে সম্পর্কটা মানিকজোড়ের মতন। দু'বছর আগে বিশুই বাবাইকে প্রথম গোল্ড ফ্লেক খাইয়েছিল, বড়বাজারের মাঠে। একটা গোল্ড ফ্লেকের দাম তখন এক টাকা তেইশ পয়সা। প্রথম ধোঁয়া ভেতরে নিয়ে ইন করতে পারেনি বাবাই। কাশতে কাশতে চোখ লাল হয়ে গেছিল। ওদেরকে ঘিরে মাঠে একটা ছোটোখাটো ভিড় জমে গেছিল। ভয়ানক রেগে বিশু ওকে বোকাচোদা বলে সাইকেল নিয়ে চলে গেছিল। আর এখন বাবাই দিব্যি রিং ছাড়তে পারে। এমনিতেই গোল্ড ফ্লেকে ধোঁয়া একটু বেশি হয়, আর বাবাই আর বিশু এখন এক্সপেরিমেন্ট করছে কী করে ইন করা ধোঁয়ায় রিং ছাড়া যায়।

বিশু বাবাইয়ের সাইকেল এর সামনের চাকায় পা রেখে দাঁড়াল।

-"নিয়েছিস?"

- "কী নেবো?"

- " বললাম না কাল, দেশলাই একটা ঝেড়ে আনিস, আমার কাছে শুধু সিগ্রেট আছে, একটা পয়সাও খুচরো নেই যে দেশলাই কিনব।"

- " দোকান থেকে ধরিয়ে নেব।"

- " মারা, রাতনবাবুর পাড়ায় দাঁড়িয়ে সিগ্রেট ধরাবে, তারপর গার্জেন কল করে তোমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করুক। ওসব হচ্ছে না, পড়ার শেষে নদীর ধারে যাব, সিগ্রেট মেরে ফিরব। দেশলাই নিয়ে নে, যা।"

শর্মিষ্ঠার ব্যাপারটা বিশুও জানে না। পড়ার শেষে, শর্মিষ্ঠা সাইকেল করে ফেরার সময় দুর্গাদাস পার্ক পর্যন্ত অনন্যা আর শতাব্দী ওর সাথে থাকে। তারপর একাই ফেরে। বাবাই ওই দিক দিয়েও বাড়ি ফিরতে পারে, আর ফেরার সময় একলায় ওকে ডেকে কিছু বলার চেষ্টা করতেই পারে, কিন্তু এই বিশুটার জন্যে হয় না। বিশু ওকে বগলদাবা করে নিয়ে যায় কখনো নিচের মাঠে, কখনো ইঁটভাটায়, সিগ্রেট ফুঁকতে। সিগ্রেট খেয়ে একটা ক্লোরোমিন্ট খেয়ে বাড়ি ফেরা। কোনমতে দুটো রুটি আর আলুর তরকারি খেয়ে ক্রিকেট খেলতে যেতে হয় মিলনবাগানের মাঠে। সেখান থেকে ফিরতে ফিরতে একটা। তারপর বিকেলে আবার বিশুর সাথে বড়বাজার মাঠে সিগ্রেট ফুঁকে, যাওয়া হয় শুভ্রর বাড়ি ভিডিও গেম খেলতে। কারেন্ট চলে গেলে ব্রিজ খেলা হয়। বাবাইয়ের সবচেয়ে ভালো লাগে কন্ট্রা। শুভ্রর সাথে একসাথে খেলে অনেকবার ওরা কম্পিউটারকে হারিয়েছে। তবে এটা স্কুল না থাকার রুটিন। স্কুল থাকলে সব বদলে যায়। আজ শনিবার, স্কুল আছে, যদিও হাফ ছুটি। ছুটির পরে চারটে অব্দি স্কুলের মাঠেই ক্রিকেট খেলে ফিরবে বাবাই। অনেক সময় ইচ্ছে করে শর্মিষ্ঠাকে স্কুলের পরে ব্যাপারটা বলার চেষ্টা করবে, কিন্তু ক্রিকেটের নেশা বড়ো খারাপ। এখনো অব্দি বাবাই স্কুল, সেমিনার, পরীক্ষা সবই বাংক করেছে, কিন্তু স্কুল এর শেষে ক্রিকেটটা বাংক করতে পারেনি।

ব্যাজার মুখ করে বাবাই আবার বাড়ি ঢুকল। রান্নাঘর থেকে কৌশলে একটা দেশলাই হাতাতে হবে।

আজ বায়োলজি ক্লাসে মন বসছিল না বাবাইয়ের। শর্মিষ্ঠা আজ যেন একটু বেশি সেজে এসেছে; একটা সবুজ রঙের টপ

আর সাদা লং স্কার্ট, কানে ঝোলা দুল, ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। পর্দা সরিয়ে পড়ার ঘরে ঢোকার সময় ওর দিকে তাকিয়েই বাবাই বুঝতে পারল, হৃৎস্পন্দন কয়েক সেকেন্ডের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল। প্রায় দশ সেকেন্ড ওর দিকে তাকিয়েছিলো বাবাই। তারপর শর্মিষ্ঠাও ওর দিকে তাকালো, চোখে চোখ। অন্য দিন হলে বাবাই চট করে নজর ঘুরিয়ে নিত, বুঝতেই দিতো না যে, ব্যাপারটা আর ঝাড়ির পর্যায়ে নেই। কিন্তু আজ বাবাই চোখ ফেরাতে পারছিল না। দু'জনে বোধহয় আরো দশ সেকেন্ড তাকিয়েছিল, পরস্পরের দিকে। রাতনবাবু ঘরে ঢুকতেই তালটা কাটল। ছোট্ট একটা হাসি শর্মিষ্ঠার ঠোঁটের কোণে এসে মিলিয়ে গেল যেন, চোখ সরিয়ে নিল বাবাই। ঠিক দেখেছে তো? ওকে দেখে হাসলো শর্মিষ্ঠা, বুঝতে পেরেছে কি? বুঝলে তো ভালোই, এরকম দিনের পর দিন বুকে চেপে রাখা সহজ না। চোখ নামিয়ে খাতার উপর পেন দিয়ে ঘষছিল বাবাই. একদম অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্রের মতন রতন বাবুর প্রশ্ন সেই দু:খবিলাসিতাকে ক্ষণিকে ভেঙে চুরমার করে দিল - " শুভদীপ, সেরুমেন কাকে বলে?" বাবাইয়ের ভালো নাম শুভদীপ।

বাবাইদের স্কুল হল পালচৌধুরী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। স্থাপিত ১৮৫৩। সিপাহী বিদ্রোহের আগে স্থাপিত এই স্কুলে একসময় রবীন্দ্রনাথ আর নবীনচন্দ্র সেন এর পায়ের ধুলো পড়েছে। স্কুলের পাশেই বয়ে চলেছে চূর্ণী নদী। চূর্ণীর ধারে, স্কুলের গেটের বাইরে একটা রিক্সা স্ট্যান্ড, কিছু চা এর দোকান, আর আছে কিছু আলুকাবলি, চাটনি, আইসক্রিম, পেপসির দোকান। পেপসি মানে থাম্বস আপ, কোকাকোলা, পেপসি না; প্লাস্টিক এর লম্বা প্যাকেটে ভরা বিভিন্ন রং ও স্বাদ এর পানীয়। স্কুল এর তিনটে বিল্ডিং আর অফিসঘরের একটা আলাদা বিল্ডিং। অফিসঘরের সামনে একটা ছোট শহীদবেদি, আর তার সামনেই জাতীয় সংগীত আর শপথ গেয়ে স্কুল শুরু হয়। ডানদিকের কলেজ বিল্ডিং এর কোণ। মাঠের পাশে গ্যালারি ঘরে বাবাইদের ক্লাস হয়।এই ঘরের সুবিধা অনেক; ঘরের পাশেই স্কুলের মাঠ। কোনদিন কোন স্যার না এলে ছোট করে মাঠে নেমে ক্রিকেট

শুরু করে দেওয়া যায়। অফিসঘর থেকে মাঠের মাঝে একটা বিল্ডিং আছে, তাই হেডস্যার বা অন্য টিচাররা সরাসরি দেখতে পান না ক্লাসের সময় কেউ মাঠে খেলছে কিনা। আবার ঘরে গ্যালারির মতো স্টেপ আছে, যার উপর বেঞ্চ রাখা। এক বেঞ্চে ৫ থেকে ৬ জন করে বসতে পারে। বাবাই, বিশুরা সবসময় পেছনের বেঞ্চ দখল করে, কারণ হেডস্যারের বোরিং অংকের ক্লাসের সময় পেছনের বেঞ্চ এর পাশের জানলা দিয়ে আস্তে করে, বাইরে বেরিয়ে পালাতে পারে। ক্লাসের পাশেই স্কুলের একটা গেট, যেটার কোলাপ্সিবল গেটটা সবসময় তালা মেরে বন্ধ করা থাকে। কিন্তু তাতে দমবার পাত্র বাবাইরা নয়। পাশের ভাঙা পাঁচিলের উপর দিয়ে সাইকেল নিয়েই ওরা স্কুল পালায়। একজন দেওয়ালের একদিক থেকে সাইকেল তুলে অন্যপাশে নামিয়ে দেয়, আর পাঁচিলের ওদিকে থেকে আরেকজন সাইকেল নিয়ে রাস্তায় রাখে। তারপর সেখানে থেকে চিলড্রেন্স পার্কের মাঠ আর সেখানে লেদার বলে ক্রিকেট। অনেকসময় বৃষ্টি নামলে বাবাই আর বিশু চলে যায় বড়বাজারের মাঠে। সেখানে ঘাটের ধারে বসে সিগ্রেট খেতে খেতে নদীতে বৃষ্টি দেখে। নদীতে বৃষ্টি পড়লে বাবাইয়ের মনে হয় একটা জলের মাদুর, আর ওপারের ঝাপসা গাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উদাস হয়ে পড়ে।

আজও স্কুলের জানলা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে পড়েছিল বাবাই। বাইরে চড়া রোদ, স্কুলের মাঠে কোন ঘাস নেই, শক্ত এঁটেল মাটি। বাউন্ডারি ওয়ালের পাশে অনেক ফণীমনসার গাছ আছে, আর আছে ধুতরো গাছ। ধুতরো গাছে, গোল গোল কাঁটাওয়ালা ফল হয়। সেই ফল, হাত মুঠো করে, মুঠোর উল্টোদিকে জোরে মেরে হাত ঘোরালে চামড়া ফুটো হয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত বেরিয়ে আসে, সেটার প্যাটার্নটা দেখতে ভারী অদ্ভুত হয়। বিশু এটা শিখিয়েছে ওকে। প্রথমদিন ভয় পেয়েছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে ব্যাথাটা সহ্য হয়ে গেছে। মাঠের বাঁ দিকে আছে বাথরুম ঘর আর তার পাশে লাল্টুদা বায়োলজি ল্যাবের ডিসেকশন করা ব্যাঙগুলোকে ফেলে। পচে গিয়ে মাঝে মাঝে

বিকট গন্ধ বেরোয়। তবে ওদের ক্লাস থেকে অনেক দূরে, তাই গন্ধ টা আসেনা।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে উদাস হয়ে অনেক কিছু ভাবছিলো বাবাই, তখনই গোলযোগটা কানে এল। বিশুকে ঘিরে ধরেছে ক্লাসের সব ছেলে, কিছু একটা হয়েছে। বাবাই উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করল, বিশু, মাথা বেঞ্চে ডুবিয়ে বসে আছে আর ফিক ফিক করে হাসছে। সব ছেলেপিলে ওকে ঘিরে ধরে কী নিয়ে খুব হাসাহাসি করছে. বাবাই পঙ্কজকে ডেকে জিজ্ঞেস করল,

-"এই কী হয়েছে রে?"

-"জানিস না? গান্ডু টা ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল, এক্কেবারে হাতেনাতে ধরা পড়েছে এইবার।"

"কী বলছিস, ডিটেল এ বল না!"

-"শর্মিষ্ঠা কে চিনিস তো? তোদের সাথেই তো পড়ে, বিশুবাবু লুকিয়ে তার সাথে প্রেম করছেন।"

বাবাই এর বুকটা হঠাৎ করে খালি হয়ে গেল। কী বলছে এরা!

-"হ্যাহ, কী বলছিস! আমি জানতাম না?"

-"তুমি বাল কিছুই জানো না। বেঞ্চে পেন দিয়ে শর্মিষ্ঠার নাম লিখছিল মালটা, তখনি ধরেছে বিপ্লব। একটু চেপে ধরতেই নতুন বৌ এর মতো লজ্জা! দেখ না, ওর ব্যাগ থেকে একটা বার্থডে কার্ড ও বেরিয়েছে। তাতে লেখা ফ্রম শর্মিষ্ঠা টু বিশ্বনাথ উয়িথ লাভ। পুরো পেকে যাওয়া কেস মাইরি। তোরই তো বেস্ট ফ্রেন্ড, দেখ, তোকে ও জানায়নি! তলেতলে কতদূর গেছে কে জানে?"

সরে এল বাবাই। ক্লাসের সব ছেলে বিশুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওকে কেউ আর খেয়াল করছে না। গ্যালারি ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল বাবাই। বাইরে চড়া রোদটা কেটে গিয়ে মেঘ করছে, আকাশের দিকে তাকালো বাবাই। দক্ষিন দিক

থেকে একটা বিরাট কালো মেঘ আস্তে আস্তে সারা আকাশকে ঢাকার তাল করছে। মাধ্যমিকের সময় পড়েছিল বাবাই, এই মেঘ হলো কিউমুলোনিম্বাস মেঘ, এতে বৃষ্টি হয়। কিছুক্ষন মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকল বাবাই। ওর চোখের সামনে এখন মেঘ, আকাশ, ফণীমনসা, শর্মিষ্ঠার চোখ, সবুজ টপ, কানের দুল, লাল সাইকেল সব একসাথে মিশে যাচ্ছে...হ্যান্ডমেড পেপারে জলরং দিলে যেমন সারা কাগজে ছড়িয়ে পড়ে, সেইরকমই। সাইকেল স্ট্যান্ড থেকে সাইকেলটা নিয়ে একাই পাঁচিল টপকাল, আজ একাই ভালো লাগছে বাবাইয়ের। একটু কাঁদতে পারলে হয়তো ভালো হতো.....

সাইকেল নিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়েতে উঠে পড়ল বাবাই। এই রাস্তা সোজা যায় হবিবপুর। চূর্ণী পেরিয়ে, হাইওয়ের দু'ধারের গাছের সারি পেরিয়ে, রাস্তা সোজা চলে গেছে। মাঝে মাঝে দু একটা ট্রাক, ম্যাটাডোর, ভ্যান রিক্সা যায়, কিছু মানুষ হেঁটে যায়... বাবাই জানে না তারা কে, কোথায় যাচ্ছে। সাইকেল করে যেতে যেতেই বৃষ্টি নামল, আকাশ ভেঙে যাওয়া ধুম বৃষ্টি। বাবাইয়ের চশমার কাঁচ ধোঁয়া হয়ে গেছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সাইকেল থামিয়ে নামল বাবাই। রাস্তার ধারে একটা মেঠো পথ নেমে গেছে ক্ষেতের মধ্যে। দূরে আল এর পাশে একটা পুকুর আছে। আল ধরে সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে পুকুরপাড়ে বসল বাবাই। বৃষ্টি পুরোদমে চলছে। বাবাইয়ের জামাকাপড়, ব্যাগ সব ভিজে চুপ্পুস, ভেতরের বইখাতাও বোধয় ভিজে গেছে পুরো। পুকুরের জলের দিকে তাকাল বাবাই, বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে পড়ে জলটা দেখতে ঠিক মাদুরের মতো লাগছে। অজানা ক্ষেতের অচেনা পুকুরপাড়ে বৃষ্টির মধ্যে বসে একটা ছেলে জলের মাদুর দেখতে থাকল...

অটলপাথর

স্বকৃত নোমান

কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক শ্রী অতনু ভট্টাচার্য বাংলাদেশে এসেছেন মূলত একটি গবেষণার কাজে। বছর দেড়েক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ফ্যাকাল্টির পুরনো একটি কাঠের আলমিরায় একটি ডায়েরি খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। বহু বছরের অব্যবহৃত আলমিরা। ফ্যাকাল্টির দ্বিতীয় তলার সিঁড়ির কোণায় কে কবে আলমিরাটি রেখেছিল কেউ জানে না। দরজার কড়ায় জংয়েধরা তালাটির চাবি কার কাছে তারও কোনো হদিস নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি দপ্তরে চাবিটির খোঁজ করেছেন অতনুবাবু। কারো কাছে নেই। কোথায় আছে, তাও কেউ বলতে পারেনি। নিতান্ত কৌতূহলের বশে তালাচাবির মিস্ত্রি ডেকে তালাটি তিনি ভেঙে ফেললেন।

তিন তাকের আলমিরা। ধুলায় আকীর্ণ। উপরের তাকে একটি তোয়ালে, মাঝের তাকে শেক্সপিয়রের নাটকের বই টাইটাস অ্যান্ড্রোনিকাস এবং চামড়ার মলাটের একটি ডায়েরি ছাড়া আর কিছু নেই। ধুলো ঝেড়ে বই ও ডায়েরিটা নামিয়ে নিলেন তিনি। ডায়েরিটা বৃটিশ আমলের। ১২৮ পাতার। মলাটটা ধুলো-ময়লায় বিবর্ণ। প্রথম ১২ পাতায় ইংরেজি হস্তলিপি, বাকি পাতাগুলো খালি। প্রথম পাতায় দার্জিলিং ভ্রমণের টুকরো বর্ণনা। নিচে লেখকের নাম-কেভিন ব্রেনান। বাকি ১১ পাতার কোথাও লেখকের নাম না থাকলেও ধরেই নেওয়া যায় ডায়েরিটি কেভিন ব্রেনানেরই। ৭ নম্বর পাতায় কেভিন ব্রেনান লিখেছেন একটি হত্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ১৭৮৩ সালের ২২ অক্টোবর বিকেলে পূর্ববাংলার শ্রীহট্টের কোনো এক হাড়িয়াগড়ে রমেন্দ্র নারায়ণ ও

নিখিল প্রহ্লাদ নামের দুই সন্ন্যাসীকে তিনি বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে একটা শিরীষগাছের তলায় ফেলে রাখেন। দুই সন্ন্যাসীর চেহারা ও বসনের বর্ণনাও দেন সংক্ষেপে। গুলি করার আগে কীভাবে তারা নির্বিকার দাঁড়িয়েছিল সেকথাও লিখেছেন। কিন্তু তাদের বাড়ি কোথায়, কী অভিযোগে তাদের হত্যা করা হয়েছিল, হাড়িয়াগড় জায়গাটা শ্রীহট্টের কোথায়, মি. কেভিন সেখানে কেন গিয়েছিলেন-এসবের কিছুই উল্লেখ নেই।

অধ্যাপক অতনু ভট্টাচার্যের কৌতূহল এখানেই। মি. কেভিন যখন দুই সন্ন্যাসীকে হত্যা করেন, বাংলার পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে তখন ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ চলছে। সংঘাত তুমুল আকারণ ধারণ করে বাংলাদেশের নাটোর ও রংপুর অঞ্চলে। শ্রীহট্ট অঞ্চলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কথা ইতিহাসে নেই। অন্তত অতনুবাবু কোথাও পাননি। তাহলে মি. কেভিন শ্রীহট্টের হাড়িয়াগড়ে দুই সন্ন্যাসীকে কেন হত্যা করেছিলেন? বিদ্রোহের অভিযোগে, না অন্য কোনো কারণে? বিদ্রোহের অভিযোগ ছাড়া একসঙ্গে দুই সন্ন্যাসীকে কেনই-বা হত্যা করলেন? তবে কি শ্রীহট্ট অঞ্চলেও ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল?

ইতিহাসের অনুল্লেখিত বিষয়গুলো নিয়েই অধ্যাপক অতনু ভট্টাচার্যের গবেষণা। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার সূত্রপাত বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে কলকাতার বোদ্ধামহলে রীতিমতো তিনি বিতর্কের ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। প্রমাণ করেছেন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষের চারা বৃটিশদের হাতে রোপিত হয়নি, হয়েছিল মুঘলসম্রাট আওরঙ্গজেবের হাতে। কীভাবে আওরঙ্গজেব এই বিষবৃক্ষের চারা রোপন করেছিলেন, বৃটিশরা কীভাবে চারাটির গোড়ায় জল ঢেলে বৃক্ষে রূপান্তরিত করেছিল, যুক্তি-প্রমাণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

উদ্ধারকৃত ডায়েরিতে শ্রীহট্টের হাড়িয়াগড়ে কেভিন ব্রেনান কর্তৃক দুই সন্ন্যাসী হত্যাকাণ্ডের নোটে তিনি ইতিহাসের অনুল্লেখিত অধ্যায়ের গন্ধ পেলেন। শুরু হল তার অনুসন্ধান। নানা মাধ্যমে

জানার চেষ্টা করলেন, তৎকালীন শ্রীহট্ট তথা বর্তমান সিলেটের ইতিহাস। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিলেটের ইতিহাস বিষয়ক একাধিক বই সংগ্রহ করলেন। কোথাও ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা হাড়িয়াগড় গ্রাম বা দুই সন্ন্যাসী হত্যার কথা খুঁজে পেলেন না। কিন্তু তার কৌতূহল অদম্য। সরেজমিনে এসে ঘটনাটা অনুসন্ধান না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

রবিউল মোরশেদ ছাড়া ঢাকায় তার বিশেষ পরিচিত কেউ নেই। রবিউলের সঙ্গে পরিচয় ফেসবুকে। প্রায় পাঁচ বছরের ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডশিপ। অতনুবাবু ফেসবুকে যে স্ট্যাটাসই দেন, রবিউলের চোখে পড়লে লাইক ও কমেন্ট না দিয়ে যায় না। ইনবক্সে চ্যাটিংও হয় মাঝেমধ্যে। তিস্তার পানি চুক্তি, মুসলিম মৌলবাদীদের প্রতি মমতা ব্যানার্জির গোপন সমর্থন, গরু নিয়ে হিন্দু মৌলবাদীদের বাড়াবাড়ি, দুই বাংলার ভবিষ্যত ইত্যাদি বিষয়ে কথা হয়। রবিউল একবার বলেছিল, "বাংলাদেশে এসে একবার ঘুরে যান, দাদা।" অতনুবাবু বলেছিলেন, "হ্যাঁ, একটাই তো দেশ ছিল একসময়। আমার জন্ম কলকাতায় হলেও দাদাবাড়ি ছিল বরিশাল। যাওয়ার ইচ্ছে আছে একবার। হুট করে চলে যাব একদিন।"

হুট করেই চলে এলেন অতনুবাবু। মৈত্রী এক্সপ্রেসে চড়ে সোজা ঢাকায়। আট দিনের ভ্রমণে। ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে নেমে একটা প্রি-পেইড সিমকার্ড কিনে ফেসবুক সাইন ইন করে ইনবক্স করলেন রবিউলকে, মোবাইল নম্বরটা দিয়ে তার বাংলাদেশে আসার খবরটা জানালেন। সঙ্গে সঙ্গেই রবিউলের ফোন- "কী আশ্চর্য! আপনি ঢাকায়? আগে জানালেন না কেন?"

ফার্মগেট এসে অতনুবাবুর সঙ্গে দেখা করল রবিউল এবং পল্টনের একটি আবাসিক হোটেলে তাকে উঠিয়ে দিল। পরদিন সকাল সাতটায় পারাবাত এক্সপ্রেসে চড়ে দু'জন রওনা হয়ে গেল সিলেটের উদ্দেশে। কলেজের চাকরি রবিউলের। কলেজ তখন বন্ধ ছিল, নইলে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব হতো না। সিলেট শহরে তারা

দুদিন থাকল। স্থানীয় সাংবাদিক, কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেখা করল, আলাপ করল, কিন্তু কেউ হাড়িয়াগড় গ্রামের সন্ধান দিতে পারল না। জেলাপ্রশাসকের দপ্তরে গিয়ে সিলেট বিভাগের মানচিত্র ঘাঁটাঘাটি করল, তবু হদিস মিলল না। তৃতীয় দিন চলে গেল সুনামগঞ্জ। কেননা সুনামগঞ্জ তো সিলেট বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত, হাড়িয়াগড় নামে কোনো গ্রাম থাকতেও তো পারে সেখানে। কিন্তু না, হাড়িয়াগড়ের সন্ধান দিতে পারল না কেউ। সুরমা নদীতে নৌভ্রমণ করে, মরমী সাধক হাছন রাজার বাড়িঘর দেখে সন্ধ্যায় আবার ফিরে এল সিলেট শহরে। রবিউল বলল, "সিলেট যখন আসাই হলো, আরো একটা দিন থেকে জাফলং দেখে যাই। এখন তো বর্ষাকাল। বর্ষার জাফলং দেখে আপনি মুগ্ধ হবেন।" অতনুবাবু অমত করলেন না। পরদিন ভোরে একটা সিএনজি অটোরিকশা ভাড়া করে দু'জন চলে গেল জাফলং, মুগ্ধতা নিয়ে ফিরল সন্ধ্যায়। রাতে অতনুবাবু জানতে চাইলেন, "আচ্ছা এখানে মৌলভীবাজারটা কোথায়?"

রবিউল বলল, "সে তো অন্য জেলা। বহুদূর।"

-"মৌলভীবাজার তো সিলেট বিভাগেরই একটি জেলা, তাই না?"

-"তা বটে। সিলেট তো অনেক বড় বিভাগ।"

-"চলুন মৌলভীবাজার যাই।"

-"হাড়িয়াগড় কি খুঁজে পাবেন ওখানে? মনে তো হচ্ছে না। তারচেয়ে বরং শ্রীমঙ্গল যাই।"

-"শ্রীমঙ্গল! বাহ, নামটা তো বেশ! কী আছে ওখানে?"

-"কী নেই তাই বলুন। মৌলভীবাজারের সবচেয়ে বিখ্যাত একটি স্থান শ্রীমঙ্গল। পাহাড় ও ঘন বনাঞ্চল থাকায় দেশের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত ও শীত পড়ে ওখানে। রয়েছে প্রায় ৩৮টি চা বাগান। ইস্পানি, ফিনলের মতো বিখ্যাত সব চা বাগান তো ওখানেই। রয়েছে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, বাইক্কা বিল।

পার্শ্ববর্তী উপজেলা কমলগঞ্জে আছে ন্যালশনাল টি গার্ডেন, মাধবপুর লেক, হামহাম ঝর্ণা। সবুজ কাকে বলে শ্রীমঙ্গল গেলে বোঝা যায়। এমন সুন্দর জায়গা বাংলাদেশে খুব কমই আছে।"

রবিউলের বর্ণনা শুনে শ্রীমঙ্গল ভ্রমণে আগ্রহী হয়ে উঠলেন অতনুবাবু। তিনি ধরেই নিয়েছেন হাড়িয়াগড় গ্রাম খুঁজে পাবেন না। কত বিশাল সিলেট বিভাগ! সিলেটের কোন জেলার কোন উপজেলার কোন ইউনিয়নে হাড়িয়াগড় গ্রাম-খুঁজে বের করা আসলেই জটিল। এই নামে কোনো গ্রাম আদৌ আছে কিনা সন্দেহ। কালে কালে তো জনপদের নাম পরিবর্তন হয়। অন্তত বাংলাদেশে হয়। কৃষ্ণনগর হয়ে যায় রসুলপুর, রামগঞ্জ হয়ে যায় নবীগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে যায় বি-বাড়িয়া। হাড়িয়াগড় যে রহিমগড় হয়ে যায়নি তা কে বলবে। তবে সিলেটে যেহেতু এলেনই, শ্রীমঙ্গল এত সুন্দর জায়গা, না দেখে ফিরবেন কেন? জীবনে কি আর কখনো বাংলাদেশে আসা হবে? বয়স তো কম হয়নি। পঞ্চান্ন ছুঁই ছুঁই। কদিনই'বা আর বাঁচবেন। রবিউল তার এক বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করে শ্রীমঙ্গলে একটা কটেজ বুকিং দিয়ে দিল। বিকাশ করে পাঠিয়ে দিল এক হাজার টাকা। নিসর্গ নীরব কটেজ। শ্রীমঙ্গল উপজেলা সদর থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে, হোটেল গ্রান্ড সুলতানের পাশে। শনের ছাউনি, বাঁশের বেড়া-একেবারে গ্রামীণ পরিবেশ। ভাড়া পঁচিশ'শ টাকা প্রতিদিন।

শ্রীমঙ্গল স্টেশন থেকেই আজিজ লোকটা তাদের পিছু লাগল। সিএনজি অটোরিকশা ড্রাইভার। মধ্যবয়সী। মুখে সাদাকালো চাপদাড়ি। সারাক্ষণ পান চিবায় আর কতক্ষণ পর পর বিড়ি ধরায়। গায়ে পড়ে আলাপী ধরনের মানুষ। স্টেশন থেকে নিসর্গ নীরব কটেজের ভাড়া দেড়'শ টাকা। দুই'শ টাকা চেয়েছিল আজিজ, রবিউল এক'শ কুড়ি টাকা বলতেই রাজি হয়ে গেল। কটেজে পৌঁছে সে অতনুবাবুকে বলল, "আজই তো আর বারইতা নায় স্যার, নায়নি?"

উত্তর দিল রবিউল, "সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আজ আর কোথায় যাব! কেন বলুন তো?"

-"আফনারার গাড়ি লাগত নায়নি?"

-"গাড়ি কেন?"

-"ঘুরতা নায়নি আফনারা? কততা দেখার আছে শ্রীমঙ্গলো।"

-"ঘুরব তো বটেই।"

-"গাড়ি লাগলে আমারে ডাখবা। আফনার নম্বরটা দেইন।"

-"বরং আপনার নম্বরটাই দিন, দরকার হলে আমি ফোন দেব।"

পরদিন সকালে লাউছড়া উদ্যান দেখে মাধবপুর লেক দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তারা। কটেজের ম্যানেজার একটা অটোরিকশার ড্রাইভারের সঙ্গে ফোনে কথা বলল। আট'শ টাকা ভাড়া চাইল ড্রাইভার। রবিউল ফোন দিল আজিজকে। লোকটা অনুরোধ করেছে, দেখা যাক কত টাকা চায়। আজিজ বলল, "স্যার শ্রীমঙ্গলো দেখার বহুত্তা আছে। সারাদিনোর লাগি আমারে নেইনগি। ইচ্ছামতো ঘুরবা।"

-"কত দিতে হবে আপনাকে?"

-"দেইন যে স্যার।"

-"বলুন না কত?"

-"গ্যাস পাঁশ'শ, মা'জনর পাঁশ'শ আর আমার রোজ চাইর'শ। মোট ছউদ্দ'শ টেখা দিবা স্যার।"

-"অনেক বেশি। বারো'শ হলে আসতে পারেন।"

"দুই এখ'শ কুনো বিষয় না স্যার। আমি আইয়ার, আফনারা রেডি অউক্কা।"

সারাদিনই ঘোরাল বটে আজিজ। সকাল ন'টায় যাত্রা শুরু।

প্রথমে লাউয়াছড়া ফরেস্ট, তারপর কমলগঞ্জের ন্যাশনাল টি গার্ডেন, মাধবপুর লেক। ওখান থেকে গৌরাঙ্গ বৈদ্যের বিখ্যাত সাত রংয়ের চায়ের দোকানে আসতে আসতে বেলা দেড়টা। শহরের এক হোটেলে দুপুরের লাঞ্চ সেরে বাইক্কা বিলের উদ্দেশে রওনা। বিল দেখেটেখে আবার যখন শহরের উদ্দেশে যাত্রা করল, তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। শহরে ঢোকার আগে আজিজ বলল, "সব তো দেখলা স্যার, এখটা জাগা বাকি থাকি গেল।"

-"কোথায় সেটা?" জানতে চাইল রবিউল।

-"তের নম্বর গরমটিলা।"

-"গরমটিলা কি পাহাড়ের নাম?"

-"জিঅয় স্যার।"

-"কী আছে সেখানে?"

-"পীরের আস্তানা।"

পীর-দরবেশদের মাজারের প্রতি রবিউলের বিশেষ আগ্রহ। দেশে যেভাবে গোঁড়া সালাফিজমের বিস্তার ঘটছে, সে মনে করে, সালাফিদের মোকাবেলার অন্যতম উপায় হতে পারে মাজার-সংস্কৃতি। পীর-দরবেশদের মাজারে কোন ভেদাভেদ নেই, হিন্দু-মুসলিম-খৃস্টান সবার জন্য উন্মুক্ত। মাজারভক্তরা সাধারণত ধর্মোন্মাদ হয় না। তারা তুলনামূলক সহনশীল। সব ধর্মের প্রতি সহনশীল মনোভাব তাদের বিশেষ গুণ। সে বলল, "চলুন, গরমটিলার মাজার দেখে যাই।"

একটা সরু রাস্তায় গাড়ি ঢুকিয়ে দিল আজিজ। প্রায় দশ মিনিট পর একটা রাবার বাগানের সামনে থামাল। পাকা রাস্তা থেকে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে পুব দিকে। রাস্তার মাথায় একটা সাইনবোর্ড। তাতে লেখা-

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মগাছড়া ১৩ নং গরমটিলা

ওলি-আওলিয়াগণের আস্তানা

মোবাইল: ০১৭৩৪০০৩১৭

আস্তানা কমিটি।'

আজিজ তো গায়েপড়া আলাপী, গরমটিলার নাম কেন গরমটিলা তাকে জিজ্ঞেস করতে হল না। গাড়িটা পাকা রাস্তার একপাশে দাঁড় করিয়ে, দুই প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে কাঁচা রাস্তা ধরে হাঁটতে গরমটিলার বিস্তারিত বর্ণনা দিতে শুরু করে। তখনো তার জন্ম হয়নি, তার বাবা তখনো নাবালক, মগাছড়া গ্রামের আবদুল বাতেন একদিন লাকড়ি কাটতে এসে টিলার মাথায় মাঝারি সাইজের একটা পাথর দেখতে পায়। মাটির নিচে অর্ধেক দেবে আছে। পাথরটার উপর কু-লি পাকিয়ে ফণা ধরে বসে আছে মস্ত এক গোখরো। ফণায় বিচিত্র কারুকাজ। বিচিত্র রং ধারণ করেছে সূর্যকিরণে। এত বড় গোখরো জীবনে কখনো দেখেনি বাতেন। যুগপৎ ভয় ও মুগ্ধতায় সে সাপটির দিকে তাকিয়ে থাকে। হঠাৎ তার চোখে বালি কি ঝরাপাতার কণা পড়লে পরে খানিকের জন্য চোখ বন্ধ করে। চোখ খুলে সাপটিকে আর দেখতে পায় না। এ কী আজব কান্ড! চোখের পলকে এত বড় একটা সাপ হাওয়া হয়ে গেল!

বাতেন ছিল সাহসী। নিশিরাতে বন-বাদাড়ে একাকী ঘুরে বেড়াত, খালে-বিলে একাকী মাছ ধরত। একটা শুকনো লাঠি কুড়িয়ে বুকভরা সাহস নিয়ে সে পাথরটির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়। সাপটিকে দেখতে পায় না। ঘুরে খানিকটা পুবে গিয়ে দেখে, পাথরটির পেছনে মানুষের মাথার দুটি খুলি সামনে নিয়ে ফণা তুলে ফোঁস-ফোঁস করছে সাপটি। কেঁপে উঠল বাতেন। দরদর করে ঘামতে শুরু করল। তখন হেমন্তকাল। শীত জেঁকে বসতে বেশি দেরি নেই। অথচ বাতেনের মনে হলো তার গায়ে কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। চামড়া ঝলসে যাওয়ার মতো

অবস্থা। মাথার ঘাম দরদর করে পায়ে নামছে। ভয় ও গরমে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে দ্রুত সে টিলা থেকে নেমে বাড়ি ফিরে যায়।

রাতে প্রচন্ড জ্বর ওঠে বাতেনের গায়ে। জ্বরের ঘোরে সে আবোল-তাবোল বকে আর খানিক পর পর 'গরমটিলা গরমটিলা' বলে হাঁক মারে। সিথানে বসে তার বাঁজা বউ মাথায় পানি ঢালে। সে ভেবে পায় না গরমটিলা কথাটা কোত্থেকে পেল তার স্বামী। মগাছড়ায় তো এই নামের কোনো টিলা নেই। শেষরাতে জ্বরের ঘোরে 'গরমটিলা গরমটিলা' বলতে বলতে বাতেন ঘন ঘন হাঁক মারতে শুরু করলে তার বউ হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। নিশ্চয়ই জিনে আছর করেছে। নইলে এমন করবে কেন লোকটা! কপালে হাত দিয়ে সে জানতে চায়, "কিতা অইছে আফনার?"

"গরমটিলা গরমটিলা!" বাতেন হাঁক মারতে থাকে। নিশ্চয়ই পীর-আওলিয়ার কবর ছিল। নইলে খুলি এলো কোত্থেকে? নিশ্চয়ই তারা গরম পীর। নইলে আমার গায়ে আগুন লাগল কেন? সে কী গরম! মাথার মগজ বলকাতে শুরু করল। গরমটিলা গরমটিলা!

সকালে জ্বর পড়ে গেল বাতেনের। দুপুরে পেট ভরে খেয়ে আর বসে থাকতে পারে না, একটা ছেনি হাতে চলে যায় টিলার উপর। পাথরটার কাছে গিয়ে সে তো অবাক। সাপও নেই, খুলিও নেই। সাদা ফুলে ঢেকে আছে পাথরটা। একরাতে এত ফুল এল কোত্থেকে, সে ভেবে পায় না। উপরে তাকিয়ে দেখে একটা অচেনা গাছে ধরে আছে থোকা থোকা সাদা ফুল। টুপ করে একটা ফুল তার মুখের উপর পড়ে। ফুলটা হাতে নিয়ে সে নেড়েচেড়ে দেখে। অচেনা ফুল। গাছটিও অচেনা। সব আজগুবি কান্ডকারখানা। এখানে যে পীর-আওয়ালিয়ার কবর, তার আর সন্দেহ থাকে না। তার বুক ফেটে কান্না আসে। হাঁটুগেড়ে নামাজের ভঙ্গিতে বসে হাত তুলে সে মোনাজাত ধরে- "হে দয়াল বাবা, হে কেরামতের ভান্ডারি, আমি নিঃসন্তান। এখটা বাইচ্চার লাগি আমার বউর বুকটা মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করের। আর কিচ্ছু চাই না আমি,

খালি এখটা বাইচ্চা চাই। দয়া খরইন, আমারে দয়া খরইন।"

সে'রাতে বাতেনের যৌবনগাঙে ভরাকাটালের জোয়ার আসে। আশ্লেষে, চুম্বনে বউকে সে অস্থির করে তোলে। বউ তো বটেই, নিজের মর্দামির এমন তাকত দেখে বাতেন নিজেই অবাক হয়। কখনোই সে দু-মিনিটের বেশি থাকতে পারে না। চড়াই পাখির মতো উঠে আর নামে। সে-রাতে দীর্ঘক্ষণ মেতে থাকল এবং বউকেও মাতিয়ে রাখল।

বাতেন ভাবতেই পারেনি সে'রাতে গরমটিলার দুই গরম পীরের কেরামতিতেই যে তার যৌবনগাঙে জোয়ার এসেছিল। টের পেল প্রায় তিন মাস পর, যেদিন তার বউ বলল, "আমার তলপেটে কিতা খালি লড়ের।" বাতেন তো খুশিতে ডগমগো। নিশ্চয় সন্তান এসেছে তার বউয়ের পেটে। সহসা তার মনে পড়ে যায় সে-রাতের কথা, যে-রাতে বউকে সে জীবনে প্রথমবারের মতো পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়েছিল। আর কি দেরি করে বাতেন! সকালে গাভীটার দুধ দুইয়ে রেখেছিল। দুই সের। দুধের পাতিলটা নিয়ে রওনা হয়ে যায় গরমটিলার উদ্দেশে। পাতিলের সব দুধ দিয়ে পাথরটাকে ধুয়ে দেয়, চুমু খায়, হাত তুলে শুকরিয়া আদায় করে।

গ্রামে হামাগুড়ি দিতে লাগল গরমটিলার গরম পীরের কেরামতির খবর। নিশ্চয়ই পাথরটার নিচে পীর-আওলিয়াদের আস্তানা রয়েছে। নইলে কী করে পূরণ হল, বাতেনের মনের বাসনা? মোমবাতি, আগরবাতি, গোলাপজল আর ঘটিভরা দুধ নিয়ে রওনা হয়ে গেল গ্রামের নারী-পুরুষ। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান নির্বিশেষে। সপ্তাহের মাথায় গরমটিলার গরম খবর দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে মানুষ আসতে থাকে। দুধ দিয়ে পাথরটাকে গোসল করায়, পাথরটার পাশে ডুমুরগাছটাতে মানতের সুতা বাঁধে, পরম ভক্তিতে পাথরটা ছুঁয়ে মনের যত বসনা আছে সব ব্যক্ত করে।

"ভেরি ইন্টারেস্টিং!" বললেন অধ্যাপক অতনু ভট্টাচার্য।

রবিউল বলল, “ইন্টারেস্টিং বটে। গ্রাম বাংলায় এমন গল্প আমি আর শুনিনি।”

আজিজ বলল, “গল্প নায় স্যার, হাছা ঘটনা।”

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে। চরাচরে আলো-আঁধারির খেলা। গরমপীরের আস্তানার সামনে এসে দাঁড়াল তিনজন। একপাশে একটা টিনের ঘর। খাদেমখানা। তারই পাশে মস্ত একটা পাথর। চারদিকে সিমেন্টের হাঁটুসমান দেওয়াল। পাথরটার উত্তরপাশে পাশাপাশি দুটো ডুমুরগাছ। ছোট গাছটির ডালে ডালে নানা রংয়ের সুতো বাঁধা। ছাল-বাকল কিছু দেখা যাচ্ছে না সুতার কারণে। একটা কালো সালু কাপড়ে পাথরটা ঢাকা। কাপড়টায় আরবি হরফের লেখা। উপরে লাল শামিয়ানা টাঙানো। যেন সত্যি সত্যি কোনো পীর-দরবেশের কবর।

রবিউল ডুমুরগাছটায় সুতা বাঁধে, আজিজ তার পেছনে দাঁড়িয়ে। অতনুবাবু সালু কাপড়টা একপাশে সরালেন। তেলাপোকারা ছোটাছুটি শুরু করল। মস্ত পাথর। জাফলংয়ে এমন বিস্তর পাথর তিনি দেখেছেন। স্থানীয় এক লোক বলেছিল, যত দিন যায়, পাথরগুলো ধীরে ধীরে বড় হয়। অতনুবাবু পাথরটার গায়ে হাত বুলান। ঝিঙার আঁটির মতো অথবা মধুর চাকের মতো জালি জালি। সেসব জালিতে আঁটকে আছে দুধের সাদা সর। প্যান্টের পকেট থেকে স্মার্টফোনটি বের করে পাথরটির ছবি তুললেন তিনি। পেছন থেকে আজিজ হাঁক দিল, “ছবি তুলা নিষেধ আছে স্যার।” অতনুবাবুর মুখে মুচকি হাসি। আজিজ বলে, “এখবার ঢাখার এক ছাত্র ছবি তুলার সময় মোবাইলে আগুন ধরি গেছিলো। আতর আঙুল সব আঙ্গার অই গেছিল। ধরত না কেনে? ছবি তুলা শরীয়তে নিষেধ, পীর-আউলিয়া হখলর অপছন্দ। অউ থাকি ছবি তুলা নিষেধ খরছে আস্তানা কমিটি।”

অতনুবাবুর হাসি মিলায় না। আজিজ বলে, “বুঝলা স্যার, পাত্থরটা আগে অনেখ ছুট আছিল। খেউ চাইলেই টানিয়া তুলতে পারত। বাড়তে বাড়তে অতো বড় অইছে। সব পীরর কেরামতি,

বুঝলা স্যার। হা, আল্লাহ মালিক।’

-“এখানে কি ওরস হয়?” জানতে চাইল রবিউল।

-“কেনে অইতো না? পউষ মাসর সতরো তারিখ মাজার কমিটি বিশাল ওরস খরে। দূরদূরান্ত থাকি শত শত মানুষ আয়। সাতটা গরু আর পনরোটা খসি জবো অয়। ইন্দু-মুসলমান-বউদ্ধ-খিস্টান সব আয়। শ্রীমঙ্গলো তো ইন্দু-মুসলমান ফিফটি-ফিফটি। কেউ বাদ যায় না। হখলে তবাররক পায়। কোন টান ফড়ে না। সব তারার ইশারা।”

কে জানে হঠাৎ অতনুবাবুর মাথায় কী ঢুকল। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে তিনি কেভিন ব্রেননের সেই ডায়েরিটা বের করলেন। ডায়েরি ৭ নম্বর পাতাটিতে চোখ বুলালেন কয়েকবার। ডায়েরিটা বুকে চেপে ধরে উপরের দিকে তাকালেন। পাথরটার উত্তরে একটা প্রাচীন শিরীষগাছ। সঘন পত্রবিন্যাসে ছায়ানিবিড় বিশাল বৃক্ষ। আগাগোড়ায় তিনি চোখ বুলান। তারপর আবার ডায়েরিতে চোখ রাখেন। খানিক পর চোখ তুলে পাথরটা খুঁটিয়ে দেখেন এবং আবার ডায়েরিতে চোখ রাখেন। ৭ নম্বর পাতায় কেভিন ব্রেননের লেখা সর্বশেষ লাইনটি বারবার পড়েন-

“শেষ নিঃশ্বাসটি ছাড়ার আগে দুই সন্ন্যাসী পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল। ওই অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু হয়। দৃশ্যটি আমার কাছে অসহ্য ঠেকেছিল। আমি দুই লাশের মধ্যবর্তী স্থানে পাথরটি রেখে দেওয়ার নির্দেশ দেই।”

ডায়েরিটা বন্ধ করে আবারও পাথরটার দিকে তাকালেন অতনুবাবু। তাকিয়ে থাকলেন খানিকক্ষণ। তারপর আজিজের দিকে ফিরে বললেন, “আচ্ছা, আপনার বাড়ি কি আশেপাশে কোথাও?”

আজিজ বলল, “বেশি দূরে নায়। ইখান থাকি মাত্র তিন কিলো।”

“এই জায়গাটার নাম কী?”

সাইনবোর্ডে তো লেখা আছে, “দেখছইননানি? মগাছড়া ১৩ নম্বর গরমটিলা।”

-“গরমটিলা নাম হয়েছে তো পাথরটা আবিষ্কারের পরে, তাই না?”

-“ইতা অবশ্য ঠিক খইছইন।”

-“তার আগে জায়গাটার কী নাম ছিল বলতে পারেন?”

আজিজ মাথা নাড়ে, “না স্যার, খত বছর আগর খতা, আমি কিলা খইমু!”

-“এই তথ্যটা আমার জানা দরকার।”

-“এখজনের খাছে জানতা পারবা। গউরাঙ্গ দাস। যাইতানি তার খাছে?”

-“গৌরাঙ্গ দাস! কোথায় থাকেন তিনি?”

-“দুই কিলো দূরে, মগাছড়ার শেষ মাথাত।”

একটানে গৌরাঙ্গ দাসের বাড়ির সামনে এসে গাড়ির ব্রেক কষল আজিজ। অন্ধকার ততক্ষণে আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। একটা মাটির ঘর। শনের ছাউনি। পরিচ্ছন্ন খোলা বারান্দায় একটা হারিকেন জ্বলছে। গলাখাকারি দিয়ে ‘গৌরাঙ্গবাবু গৌরাঙ্গবাবু’ বলে হাঁক দিল আজিজ। খানিক পর বেরিয়ে এল এক কিশোরী। জানাল, গৌরাঙ্গ দাস অসুস্থ, ভেতরে শুয়ে আছেন। আজিজ ভেতরে ঢুকে গেল। পেছনে অতনুবাবু ও রবিউল। তাদের দেখে শোয়া থেকে উঠে বসলেন গৌরাঙ্গ দাস। বয়সের ভারে নজ্যু। গায়ের চামড়া ঝুলে পড়েছে। একটা দাঁতও নেই মুখে। মাথার সব চুল পাকা।

কুশল বিনিময়ের পর দেরি না করে অতনুবাবু আসল কথাটি পাড়লেন। গৌরাঙ্গ দাস খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর চৌকি থেকে নেমে লাঠিতে ভর দিয়ে ভেতরঘরে চলে গেলেন।

প্রায় পনের মিনিট পর ফিরলেন হাতে দুটো দলিল নিয়ে। বহু পুরনো দলিল। কালিঝুলিতে বিবর্ণপ্রায়। তিন পাতা করে ছয় পাতা। স্থানে স্থানে পোকায় খাওয়া। জলচৌকির উপর দলিল দুটি রেখে পাতা উল্টাতে লাগলেন। অতনুবাবু ঝুঁকে দলিলের হস্তলিপি পড়ার চেষ্টা করলেন। তৃতীয় পাতাটি উল্টিয়ে গৌরাঙ্গ দাস বললেন, "শেষ জরিফ অনুযায়ী বর্তমান গরমটিলার নাম আছিল হাড়িয়াগড়।"

সোজা হয়ে বসলেন অধ্যাপক অতনু ভাট্টাচার্য। উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখখানা। পকেট থেকে মোবাইলটি বের করে দলিল দুটোর ছবি তুলে নিলেন। গৌরাঙ্গ দাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে দাঁড়ালেন উঠানে। তখন দমকা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আকাশে মেঘ করেছে বিস্তর। পাহাড় ও ঘন বনাঞ্চলের দেশে একটু পর বৃষ্টি নামবে।

ধূসর ঘুঘু পাখির দেশে

নলিনী বেরা

১.

'জুলে ভার্ন' ছাড়িয়ে 'এলেকতিক' অফিসকে ডাইনে রেখে আর কিছুদূর এগুতেই বনঝাড় সরে এল। একটা চমৎকার 'ভিলা' পড়ল। ভিলা তো নয়, শহরের অদূরে ফাঁকা জায়গায় অবস্থিত সুরম্য বাড়ি।

শুধুই বাড়ি তো নয়, সুশোভিত বাগানবাড়ি। তাও নয়, যেন দূর্গভবন। চতুর্পার্শ্বে সুবৃহৎ বৃক্ষাদি। লতাগুল্ম। কোনটাই বা ওক, চেস্টনাট, বীচ, বার্চ, ম্যাপল কোনো কিছুই তো চিনি না, জানিও না।

ভিলা সংলগ্ন খেতিবাড়ির প্রান্ত বরাবর 'রেকত্‌র স্মিত্‌' বাস স্টপ ও ট্রামস্টপের দিকে হাঁটতে গিয়ে কিন্তু মনে হ'ল – আনাজ খেতিটা কেমন চেনা চেনা।

নালা করে সার সার বাঁধাকপি ফুলকপির চাষ। 'ত্যাঁড়ায়' ভরে পাল জমিনে জল দেওয়ার সাজ সরঞ্জাম। কেয়ারটেকারের ঘর থেকে তক্ষুণি লুঙ্গির কশিতে গিঁট দিতে দিতে যেন বেরিয়ে আসবে নদীধারের পাল জমিনের পাহারাদার চাঁদপুরের নীলধ্বজ দন্ডপাট।

ছবির মতো সাজানো ভিলা, খেতিবাড়ি সব। অথচ আশ পাশে লোক দেখিনা। খালি তো এদিক ওদিক থেকে দুরন্ত বেগে ছুটে আসা গাড়ি আর গাড়ি। কার্যত কেয়ারটেকারের ঘর থেকে কোনো নীলধ্বজ দন্ডপাট কী দারোয়ান মিশেল বেরিয়ে এলো না।

‘রেকত্‌র স্মিত্‌’-এর মোড়ে পৌঁছে ডাইনে ‘র্‌যু দ্য লা বুর্জেনীয়ের’-এর দিকে কয়েক পা হাঁটলেই চোখে পড়ল মরা শামুক গেঁড়ি-গুগলি শুকা-শুঁটকির দোকান। তারমানে আজ নির্ঘাত ‘দিমশঁ’। অর্থাৎ রোববার।

হপ্তার ছুটির দিন। যখন মল, বাজার বন্ধ। তখন এ বুলভার সে বুলভারের মোড়ে, এ র্‌যু সে র্‌যুয়ের মুখে তাদের দোকান খোলা।

আমাদের হাওড়ার কালীবাবুর বাজার, বোসবাবুর বাজার কী বোষ্টমপাড়ার বাজারের শাকউলী শামুকউলীদের মতো নয়। অনাহূত রবাহূতের মতো কোনক্রমে বাজারের একপাশে যৎসামান্য ঠাঁই করে নিয়ে হাজা হাতে গেঁড়ি ভাঙছে।

রীতিমতো ভারী দোকানদার। অনেকটা কলকাতার নিউমার্কেটের ফল দোকানীদের মতো। ওই যারা স্টিকারআঁটা আম-আপেল-বেদানা বেচে। মাঝে মাঝে স্প্রে মেশিন দিয়ে ফলের উপর খুশবুর জল ছড়ায়।

ঈষৎ হেলানো আলমারি। চৌকো চৌকো খোপের ভিতর মরা শামুক জ্যান্ত শামুক। শামুকের শুঁটকি। জীবন্ত ও মৃত গেঁড়ি গুগলি। প্রত্যেকটা খোপেই দামের ফর্দ আঁটা – ‘ল্য কিলো’ ২ ইউরো থেকে ৪-৫ ইউরো পর্যন্ত।

বইয়েই পড়েছি ‘মোলাস্কা’ অর্থাৎ কোমল পর্বভুক্ত প্রাণী হ’ল শামুক। তার আবার কত রকমফের। জল শামুক, স্থল শামুক। ঝিনুক, শঙ্খ। গেঁড়ি, গুগলি। সেপিয়া, ললিগো, অক্টোপাসও এই গ্রুপের। নাকি ভুমধ্যসাগরীয় দেশের মানুষের কাছে অক্টোপাস শামুক গেঁড়ি গুগলি সেপিয়া ললিগো খুবই সুস্বাদু। তদুপরি ভারি প্রোটিন সমৃদ্ধ।

হাঙর, অক্টোপাস, জেলিফিস আমরা খাই বা না খাই, শামুক ঝিনুক গেঁড়ি গুগলি তো হামেশাই খাই। অধিকন্তু আমাদের গ্রামের মলিনাবুড়ী ও তার মেয়ে শীতের গোটা মরসুমটায় ‘কুমহারডুবি’

জলা থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি ঝিনুক তুলে হাড় মাংস আলাদা করে খোল পুড়িয়ে কলিচুন বানায়। বেলা গড়ায়। অপরাহ্নের রাঙা ভাঙা ঝিলঝিলে রৌদ্রও একসময় টুঙ্ করে খসে যায়। তবু মলিনা ও তার মেয়ে আঙুরবালার ঝিনুক পুড়িয়ে কলিচুন বানাবার চুল্লী নেভে না। তার অনর্গল ধোঁয়ায় মাঠঘাট গ্রাম গ্রামান্তর আচ্ছন্ন থাকে সায়াহ্নেও।

শামুক বিক্রেতার গুমটির কাছে দাঁড়াতেই—

-- 'বঁজুর!'

আমিও বললাম—

-- 'বঁজুর!'

তারপর সামান্য হাসি। আমিও হাসলাম। 'লা সঁস', 'রূত দ্য শ্যাপেল্' এর ওদিকে বিগত হপ্তাগুলোর দু একটা রোববারেই শামুক বিক্রেতাদের দেখেছি। 'র্যু দ্য লা বুর্জেনীয়ের' এর গেঁড়ি গুগলিওয়ালাকে এই প্রথম।

'শ্যের মঁসীও' বলে ফরাসীতেই কীসব বলতে লাগল সে! 'ভু-জেত দু কেল পেই' না 'পারলে ভু ফ্রঁসে', কী যেন!

আমি পরিষ্কার বাংলাতেই জিজ্ঞাসা করলাম—

-- এসব গেঁড়ি গুগলি তোমরা পেলে কোত্থেকে। সেই ১৭৩১ না ৩৫ এ তোমাদের দ্যুপ্লেক্সেসের আমলে চন্দননগর-চুচঁড়া-হুগলির খালবিল ঘেঁটে এনেছিলে বুঝি?

ও যেন কত বুঝল! গড় গড় করে বলে চলল

-- 'মেরসি বীয়াঁ, ম্যসিও, ভুজ এত্ বিয়াঁন্ এমাব্‌ল্। ল্য কিলো দ্যো ইউরো।' বলেই দুটো আঙুল দেখাল।

মাথামুন্ডু কিছু বুঝি আর না বুঝি, দুটো আঙুল আর 'কিলো' শুনেই বিলক্ষণ বুঝলাম—ব্যবসায়ী হিসেবে সে অত্যন্ত ঝানু। বেশি কথায় কাজ কী, কিনতে হয় কেনো, নচেৎ।

তৎক্ষণাৎ একটা গেঁড়ি আমি হাতের তালুতে তুললাম। আশ্চর্য, যেন আমাদের দখিনসোলের সোঁতার জ্ঞানকাকার হেঁতুবিলের কাদামাটি লেগে আছে তার গায়ে। আমাকে আরো আশ্চর্য করে কিয়ৎকালের মধ্যেই গেঁড়িটা তালুর মাঝখান থেকে বিবর্তিত হয়ে গড়াতে গড়াতে চলল আঙুলের দিকে। একটাই আঙুল তুললাম।

তারমানে 'ল্য কিলো'। সঙ্গে সঙ্গে এক কিলো গেঁড়ি গুগলি ইলেকট্রনিক বাটখারায় মেপে প্যাকেটে পুরে সে আমাকে দিল।

মূল্য বুঝে নিয়ে ঘাড় ঈষৎ নত করে স্মিতহাস্যে শামুক ব্যবসায়ী বলল—

-- 'মের্‌সি ব্যকু, ম্যসিও!'

আমিও

-- 'ধন্যবাদ! ভালো থাকুন।'

২.

একটা বই, বই তো নয় মহাগ্রন্থ, পাঠ করেছিলাম। বইটির নাম 'নয়াবাঙ্গঁলার গোড়াপত্তন'। লেখক, শ্রী বিনয়কুমার সরকার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৩২। তার উৎসর্গে—' ১৯৩২ সালে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যেসকল শিশুর জন্ম তাহারা যখন আঠার বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবে সেই সময়কার যুবক বাঙ্গালার হাত-পা'র জোর আর মাথার জোরকে উদ্দেশ্য করিয়া এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম'।

বলা বাহুল্য আমার জন্ম তৎপরবর্ত্তীকালে। তবুও সে গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করিচি। সেখানেই পড়ছি—'ফ্রান্স এমন একটি দেশ যেখানে অনেক বিষয়ে কতকগুলি ঐক্য আছে। ফ্রান্সকে অনেক বিষয়ে আমরা ঐক্যবিশিষ্ট লোকসমষ্টির সুবিস্তৃত জনপদ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। করিলে বেশী ভুল হইবে না। কিন্তু তবুও বাস্তবিকপক্ষে, ফ্রান্সের 'জাতিগত' ঐক্য বা সামঞ্জস্য নাই বলা উচিত। আছে 'জাতিগত' বৈচিত্র। এখানকার

লোকসংখ্যা ৪০,৭৫০,০০০। এই কিঞ্চিদূর্দ্ধ চারকোটি নরনারীর ভিতর ১,৭০০,০০০ জার্ম্মান, ১,০০০,০০০ কেল্ট, ৬০০,০০০ ইতালিয়ান, ২৫০,০০০ স্প্যানিশ। তাহা ছাড়া অন্যান্য কুচোকাচা প্রায় ৬০০,০০০। অধিকন্তু ফ্রান্সে যাহারা আসলে 'ফরাসী' তাহাদের ভিতরও অসংখ্য জাতি উপজাতি রহিয়াছে।'

বিনয়কুমার সরকারের মতে এহেন ইউরোপিয়ান অনৈক্যই চাই ভারতের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও। এতে ভারতবাসীর লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা, ইউরোপের ছোট ছোট ত্রিশ-বত্রিশটা স্বাধীন দেশের মধ্যে কোনও জাতিগত ঐক্য কি ভাষাগত ঐক্য নেই। সর্বত্রই বিরাজ করছে মিশ্র বা দোঁআসলা জাতি আর বহুবিধ ভাষা।

শ্রীসরকারের ধারনা – ইউরোপের দেখাদেখি ভারতকেও যদি গোটা ত্রিশ-বত্রিশ স্ব স্ব প্রধান রাষ্ট্রে ভাগ করা যায়, তবে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। ইউরোপ সুলভ অনৈক্যই চাই আজ ভারতে। নয়া বাঙলার গোড়াপত্তনের জন্য সর্বপ্রথম দরকার এই 'নবীন বস্তুনিষ্ঠ রাষ্ট্রদর্শন।'

তাঁর আরও ইচ্ছা, - 'চাই বিদেশে ভারতীয় মোসাফির'। 'চাই ভারতে বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা'। তিনি নিজেই মুসাফিরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন জার্মানী জাপান, বিলাত, আমেরিকা, ইতালি, ফ্রান্স। চার সপ্তাহে ইতালিয়ান, পাঁচ সপ্তাহে জার্মানী আর তিন সপ্তাহে ফরাসী ভাষা আয়ত্বে এনেছিলেন। দুনিয়ার কত না পর্যটন সাহিত্য পাঠ করেছেন স্ব স্ব ভাষায়। পড়েছেন ফ্রান্সের 'প্যের ল্যতি' – 'প্যের ল্যতি'র ভ্রমণমূলক উপন্যাসে পিরেনীজ পাহাড়ের পল্লীজীবন, ব্রিটানি প্রদেশের চাষী জীবন, আফ্রিকার জনপদ ও জনজীবন বিধৃত আছে।

নাকি প্যারিসে থাকার সময় একজন ফরাসী পন্ডিত শ্রী সরকারকে আরেকজন ফরাসী পন্ডিতের সাথে আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিলেন, "এ এসেছে ভারত থেকে কলম্বাসের চোখ নিয়ে। চায় আমাদের ফ্রান্স আর পশ্চিম মুল্লুক আবিষ্কার

সূচীপত্র

করতে।”

আহা আমারও যদি শ্রী সরকারের মত চোখ থাকত! আমিও যদি তিনসপ্তাহের মধ্যে ফরাসীটা আয়ত্বে আনতে পারতাম।

আরেকজনের কথাও জানি। রাহুল সাংকৃত্যায়ন। যিনি বিশ্ব ভবঘুরে। যাঁর কাছে ‘পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু হ’ল ভবঘুরেমি।’ যেদিকে মন চায় বেড়িয়ে পড়। ‘যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রবজেৎ’।

৩.

রেকতোর স্মিথ এবং বোয়াসিয়ের ট্রাম স্টপের মাঝবরাবর বুর্জেনীয়ের ট্রামস্টপ। সুবিস্তৃত অঞ্চল, র‍্যু দ্য লা বুর্জেনীয়ের। যেখানে প্রায় গায়ে গায়ে অবস্থিত একোল পাবলিক, ছোটদের স্কুল, উ এক্সপ্রেস মল, ‘এগলিজ সেঁ ফ্রঁসে দাজি গির্জা আর খেলার মাঠ।

ঈষৎ কুয়াশাছন্ন প্রাতঃকাল। তদুপরি ছুটির দিন। তবু সারাদিনমান ব্যস্তসমস্ত থাকা বুর্জেনীয়ের অঞ্চলে এক্ষণে লোকের তেমন বাহুল্য নেই। ওই বড়জোর সম্মুখস্থ সিতে য়্যুনিভেরসিতে র আবাস স্থল থেকে ফুড়ুৎ ফাড়ুৎ করে এক দুজন ছাত্র কি ছাত্রী নিষ্ক্রান্ত হয়ে এদিক সেদিক হেঁটে যাচ্ছে।

একটি দুটি করে লোক জড়ো হচ্ছে বুর্জেনীয়ের ট্রামস্টপেও। তবে যেমন জড়ো হচ্ছে তেমন চলেও যাচ্ছে। গার দ্য পঁ রুশো কী অরভলত গ্রাঁ ভ্যাল এর দিকে।

এগলিজ সেঁ ফ্রঁসে দ্যাজি গির্জা আর বোধহয় কয়েক গজের ভিতর। হ্যাট কোট পরা এক ফরাসী প্রৌঢ়ের সাথে মুখোমুখি দেখা-

- বঁজ্যুর।

- বঁজ্যুর।

তৎক্ষণাৎ হাস্যমুখ। যেন কতকালের চেনা।

- শ্যের মঁসিও, কঁ মঁতালে ভ্যু? মিল ফোয়া মের্‌সি ভতরএ মাবল আক্যই-

ফ্রেঞ্চম্যানই বটে। মৃদুমন্দ কাঁধ ঝাঁকিয়ে সেই চিবিয়ে চিবিয়ে বলা। কিন্তু আমি তো এর বিন্দু বিসর্গ কিছুই বুঝছি না। সেকথা বললামও।

- আই অ্যাম ইন্ডিয়ান। আই ডোন্ট নো ফ্রঁসে।

ল্য ফ্রঁসে যে ফরাসী ভাষা- অ্যাতদিনে এইটুকু অন্ততঃ বুঝেছি।

শোনাইস্তক লোকটা উচ্ছ্বসিত হয়ে হাত ধরল। করমর্দন করল। হাত না ছেড়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অনর্গল বলে চলল-

- ভ্যু জোত তো এ মাব্‌ল, জুভু ফেলিসিত। যে ত্রে ফাঁ, জ্যু নে পা আ সে দাঁগজ সু মোয়া-

অসহ্য, বিরক্তিকর। কোনো কিছুই যে বুঝছি না। লোকটা ইংরেজী জানে না। অগত্যা হাত ছাড়িয়ে এগুতে গেলাম। লোকটা সজোরে তার বাঁ হাত দিয়ে আমার হাত ফের আঁকড়ে ধরে তার ডানহাতের গুচ্ছ আঙুল জড়ো করে মুখের কাছে বার বার তুলে খাবার খাওয়ার সনাতন ভঙ্গি করে দেখাচ্ছে।

আমি হতচকিত। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মুহূর্তেই হাত চলে গিয়েছিল পকেটে। মুহূর্মুহু আঙুলের ঘষাও লাগছিল বর্তুলাকার দু ইউরো এক ইউরোর কয়েনে। মনে মনে হিসেবও চলছিল এক ইউরো হচ্ছে আশি টাকা, দু ইউরো-

ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাৎ অথবা গ্রাসমাত্রা ভবেদ্ ভিক্ষা। তাহলে আমাদের দেশের ভিখারীদের সাথে এদেশের ভিখারীদের তফাৎ কি? না তফাত সফিস্টিকেশনে।

এদেশে কেউ কেউ শীতের পোষাকে কানমাথা মুড়ে সঙ্গের কুকুর নিয়ে মল কি মেট্রো স্টেশনের মুখে বসে থাকে। কথাও

বলে না। খালি পোস্টারে লিখে রাখে – 'হোমলেস + হাংরি'।

কেউ কেউ স্যুটেড ব্যুটেড হয়ে বাসে ট্রামে ট্রেনে ছড়িয়ে যায় লিফলেট। কথা বলতেও হয় না। চিরকুটেই লেখা থাকে ভিখারী বৃত্তান্ত ও সবিনয় প্রার্থনা এক কি দু ইউরোর। নিদেনপক্ষে রেস্তোরার একটা টিকিট।

দু ইউরো নয়, দু ইউরোর কয়েনটা বের করেও ফের ঢুকিয়ে রাখলাম। বেছে বেছে একটা এক ইউরোর কয়েনই তার হাতে দিলাম। তৎক্ষণাৎ ফেরত দিয়ে সহাস্যে সে দুটো আঙুল দেখাল। অগত্যা দু ইউরোই গেল।

কুয়াশা কি অধিকতর গাঢ় হ'ল? এগলিজ সে ফ্রঁসে দাজি গির্জার মাঠ এত সাদাটে লাগছে কেন! পুঞ্জীভূত সাদা সাদা। কোথাও গাঢ় কোথাও হালকা।

কুয়াশা নয়, তারমানে এই সকাল সকাল তাঁবু পড়েছে গির্জার মাঠে। নাঁত শহরের জোন থার্টিতে অ্যাতদিন আছি, কত দিঁমশ অর্থাৎ রোববারই তো প্রত্যূষে হেঁটে বেড়িয়েছি। গির্জার মাঠ তো মাঠ, নাঁত স্পোর্তিক কমপ্লেক্স, সিমতিয়ের শোভেনিয়ের, ই তোয়ালে দ্যু সঁস ফুটবল খেলার মাঠ, পার্ক দে লা গৃদেনিয়ের, পার্ক দ্যু পাতি পর্‌ত, লা ক্লুসে, হিপ্পোড্রোম তথা রেসকোর্সের মাঠ –

কই কোথাও তো এমন তাঁবু পড়তে দেখিনি। ঢাকনাওয়ালা বৃহৎ ক্যারাভান কী গড়গড়িয়ে ঢুকে এল এগলিজ সে ফ্রঁস্যে গর্জার মাঠে? তার সামনে কি ওটা, ঘোড়া না গাধা—

এরাই কি তবে ইজিপশিয়ান তথা জিপসী? হোমলেস? ভবঘুরে? চুরুমাহো- যারা জুতোর তলায় শুকতলা পরায়? পাতলারো- যারা যেখানে সেখানে কামারশালা বসিয়ে গ্ল্যামিংগো গান শোনায়? ক্যাসকারবেরো- যারা সুন্দর সুন্দর মাটির পাত্র বানায়? কাহিরিনানো- যারা রংবেরঙ্গের ঝুড়ি তৈরী করে?

ইহুদী? কারাকিস? রাঁবোয়া? বিউরদিনদি? ক্যাম্প ভোলান্ত?

নাকি উঠল বাই তো কটক যাই, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো বোহেমিয়ান?

না না, তাদের পোশাক পরিচ্ছেদ দেখে তো তা মনে হয় না। অবশ্য স্যুটেড ব্যুটেড দেখেও কী আর এদেশে ভিক্ষাকারী বলে মনে হয়? এইতো একটু আগে গচ্চা গেল দু ইউরো।

কম করেও দশ বারোটি মোটরকার। একটা ক্যারাভান, একটা চতুস্পদ ঘোড়া। গাধা বা খচ্চর নয়, ঘোড়াই। এক গোষ্ঠীর লোক বলেও তো মনে হয় না।

ঐ যে প্রৌঢ়া, হলদে মুখমন্ডলে, কুঁচকানো মুচকানো অজস্র বলীরেখা-দেখে তো ভ্রম হয় বুঝি বা চীনা কি জাপানী। নিদেনপক্ষে তিব্বতী, পোশাক আশাকও পরেছে তেমন। লুংগী আর মেখলা।

ফুল্লরা বেসাতি করে নগর বাহিরে। হাঁড়িয়া চামার বেচে চারি পাই দরে। গলায় গুচ্ছ পুঁতির মালা ঝুলিয়ে প্রৌঢ়া তার পসরা সাজ্জিয়েছে। কতক কবেকার প্রাচীন মুদ্রা ও চিত্রকলা দিয়ে। কাগজে এক ইউরোর ছাপ্পা সাঁটা। অর্থাৎ কি না যা লিবে সব এক ইউরো।

আসল না নকল? যদি চীনা উম্যানই ধরি, তবে এসব কি চৈনিক মুদ্রা ও ছবি? চীনে ঐতিহাসিক যুগের শুরু তো শাঙ বংশের রাজা টি আংএর আমলে। শাঙ চৌ। চৌ বংশের শ্রেষ্ট রাজা শি হুয়াংতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি তো চীনের মহাপ্রাচীর।

শাঙ চৌ আমলের মুদ্রা? কু খাই চির ছবি থাং সুং আমলের চিত্রকলা? আসল কি আর, সব নকল নকল।

মহিলা কি জাপানী? এসব কি জাপানের মাকিমোনো, কাকেমোনো, কানো, উকিওয়া গোত্রের ছবি? আসুকা ফুজিয়ারা, কামাকুরা, আসিকাগা, যুগের মুদ্রা?

আর তিব্বত, প্রৌঢ়া যদি তিব্বতীয় হয়, তবে তো আমাদের হিমালয়ের ওপারের দেশের মেয়ে! কুবলাই খাঁ নাকি তারও আগে

শ্রোঙ বতসং সগম পোয়ের আমলের মুদ্রা বিছিয়ে গ্যাঁট হয়ে টুলের ওপর বসে আছে সে।

শুধু কী সে, অনতিদূরেই এক শ্বেতাঙ্গিনী। চোখের তারায় বেগুনী ফোঁটা। দোকান খুলেছে যতসব পুরাতন ফুলকারি হাতঘড়ি ও হাতব্যাগের। বিশেষতঃ মেয়েদের।

ভাষা তো বুঝি না, শ্রের ক্লিয়ে বলে সে কী হেঁকে চলেছে – মাদাম রঁলার ভ্যানিটি ব্যাগ, মাদমোয়াজেল অঁরির হাতঘড়ি, নাপোলেঁয় বোনাপার্তের ঘোড়ার নাল?

সব জিনিসেরই একদর। এক ইউরো। একটা নীল ফিতেওয়ালা ফুলকারি হাতঘড়ি দেখে তো মনে হল নতুনই- কিনে ফেললাম। চারধারে সোনার বরণ আর তারার মালা, মাঝখানে রুপোলী আভা, এক ইউরোর কয়েনটা হাতে দিতেই সুন্দরী রমণী স্মিতহাস্যে—

মেরসী বক্যু! ম্যসীও—

আমিও বললাম,

মেরসি বক্যু মাদাম!

মাদাম রঁলার ভ্যানিটি ব্যাগটিও কম লোভনীয় ছিল না। সেটাও ফুলকারি, নানাবিধ নক্সা আঁকা। ওসব রঁলা-টঁলা বাজে কথা। হয়তো কোনো ফরাসী রমণীরই ব্যবহৃত সেকেন্ড হ্যান্ড।

সখেদে হাত কামড়াচ্ছি, একটু আগে দু ইউরো জলে গেল। কীই না পাওয়া যাচ্ছে- শীতবস্ত্রাদি, পশমের টুপি মোজা, পুরাতন খেলনা, এয়ারগান। পিয়ানো গীটার। বনেদী আয়না। সাইকেল পেরাম্বুলেটর। কাষ্ঠনির্মিত নক্সাদার পাত্র, পুরাতন মানচিত্র। বিবিধ সাম্রাজ্যের পতাকা। বাইনোকুলার, ইলেকট্রিক ইস্তিরি। ছুরি অস্ত্রাদি। হিটার ইনডাকশন কুকার। চুম্বক, চাক ভাঙা হানি, ওয়াইন। বৃহদাকার বাইবেল, অভিধান ও আধুনিক নভেল। দিগদর্শন যন্ত্র, তিমি শিকারের তুরপুন। আরো কত কী যে!

হঠাৎ জমে ওঠা গির্জার মাঠের বেচাকেনার ভেবেছিলাম আমিই আবিষ্কারক আর প্রথম খদ্দের। তা সে আদপে ভুল, টের পেলাম খানিকটা থিতু হয়েই। আমার আসার আগে, এমনকী গাড়ি ঘোড়া ক্যারাভান ঢোকারও আগে এগলিজ স্যে ফ্রঁসের মাঠে লোক জড়ো হচ্ছিল দস্তুরমতো।

মাত্র এক দুইউরোর ব্যাপার। ওই তো মাথায় ফেট্টি বাঁধা কালো মহিলা এর মধ্যেই ব্যাগ ভর্ত্তি করে ফেলেছে। উঁকি দিচ্ছে সসপ্যানের কানাচ হাতা খুন্তি। একটা রুমওয়াশের যন্ত্র নিয়ে দরাদরি করছে। তারা বুঝি জানতই।

আমি নাড়ানাড়ি করছি একটা দূরবীন নিয়ে। দূরবস্তুর দর্শন সাধন যন্ত্রবিশেষ, টেলিস্কোপ। যার কাজই হল দূরস্থিত বস্তুকে দৃশ্যতঃ নিকটস্থ বা বর্ধিত করা। গালিলেওর দূরবীন বলে চালানোর চেষ্টা করছে নাকি বিক্রেতা?

না না, তা নয়। আমি যন্ত্রটির গুণাগুণ পরীক্ষার ছলে প্রথমেই বিক্রেতা যুবকের মুখের ওপর ফোকাস নিবন্ধ রাখলাম। সে আমার সামনে অনেক বড় হয়ে প্রতিভাত হ'ল।

ঈষৎ লালচে দাড়ি। দাড়ির লোমকূপগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঁ ঠোটের কোণে হসন্তের মত সামান্য কাটা দাগ। কোথকার মানুষ সে? ফ্রান্স? জার্মানী? স্পেন? পর্তুগাল? বুলগেরিয়া? রোমানিয়া? হাঙ্গেরি না কিরঘিজস্থানের?

নাকি সিরিয়া ইরাক ইরান তুরষ্ক আফগানিস্থান মিশরের? ভারতীয়ও তো হতে পারে। কেননা আজ যারা ইউরোপের ভবঘুরে, জিপসী, রোমানী, এককালে তারা ছিল ভারতীয়ই।

ভারতীয় সিরকীওয়ালা। সম্ভবতঃ একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে তারা ভারতবর্ষ থেকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যা তাঁবু তাই সিরকী। বানজারা বাদিয়া বিরহোড়রা, তো এখনও গ্রাম বা ঘরবাড়ি অর্থাৎ সিরকী কাঁধে ঘুরে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে।

ক্রমে বিক্রেতা যুবকের মুখ থেকে দূরবীন সরিয়ে চোখ রাখলাম যাযাবর যাযাবরীদের মেলার ওধারে মাঠের দিকে। মাঠের ঘাসগুলোর ডগাও যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আর রঙ। সব জ্যান্ত ঘাস না প্লাস্টিকের?

দূরবীন চলছে। চলছে চলছে। অতঃপর দেখা গেল প্রায় তিনফুট উঁচু একটা পাঁচিল। পাঁচিল টপকাচ্ছে একটা ষোল সতের বছরের যুবতী। সোনালী চুল গায়ে একটা সাদা গেঞ্জি আর শর্টস। পায়েও সাদা রঙের শ্যু।

একটা পাঁচিল টপকাল। দুটো। প্রায় সম উচ্চতার আরেকটা পাঁচিল টপকে সে একটা বাড়ির কাছে গেল। চিমনিওয়ালা দোতলা বাড়ি। বাড়িটার পেছন দিকে দাঁড়িয়ে মেয়েটি দুহাতের আঙুল মুখে পুরে শিস দিল।

গল্পটা তৈরী হয়েও হ'ল না। কেননা বাইনোকুলারটা আচমকা কেড়ে নিয়ে বিক্রেতা লোকটা এক আঙুল দেখাল। তার মানে মূল্য এক ইউরো। নেবে তো নাও।

সহসা মনে হ'ল বিক্রেতা যুবক নির্ঘাৎ কিরঘিজস্থানের। নচেৎ যেমন করে ছোঁ মারল। কিরঘিজস্থান- সোনালী ঈগলের দেশ, যেখানে তাদের শিকার উৎসবে, দড়িতে বাঁধা নেকড়ের সাথে শিকারী ঈগলের যুদ্ধ হয়।

হতচকিত আমি খানিক বিমূঢ় হয়ে বিক্রেতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ফের যখন মাঠবরাবর দূরবীন হীন চোখে তাকাই শিস দেওয়া যুবতীকে আর দেখা গেল না। গল্পটাও পুরো হ'ল না।

কেমন যেন মনে হ'ল গল্পটা দূরবীনেই আছে। খালি চোখে তা দেখা যাবে না। তখন এক ইউরো দিয়ে কিনেই ফেললাম দূরবীনটা। বিক্রেতা কিরঘিজস্থানী যুবক আমার সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে তার ভাষায় কি যেন বলে চলল। তবে তা কখনই বঁজুর বা মেরসি বক্যু নয়।

৪.

ক্যারাভান তো নয়, ঢাকনাওয়ালা একটা গাড়ি, ঘোড়ায় টানা। ওই করেই কেউ কেউ তাদের জিনিসপত্র বেচতে এনেছে। ক্যারাভান বা কাফেলাতো নিরাপত্তার জন্য একত্র ভ্রমণকারী মরুযাত্রীদল। তাদের সঙ্গে থাকে কতক পশু উট ঘোড়া আর খচ্চর।

তাদের কাছ থেকেই জামাকাপড় ইস্তিরি করার একটা যন্ত্র কিনলাম। মাত্র দু ইউরো। ছুরি কাঁটা চামচ, পুরোনো তরবারি কম্পাসযন্ত্র ময়ুর আর খেজুর গাছের নক্সা খোদাই করা বাক্স এক ফরাসী ছোকরা তো খাপে ঢাকা একটা ছোরা নিয়ে দরদাম করছে।

ছোরাটা কার? অষ্টাদশ শতাব্দীর সমরবিদ সাকসে, গিবের, বুর্সে না নাপোলিঁয় বোনাপার্তের? ছোকরাকে জবরদস্ত বিক্রেতা কি বলে টুপি দিচ্ছে?

টুপি কি আর, অস্ট্রিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, স্পেন, জার্মানী, ইতালি, মিশর, সিরিয়া, আলজিরিয়া, তিউনিশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানকারী যুদ্ধবাজ ফ্রান্সের বংশধর বোধকরি ছোরার ধার দেখাচ্ছে।

টুলের ওপর বসা প্রায় মোনালিসার মতো দেখতে এক পসারিনী তখন থেকে আমার নজর কাড়ছে। বা বলা চলে যা দেখছি তাই কিনছি দেখে সে বুঝি আমাকে ইশারা করছে। গেলাম—

--বঁজুর মাদাম!

--বঁজুর ম্যসীও!

ডাঁই করা কতক নতুন পুরাতন ডিকশনারী। দিকসিওনের – ফ্রঁসে অঁগলেজ, অঁগলেজ ফ্রঁসে। অর্থাৎ ফরাসী থেকে ইংরিজি কী ইংলিশ থেকে ফরাসী। মাকসি পশ। বৃহত্তম পকেট ডিকশনারী।

একটা ডিকসিওনের দরকার অবশ্যই। এতদিন থাকলে অন্ততঃ উ এক্সপ্রেস মলে আর যাইহোক মাছের মাথাটা খোয়া

যেত না।

উলটে পালটে দেখছি। ভাষা ফরাসী হলে কি হবে, প্রায় সবই তো ইংরেজী হরফে। ফরাসী শব্দ, তর্জমা ইংরেজীতে করা। আবার অর্দ্ধেক বই জুড়ে ইংরাজি, অর্থ ফরাসীতে করা। পাবলিশার্স ফ্রাঁসোয়াজ অরল্যান্দো।

যাযাবরী কিসব বলতে বলতে একটা ভাবের আবহ তৈরী করে ফেলাতে কিনেই ফেললাম। দাম মাত্র চল্লিশ সেন্ট। খুচরো পয়সাটা হাতে নিয়ে গুণেও দেখল না। মোনালিসার হাসি হেসে বলল-

-- মেরসী ব্যকু ম্যসীও!

মাথা নেড়ে ধন্যবাদ জানালাম আমিও। খেয়াল করলাম যাযাবর যাযাবরীদের মেলা খুব জমে উঠেছে। যাযাবর যাযাবরীই তো। কোত্থেকে ভুঁইফোঁড়ের মত উঠে এসেছে। কোথাও একটাও লোক ছিল না। তারপর কেমন করে মেলা বসে গেল।

বুর্জেনীয়ের হয়ে গার দ্য পঁ রুশোর দিকে ট্রাম চলে যাচ্ছে। ট্রামের জানালায় যাত্রী। রাস্তার ওধারে একটা বৃহদাকার হোর্ডীং, ক্যাবারে এস্প্যানিওল লা বোদেগা —মনে হয় ঘোড়ায় চড়ে নৃত্য পরিবেশন।

ডিকসিনেওর ঘেঁটে দেখলাম এস্প্যানিওল শব্দটির অর্থ স্প্যানিস। তার মানে স্পেন দেশীয়। তবে কি স্পেনিয়ার্ড নৃত্য? স্পেনের জিপসী সংস্কৃতির কেন্দ্র গ্রানাদা থেকে আসছে এরা?

হবেও বা। একটা কালো মেয়েকে দেখলাম এঁগলিজ সে ফ্রঁসে দাজি গির্জার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেল বোধহয় প্রার্থনা শুরু হবে। আমি আবার যাযাবরদের মেলায় মন দিলাম।

এবারে বইয়ের দোকান। যেন নতুন ও পুরাতন বইয়ের প্রদর্শনশালা। সমগ্র কলেজ স্ট্রীট না হোক ভবানীদত্ত লেনের মুখটা বড়জোর। কি বই চাই, কি বই চাই বলে হাঁকাহাঁকি নেই,

হাত ধরে টানাটানি নেই। বিক্রেতা দুজন নিজেদের ভিতর নীচু স্বরে কথা বলছে।

কম আন শ্যভাল সোভাজ...। হাতের কাছেই ডিকশনরি। খুঁজে খুঁজে মানে বের করলাম। যেন বুড়ো ঘোড়া। লেখক ব্রেন্দা মত। প্রচ্ছদে বন্য জলাশয়, ধাবমান তিনটি অশ্ব, উপরে আলুলায়িত কুন্তলা এক রমনী। চুলের গোছ এসে পড়েছে দুই ঠোঁটের উপর। চোখের তারায় বেগুনী ফোঁটা। কভারের রঙ গৈরিক।

উপন্যাসই বটে। মূল্য আধ ইউরো। প্রকাশক আর্লকাঁ। প্রথমে প্রস্তাবনা, তারপর উপন্যাসের শুরু শাপিতর ওয়ান অ্যনসেত জুর্নি উ এতেত সঁসি ক্ষেতেত জোয়াইসেমেঁ সোঁ আনিভেরসের কাতলিন ক্রাসের...

কে জানে কি মানে! বাসায় ফিরে ডিকশনরী ঘেঁটে তর্জমা করব। তবে এটুকু ধরে নিতেই পারি বেগুনীফোঁটাওয়ালা চোখের মালকিন কাতলিন ক্রাসের। এক নম্বর পরিচ্ছেদে তার বিবাহবার্ষিকী উৎসব উদযাপনে একটা কিছু অঘটন ঘটে গিয়েছে।

যা হোক বইটা আধ ইউরোর বিনিময়ে হস্তগত করলাম। একটা হাতঘড়ি একটা দূরবীন, একটা ইস্তিরি, একটা ডিকসনরী, একটা আধুনিক নভেল কেনা হ'ল।

আর আর ক্রেতারা হাঁড়ি ডেকচি হাতা খুন্তি পেরাম্বুলেটর একপায়ের সাইকেল ছোট ছোট খোকাখুকুদের পোশাক পায়ের মোজা রকমারি আয়না সুদৃশ্য ফ্রেঞ্চ উইন্ডো কত কি কিনে চলেছে। মাদাম রঁলার ভ্যানিটি ব্যাগটাও লোভে পড়ে কিনে ফেললাম।

কেনা জিনিসগুলো সঙ্গের দুদুটো বাজারী থলের মধ্যে ঠেসেঠুসে রেকতর স্মিথ হয়ে জুলেভার্ণ মূজের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে য়্যুনিভ্যেরা ল্য সঁসিভ্ এ ফিরেছি। ঘোরতর ইচ্ছা আরো কিছু খুচরো সেন্ট ও ইউরোতে নিয়ে এসে আরও কিছু সওদা করি।

দ্বিগুণ তিনগুণ উৎসাহে বুলভার মার্টিন লুথার কিং ধরে দু দুটো

থলে নিয়ে আমি ফের দৌড়ুতে লাগলাম। জুলে ভার্ণ, এলেকতিক অফিস, রেকতর স্মিথ ট্রাম স্টপ পেরিয়ে গেল...আমি দৌড়ুতে লাগলাম

গলি তক তেরী লায়া হমেঁ শওক

কঁহা তাকত কে অব ফির জায়ে ঘরতক?

আমার ইচ্ছেই আমাকে তোমার গলিতে টেনে এনেছে। এখন আমার সাধ্য কি ঘরে ফিরে যাই।

মরা শামুক গেঁড়ি গুগলীর দোকানদার এখনো দোকান খোলা রেখেছে। দুচারজন খরিদ্দার শুকা শুঁটকি কেনাকাটা করছে। ট্রাম ট্রাম রাস্তায় চলেছে, বাস বাস রাস্তায়।

ছুটির দিন হলেও রাস্তায় লোক চলাচল বেড়েছে। বেলাও কম হ'ল না। তবে ঘড়িতে প্রায় বারোটা বাজলেও দ্বিপ্রহর বলা চলে না। রোদের তাত সে তো বাড়বে বেলা দুটোয়।

আর ক' গজ দূরেই এগলিজ সে ফ্রঁসে দাজি গির্জ্জার মাঠ। মাঠে যাযাবর যাযাবরীদের এতক্ষণে হয়তো লোক জড়ো হয়েছে প্রচুর। হয়তো বেচাকেনাও বেড়েছে পুরোদস্তুর। সমসতই বুঝি ফুরিয়ে গেল। দৌড়লাম,

দৌড় দৌড়—

কোথায় কী! একটা লোক নেই। একটা গাড়ীও নেই। ঘোড়ায় টানা ক্যারাভান চলে গিয়েছে। কখনও যে এখানে একটা মেলা বসেছিল তার কোনো চিহ্ন নেই।

ধূসর একটা ঘুঘু এক পা এক পা করে নেচে নেচে গির্জ্জার মাঠে কী যেন খুঁটে খাচ্ছে।

ছবি: দেবরাজ গোস্বামী

ক্ষীর নদীর কূল

তিতাস বেরা

১.

হলুদ এ্যালা মাটি হইতে হলুদ রঙ আসিল ঐরূপে চুন খয়ের হইতে লাল ঐরূপে জবাফুল হইতে বেগনী ও আর সমস্তই অই অই প্রকারে প্রাপ্ত হইল যথা গুমা ফুল হইতে প্রাপ্ত হইল আকাশী রঙ। ইহার পর কতক রঙে কদবেলের আঠা বিশেষ তাহাতে লেপন হইল ও রঙ শুকাইয়া যাইলে পরে অই রঙ আনুকূল্যে ছাগতুলিতে লেপন ও এইরূপে বর্ণ হইল ও ইহান পর ছবি হইল। এইরূপে যতরকম ছবি হইয়াছে সেইগুলির যেমনি বাহার ও তদ্রুপ শ্রীযুক্ত হইল যথা লক্ষীসরার উপরে পটচিত্র ও পাঁচপুতুল রাধাকৃষ্ণ দুইপুতুল লক্ষীনারায়ণ ও একলক্ষী তিনলক্ষী ও ইহান পর পাঁচপুতুল ময়ুরও হইল বাখান এমতি হইল যেন শ্রীপতি পটুয়া পট গড়িতেছেন।

যখন প্রলয় হয় সৃষ্টির নিধন অন্তঃপুরে তখন ঘরের কোণ ও পাঘা পিদিম পিলসুজ মল্লিকার মালা মাটিতে শতছিন্ন শীতলপাটি বারমাস্যা ক্ষৌম বস্ত্রের স্তুপ ও তারিপাশে শ্রীপতি বৌ উবু হইয়া কাঁথা বুনিতেছেন তো অইটুকুন আলোয় চাঁদের কোণা খাওয়া ছাঁচি পান কংকাবতী শাড়ী লুটাইতেছে এখন। চারিখন্ড কাপড়ের টুকরা খানিক প্রান্তটুকুন মুড়ে সারি সারি সেলাই পড়িতেছে অইখানে কাপড়ে মুড়ি পড়িতেছে ও পুস্পরেণু হাত সেলাই সূঁচের নকশা বুনিতেছে। মান গরবিনী অভিমান করিয়াছেন কিনা সেইহেতু কাঁথা রকমফের হইতেছে বটে এখন দোরোখা পত্তনী কাঁথা এখন সে কাঁথায় শঙ্খলতা পাড় সে কাঁথার জমিতে ধানের

শিষ ঢেঁকিশাল ডাহুক পাখি ও বেড়াল ও রেড়ির তেল গড়াইয়া হেঁসেলের নিভোন চিটা ধান শান্তি শান্তি শান্তি।

পৃথিবী বিদার করি পাতাল হইতেছে এমন কিবা পশ্চিমা বায়ু ও মেঘগর্জন মেঘ জুড়িয়া মুষলধারা মায়াদহ এক আঁধার জল হইতেছে ও সেই আঁধারে শ্রীপতি বৌ আনমনা হইয়া ভাবিতেছেন এবং দীঘল কেশ কন্যে যে কিনা কত কত দূর চলিতেছে ও তাহার কথাও ভাবিতেছেন। নয়ানজুলি উপচাইয়া জল ঢুকিতেছে আঙিনায় তারি পাশে জমিতে জামগাছের ডাল সেইসব কিনা নুইয়ে পড়িতেছে ওই কী ভীষণ ঝড়ের তেজ নব জলধর উজিয়ে ঘন গরজন সঘন দাদুরিধ্বনি চঞ্চল মন। দেখ কিনা কন্যে এখন মাটি আকাশ চন্দ্র সূর্য ফুল পাখি শিকার করিয়া ময়ুরী পায়ে তেপান্তর উড়িতেছে তো এখন আটচালার দেওয়াল ছাইঞ্চা সন্তর্পণে লহর ওইদিকে খড় চুঁইয়া জল নামিতেছে কিনা মাটিতে। দর্পভরী হাওয়া এলোমেলো চালাটুকুতে আছড়াইতেছে পরে সে ঝাপট তেজ দেখিয়া কুঁদরখোলে তাহারা সব থরথর। শ্রীপতি বৌ বিনান করিতেছেন দুখিনীর কন্যে ওগো ধীরে যাইও ধীরে শতালী অঙ্গের বাস হাতের কঙ্গণ তাহা শুনিয়া আকাশী আলোয় অন্ধ মেঘরাজি সুরনদীকূল দেখিতে আসিয়াছে। খুড়িয়া বতুয়া শাকে ক্ষেত গেইছে ভরি ভর বরিষা উজাই নাগিল মাছ অই বহুদূরে দিকচক্রবাল ঝাপসা করিয়া জলস্বর অই যেন দিনের বেলায় যেন রাতের আঁধার ও সেইমত শ্রীপতি পটুয়া দেখিতেছেন কালো আকাশে যেন হংস হংসী উড়িয়া যাইতেছে অমনি তিনি সব ছাড়িয়া যমপট্টকি পট আঁকিতে বসিয়াছেন। এবং এ পট সাব্যস্ত হইল যেন সূর্যদেবের পট যম কিনা সূর্যেরই অংশ।

অই সময় ঝুম ঝুম্ ঝুম ঝুম্ ঝমর ঝমর নেপুর বাজিয়া উঠিল ও ইহান পর পটুয়া দেখিলেন সদর দরোয়াজায় রামানন্দ গোস্বামী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গৌরবর্ণ মুন্ডিত মস্তক খোঁপা সৌম্যকান্তি অনিন্দ্যসুন্দর আয়ত চোখ পরিধান হইয়াছে পট্টবস্ত্র সাজি ধুতি কমন্ডলু লাঠি গলায় তুলসী কাঠি কন্ঠে হরিনাম। অমনি জল থামিল ও কালো আকাশ শান্ত হইয়া অই কিবা সোনারঙ রৌদ্র দেখা

দিল ও দেখাদেখি বনে উপবনে শালিক দোয়েল টিয়া হরিয়াল জলকোটর হইতে কত কলরব কত কলরব গন্ধ বৈশ্য মানি সোনা সাখারি পসারি গোয়ালা তামুলি তেলি তাতি মালাকার দেখাদেখি বেনেরা ব্যস্তসমস্ত হইয়া পাটদড়ি লইয়া চলিল রাধামণির হাট। পটুয়া দেখিলেন তাঁহার আঙিনায় কত লোক লোকে লোকারণ্য ও শুনিলেন গোস্বামী দুইহাত আপন করিয়া ডাক দিতেছেন মেঘ যে শেষ হইল আইস শ্রীগৌরাঙ্গ যে নীলাচলে চলিতেছেন এই বলিয়া ভক্তদের গাজন হরিবোলে নম নম করপুটে দূরে অইদিকে বনপারে তিরোহিত হইলেন।

পটুয়া দেখিলেন গোস্বামীর পেছু পেছু কত কত লোক চলিতেছে মদ্দা জোয়ান বুড়ো বুড়ী আগুরি ময়রা আর নাগরি যতেক জুগি চাষা ধোবা চাষা কৈবর্ত্ত অনেক কিনা এককাপড়ে ছুটিতেছে অই যে যষ্টি ধরিয়া ভিক্ষুক বনজ ঋষিরা হাঁটিতেছেন অন্তে ডোম্বীরা সকলে পায়ে পায়ে চলিতেছে ছোট ছেলেমেয়েদের কোলে কাঁখে লইয়া কোঁচড় বাঁধিয়া মেয়েরা যাইতেছে পটুয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন পালকিতে চড়িয়া নায়েবও চলিতেছেন। ফৌজদার হাঁটিতেছে ও হাঁটিতেছে পাইক বরকন্দাজ ও মহাজন হাঁটিতেছে ও কাজীও হাঁটিতেছেন এখন ঐ শত সহস্র লোক ও লশকর দীর্ঘ পথ তাহার শেষ দেখা যাইতেছে না রব উঠিতেছে হরি হরি ও সকলে চোখের জলে আকূল হইতেছে।

শ্রীপতি পটুয়া পট ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন সেইহেতু যমপট্টকি পট অর্ধসমাপ্ত রহিয়া গেল। অমনি আঁকুপাঁকু ভিতরপুর হইতে শ্রীপতি বৌ ছুটিয়া আসিয়াছেন তাঁহারও চোখে যে জল ও তিরিতিরি কাঁপিতেছেন দেখ দেখ অস্থির মন কিনা তিনি পটুয়ার পায়ে লুটাইয়া বলিতেছেন যাইও না ধুলোমাটিতে অঙ্গবস্ত্রখানি হিঞ্চে পাতার রসে তাহাতে অইটুকুন সবুজ ছোপ ধরিয়াছে বাগানের কলমিলতা বাগালের ধবলী গাই কাঁদিয়া উঠিয়া বলিতেছে যাইও না আঙিনার ঘর দালান আটচালা বিনয় করিয়া বলিতেছে আজ যে পূর্নিমা যাইও না অথচ শ্রীপতি পটুয়া শুনিয়াও শুনিতেছেন না ও তাঁহার মনপ্রাণ যে অন্য বহুদূরে যেথায় গোস্বামী

ডাক দিয়াছেন।

মানবজমিন লইয়া কি করিলি রাধে আর যে সময় নাই কৃষ্ণ নাম লও সদর দরজা উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়া রহিল শ্রীপতি পটুয়া ঘর ছাড়িয়া ঊষৎপুর চলিলেন।

২.

বরিষার সময় ক্ষীর নদী যেমন হইয়া থাকে টইটম্বুর অইখানে জলে ডোবা চিকনি শাগের ক্ষেত অইখানে জলে ডোবা বৈঁচি গাছের ঝোপ ও নদীর ধার জুড়িয়া বেনা ঘাস ওকড়া গাছ ও পদ্ম শালুক এখন কতরকমের উভচর প্রাণী পাখি শামুকখোল কোঁচবক গাছপালা ও তারি পাশে জীর্ণ ঠাউর থান। ঐ দূরে অশ্বত্থমূল ও পাশ হইতে খানিক কলাগাছের চুকোর দেখা যাইতেছে তো আদাড় পাদাড় এঁটেল পাঁকের সহিত উলুখড়ের কুচি খানিক উলুটি দেওয়াল অই দূরে রাজানুগ্রহের নিদর্শনহেতু ঘাটের পাঁজর খসিয়া ইষ্টক নদীস্রোত হইল এখন বরাবর হেলিয়া পড়া গাছের শাখা প্রশাখা অন্ধকারে আর দেখ নদীর পাড় ঘেঁষিয়া পায়ে চলার পথ ও সে পথের পাশে পাশে সে এক ভীষণ গহীন বন।

সেই পথে শ্রীপতি পটুয়া চলিতেছেন ও শুনিতেছেন যেন দূর হইতে হৈ হট্টগোলের আওয়াজ হেতু কিনা আজ বনেতে সেঁদরা পরব যখন ঐ উস্থি হইতে ঢোলক আসিয়াছে ও বাঁশের বাঁশি এখন মাদুর ধামা কুলো তালপাতার পাখা হইয়াছে। খোঁপায় কুর্চি ফুল গুঁজিয়া ও কানে শালের ঝুমকো বাহার বনবালারা নাচিতেছে ও ইহারপর তীরধনুক লইয়া স্বয়ংবর সভা হইবে ও হরিণ শিকার হইবে ও কলাবৌ শিকার হইবে সেইহেতু সকাল হইতেই নদীতে মুখড়ি পড়িয়াছে। চিতল মৌরল তেটেংরি সরপুঁটি চ্যাঙ বান মুন্ডলী পাবদা ভেটকি। পটুয়া দেখিতেছেন অই যেন কাঠের ঘোড়া সাজানো হইয়াছে সে যেন সাদা রঙের ঘোড়া ও দেয়াশীরা আসিয়াছে শোভাযাত্রা হইবে ক্রমে ক্রমে।

চলিত চলিত পথ ধন্য সে উত্তরনগর নবদ্বীপ যেন পটুয়া

আঁকিতেছেন দেখ দেখি চৌদিকে সহর মাঝে মইল রাজার আট ঘাট মাল গণি বর্ত্তিস বাজার সে নগরে সম্পদ অপরিমেয় স্থিত কত পন্ডিত কত ছাত্রসকল কত ধর্ম কর্ম লোক ভোগ মন্ডপ সরোবর চিত্রিত বিচিত্র সুললিত নগর এইসবই হইল ও সেইস্থানে গৃহস্থের ঘরে ঘরে চালে কত সুন্দর কলস হইল ও তাহাতে কত চঞ্চল পতাকা সাজিল। নট পাঠশাল কুন্দ তুলসী উদ্যান জনশ্রুতি হাতিশালে হাতি কত সমস্ত ঘোড়াশালে ঘোড়া তেজ বল সকল কত দাস কত দাসী রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোকে স্থান মাহাত্ম্যে সুখে সবার বাস। কত রকমের পুজা অর্চনা যাগ যজ্ঞ সাধন কীর্তন ভৈরব তারি মাঝে শচী আইএর ঘরে জন্ম লইয়াছেন শ্রী চৈতন্যদেব। তিনি ডাক দিয়াছেন কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ ভাবো কৃষ্ণ অনুরাগ মোর জাতি মোর সেবকের জাতি নাই তাহা শুনিয়া সমগ্র গৌড়বঙ্গ আকুল হইয়াছে ও তাঁহারই অনুসরণে সকলে একপ্রাণে নীলাচলে চলিয়াছে সেইহেতু আকাশে বাতাসে অষ্টোত্তর শতনাম। দিকে দিকে তাঁহার শিষ্যরা প্রচার করিতেছে ও সকলকে সে কথা জানাইতেছে তাঁতি তিলি তাম্বুলি গোয়ালা বৈশ্য শুদ্র হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন রক্ষা রক্ষা রক্ষা।

চলিত চলিত পথ বনপথ সে যে ক্রমে দূর্গম সে যে বনের ভিতর চলিতেছে ও সেইপথে সাঁঝের জোনাকি মিটিমিটি ও আশেপাশে সর্পদেবীরা ও আটেশ্বরাদি দেবতা স্থির হইয়াছেন এখন পটুয়া দেখিলেন ঐ যে দূরে বটের তলায় ধম্ম ঠাকুরের মন্দির দেখা যাইতেছে একমাত্র ইষ্টকাদি আটচালা ঘর অই ঘরে পশ্চিমমুখী কাঠের দরোয়াজা ও ঠাউর থানে ধম্মঠাকুর উপবিষ্ট যেন। কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ নিটোল গোলাকার শিলামূর্তি ও পেতলের শালকি পূর্ব্বক দুই খানি চোখ খানিক ছিদ্রমতন হইয়াছে যেমন কিনা পুথিতে লিখিয়াছে নাকারো নৈবরূপং চ ভয় মরণে নাস্তি অর্থাৎ কিনা ধম্মরাজের কোনো হাত নাই পা নাই তাঁহার কোন অবয়ব নাই নৈবরূপং চ তাঁর শব্দ বর্ণ গন্ধ নাই জন্ম নাই মৃত্যু নাই তাঁহার শুধু ইচ্ছা রহিয়াছে আর রহিয়াছে দুইপাশে দুইটি

চাকা লাগানো কাঠের ঘোড়া ও সে ঘোড়ার সম্মুখে রেডির তেলের পিদিম মিটিমিটি জ্বলিতেছে। চারিপার্শ্বে শোলার অলংকার টোপর ঝাঁপি পঞ্চম চুড়ি বাজুবন্ধ হাঁসুলি কোথাও বা চিক কানের ঝুমকো মুকুট শবরীবালিকারা রাখিয়া গিয়াছে কিনা পিদিমের আলোয় ধম্মরাজ সেইসব লইয়া খেলিতেছেন দেখ দেখি দালানে নানা রঙের তুলট কাগজ মোম বিরাজের আঠা রঙিন মার্বেল ঠোকাই গোগরি ও অইসব ধম্মরাজ দুচোখ ভরিয়া দেখিতেছেন তিনি কিনা ভগবন অর্ক চম্পক ফুলের মতো প্রকাশিত। তিনি ভক্তের প্রার্থনায় সাড়া দেন এঁর এবং কৃষ্ণের আত্মা কিনা অভিন্ন। শ্রীপতি পটুয়া গলবস্ত্র হইতেছেন চন্দ্র সূর্য্য বন্দ মুঞিঃ সংসারের মাঝ অষ্ট লোকপাল বন্দ ইন্দ্র ধম্মরাজ বর্ণনং সম্পূর্ণ ইতি মতিচ্ছন্ন হইয়া যদি অক্ষর পড়ি ভারে পন্ডিতে পাইলে পুনঃ উদ্ধারিবে মোরে।

অমনি চতুর্দিক যেন আলোকময় হইয়া উঠিল। পটুয়া বিস্মিত হইয়া দেখিতেছেন ধম্মরাজের বরাভয় হেতু স্বর্ণরেণু কঁচনা আলো অই সব লতাপাতা বনরাজি ভেদ করিতেছে আরো দেখ পটচালে কাঠের দড়ায় বাঁধা শিকলি ঘন্টাখানি আপনা আপনি দুলিতেছে রোয়াকে আপনা হইতে শিউলি জল আলপনা মাছভর্ত্তি পুকুর ফলন্ত গাছ ফুলন্ত নদী উড়ন্ত পাখি ধানের ছড়া মরাই ও অই সব ও আরো কত কি। পটুয়া মুগ্ধ হইয়া সেইসব দেখিতেছেন মধু মঙ্গল হাস্য ও এমনি সময় ধম্মরাজ নিশ্চিন্ত মনে প্রকাশ হইলেন।

পটুয়া জোড়হস্তে বলিলেন হে ধম্ম হে গণেশ ঊষৎপুরে রামানন্দ গোস্বামী আসিয়াছেন কিনা তাঁহার মুখে যে হরিনামের বারতা আমি যে তাঁহার কাছেই যাইতেছি ও তিনি কিনা দীক্ষা দিতেছেন সর্বত্র। কাঙাল দীক্ষা লভিতেছে চন্ডাল দীক্ষা লভিতেছে কায়স্থ দীক্ষা লভিতেছেন যজমান দীক্ষা লভিতেছেন কত কত মানুষ যে তাঁহার কাছে দীক্ষা লাভ করিতেছে। বড় সুমধুর তিনি আজ এই ক্ষণে তিনি ডাক দিয়াছেন সে ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নাই হে ধম্ম এই বলিয়া পটুয়া ঠাউর থানে রোয়াকে বসিয়া পদ্মডাঁটা লইয়া আপন মনে আলপনার শালুক আর পেঁচা আঁকতে লাগিলেন। সূক্ষ্ম স্থূল রেখা জুড়িয়া নকশা ছবির বুনোট

ও অই সে নকশায় বিন্দু বিন্দু জল ও পটুয়া দেখিলেন সেই জলে কিনা খানিকটুকুন ধর্ম্মঠাকুর ধরা দিয়াছেন। ধর্ম্মরাজের মুখ ভার সে মুখে বিষাদের ছায়া সে ছায়া কত কত দূরে পথ উজাইয়া হিজলগঞ্জ ঢাকিতেছে। ধর্ম্মঠাকুর সেখানে অনাদিনাথ হইয়াছেন সে গঞ্জে কত রেশমতাঁতির বাস সেইস্থলে বানে ভাসিয়া নদী তাহাদের ঘরদুয়োরে আসিয়া উপস্থিত সেইহেতু কাপাস তুলো বোঝাই করিয়া তাহারা সব এখন পারাণির আশায় ঘাটে হাজির হইয়াছে। অমনি অনাদিনাথ সপ্তডিঙা লইয়া দেখা দিতেছেন আর সে ডিঙির নিশান বহুদূরে ঘুরষি গ্রাম হইতে দেখা যাইতেছে সেইস্থলে ধর্ম্মরাজ কালু রায় সাজিয়াছেন। পটুয়া দেখিলেন সে গ্রামের কুষ্টরোগীর দল কালু রায়ের থানে হা ধর্ম্ম যো ধর্ম্ম করিতেছে এমনি করিয়া গঞ্জ তিয়াড্ডুলুতে ধর্ম্মরাজ কমললোচন হইয়াছেন কুমারপুরে হইয়াছেন দামোদর রায় সুপুর গ্রামে শম্ভু রায় বাতিকা গ্রামে সুন্দর রায় বাদুলিয়ায় রাজরাজেশ্বর আরো কত এইরূপ। ইহারা সকলেই ধর্ম্মরাজের প্রজা ও ধর্ম্ম ইহাদের প্রতিপালন করেন আইজ তাহারা গোস্বামীর কাছে আশ্রয় লভিয়াছে শুনিয়া ধর্ম্মরাজ কষ্ট পাইতেছেন।

শ্রীপতি পটুয়া স্তুতি করিয়া বলিলেন হে ধর্ম্ম হে গণেশ হরিনাম যে অগ্নির ন্যায় শুদ্ধ সে যে বায়ুর ন্যায় কোমল সে যে জলের ন্যায় সরল ও ইহান পূর্ব্বক সমগ্র গৌড়প্রদেশ যে আইজ হরিভক্তিতে আকূল। নবদ্বীপে কৃষ্ণাবতার জন্ম লইয়াছেন ও তাঁহার ডাকে যে সকলে নীলাচলে চলিতেছে হে ধর্ম্ম আপনি আমায় আজ্ঞা করুন এই বলিয়া পটুয়া জোড়হস্ত হইতেছেন। অপাঙ্গে দেখিতেছেন ধর্ম্মরাজ অভিমানে ক্রমশঃ নিস্প্রভ যেন মুখ ফিরাইতেছেন ও বলিতেছেন পটুয়া উহারা যে আমার ভক্ত আমার যে খেলার সাথী পটুয়া তুমি ফিরিয়া যাও পতিতদের ধর্ম্মকথা শোনাও সুমতি হোক শপথ দরিমান কর উহাদের গোস্বামীর কাছে যাইতে বারণ করিবে। পটুয়া দেখিলেন ধর্ম্মরাজের শোলার মুকুট কখন যেন অদৃশ্য হইয়াছে ও সেইস্থলে সুবর্ণ রত্নখচিত বিক্রমমুকুট শোভা পাইতেছে। আঙিনার মাধবীলতা স্বর্ণমঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে

জলকুসুম আলপনাতে ধীরে ধীরে স্বর্ণালি আভা মন্দ আলোয় সে চকমকি পটুয়ার চোখে আলো হইতেছে এ কেমন জাদু গো এ কেমন জাদু। অই কখন ধম্মরাজ কোমল হইয়া পটুয়ার কাছে ধরা দিতেছেন এই নাও পটুয়া সোনাচুমি বেসর বাজুবন্ধ শাঁখা তোড়ল এই নাও স্বর্ণকড়ি এই নাও স্বর্ণ নূপুর প্রলোভিত হও যাও পটুয়া গেহে ফিরিয়া ধম্মপুজো করিও।

শ্রীপতি পটুয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন রোয়াকে না জানি কত স্বর্ণালঙ্কার হলুদ নিষ্প্রভ আভায় সে শোভা চোখ অন্ধ করিয়া দেয়। সে অলংকার রাজি লইয়া ধম্মরাজ খেলিতেছেন ও কখনো সেইসব দৃশ্য হইতেছে বলিতেছেন এই নাও পটুয়া এই নাও কখনো বলিতেছেন এই দেখো পটুয়া এই দেখো এই সবই তোমার হইল। কখনো হাসিতেছেন কখনো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেছেন লইবি না এ তুই লইবি না পটুয়া মাথা নীচু করিয়া রহিয়াছেন তিনি যে সামান্য পটুয়া ও রোজ যে তিনি পটে দেবদর্শন করিয়া থাকেন সেইহেতু অলংকারে আচ্ছন্ন হইলে দেবতারা ধরা দিবেন কেন এখন সে যে পাপ হইবে এইহেতু এ উপহার গ্রহণে তিনি যে অক্ষম। পটুয়া বুঝিলেন ধম্মরাজ প্রত্যাখ্যানে রুষ্ট হইয়াছেন ও ক্রমশঃ তিনি সভয়ে দেখিলেন বাহারী সপ্তডিঙা মাঝি মাল্লা সমেত কখন যেন সাগরে ডুবিয়া যাইল কুষ্টরোগীর গ্রামে যেন মড়ক লাগিলো সুপুর গ্রামে ডাকাতের দল সবকিছু তছনছ করিয়া ফেলিল বাদুলিয়ার জমিদার প্রজাদের কাঁদাইয়া বুঝি স্বর্গযাত্রা করিলেন ও ইহার পর পটুয়া দেখিলেন ধম্মরাজ অভিশাপ দিতেছেন। ক্ষীর নদীর গর্ভে মুন্ডহীন যক্ষীরা স্থিত ও পাতালমন্দিরে তাঁহারা নিদ্রিত তাঁহারা যে ধাত্রী তাঁহারা যে বিনাশ করিয়া থাকেন তাঁহারা পালন করিয়া থাকেন ও তাঁহারা ধম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তুমি যাও পটুয়া যক্ষীদের জাগ্রত করিও যাও দেরী করিও না এই বলিয়া ধম্মরাজ অন্তর্হিত হইতেছেন।

অকস্মাৎ যেন সে স্বর্ণালঙ্কারে আগুন জ্বলিয়া উঠিল ও রোয়াকের আলপনা ক্রমে জ্বলিয়া উঠিল কিবা স্বর্ণরেণু আভা যাহা এইক্ষণে গাছের পাতায় শোভা পাইতেছিল সেইসব জ্বলিয়া উঠিল

ক্রমে ক্রমে গোটা বন বটঝুরি আটচালা থান ধম্মরাজ সব যেন অগ্নিদেবে আশ্রয় লভিলেন। শ্রীপতি পটুয়া সভয়ে ছুটিতেছেন ও অনতিবিলম্বে সে আগুন সর্বত্রই বুঝি ছড়াইয়া পড়িল। পাখপাখালি বন্য জীবজন্তু সকলে যে যেখান হইতে পারে ছুটিয়া প্রাণে বাঁচিল ও যাহারা পালাইতে পারিল না তাহাদের অগ্নি দংশন করিলেন দেখিতে দেখিতে কাঠকুটো সব চড়চড় করিয়া পুড়িতে লাগিল ডালপালা যেন সব মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল ক্রমে মাটি পুড়িয়া লাল হইল। দূর হইতে পটুয়া দেখিলেন সমগ্র বন যেন আগুনরঙা হোলি খেলিতেছে সেই শিখার আগুন সবকিছু গ্রাস করিয়া তান্ডব নাচিতেছে ইহান পর ধম্মরাজের দেউলটিখানি সেই আগুন বুকে লইয়া থির হইয়া ধিকিধিকি জ্বলিতেছে।

হে ধম্ম হে গণেশ হে প্রভু আপনি তুষ্ট হউন এই বলিয়া চোখ মুছিয়া শ্রীপতি পটুয়া ফের পথ চলিতে লাগিলেন।

৩.

প্রাণমুকুন্দ হেএএএ আজি শুনিনু আচম্বিত কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায় শ্রীগৌরাঙ্গ ত্যাজিছেন নবদ্বীপ খোল করতাল সহযোগে পদকর্তারা পদ বাঁধিতেছেন অই দেখ আঙিনার একপাশে রামানন্দ গোস্বামী বিভোর হইয়া বসিয়া আছেন। মধ্যে মধ্যে ধুয়ো উঠিতেছে অই দেখ প্রদীপের আলোয় কত মানুষ যেন তাঁহাকে ছুঁইয়া বসিয়া আছে। কুমোর মালাকার গন্ধবণিক শঙ্খবণিক গোয়ালা তাঁতি কর্মকার সদগোপ দাস চর্মকার মল্ল আরো কত লোক ও সবার মুখে মুখে হরিনাম। গাঁ গঞ্জ নগর উপনগর হইতে কত কত লোক তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার কথা শুনিতে আসিয়াছে কাহারো জন্ম দোগাছিয়া কাহারো চাটিগ্রামে কেহ রাঢ় উড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে ও কেহ সপ্তগ্রামে বিষ্ণুদ্রোহী আছিল যে যবন তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ। আঙিনার অন্য দিকে মেয়েরা লঙ্কা পেষিতেছে গোল উখলে আর খলব্যাত্যায় শব্দ ধরিয়াছে থৈয়ম থৈয়ম। দূরে বটতলায় ঢাকিরা ঢাকে বোল তুলিয়াছে সেই শুনিয়া আরও কত লোকে ছুটিয়া আসিতেছে।

কল্পারম্ভ শেষ হইয়া ভোগারতি আরম্ভ হইল অই দেখ ঊষৎপুরে রাত্রি গভীর হইতেছে ধীরে ধীরে।

সংযোগ ও বিয়োগ স্বয়ং শ্রীহরি করিয়া থাকেন রামানন্দ গোস্বামী মধুর কণ্ঠে ভাব ধরিয়াছেন কিনা। শ্রীপতি পটুয়া দেখিলেন কত মানুষ যে গোস্বামীর পা ছুঁইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ঠুসবি হইতে খই মুড়কি কোঁচড়ে লুটাইতেছে ও গোস্বামী বাখান করিতেছেন প্রভু যখন শ্রীগৌরাঙ্গকে কাছে টানিয়াছেন তখন সংসার ত্যাগ যে করিতেই হইবে বিষম সংসার পথে তপোদগম সদা তাথে তিষ্টাএ পিড়িত জগজনে। সহজ মানুষ শ্রীকৃষ্ণ জাতে অই দেখ সহজ মানুষ বর্ত্তম গুরু রূপ বর্তমান এ গুরুরূপের স্থিতি কোথা গো অই বর্ত্তমান অই কি গো সহজ মানুষ তিন প্রকার কিনা যোনি সম্ভব অযোনি সম্ভব আর কিনা সত্ত সিদ্ধি এহি তিন হইল সত্যসিদ্ধি গোলকে নিত্য বৃন্দাবনে এই হইল উৎপতি। ইতি শ্রী বিদগ্ধমাধব গোরীতীর্থ বিলাসো নাম সপ্তঙ্কে নাম নাটকমিতি লিখিতং শ্রী বৈষ্ণবের দাস বৈদ্যনাথ লিখকো দোষ নাস্তি শুনিলে দুরিত হরে দূর্গতি খন্ডন।

গোস্বামী বলিতেছেন লেখতো দেখি প্রণমোহ নারায়ণ বিঘ্নি বিনাশন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যাহার কারণ সঅক্ষর মিদং সাকীম ঊষৎপুর পরগণে সেলামাবাদ ফাড়ি গোরগঞ্জ। এই পুস্তক নিজের হৈল যে চুরি করিবেক সে সাষুড়ে হইবেক ইতি সন সাল তারিখ এই আষাঢ় রাইত এই প্রহর থাকীতে সায় হৈল। অমনি সকলে বলিয়া উঠিল সায় হৈল সায় হৈল ও সেইহেতু মুরারি গুপ্ত তুলট কাগজে লিখিলেন সায় হৈল অমনি পটুয়া যেন দেখিলেন দাঁড়শালে নাচ হইতেছে।

গোস্বামী বলিতেছেন এই দেখো শচী আই কাঁদিতেছেন দেখিয়া গৌরাঙ্গ বলিলেন মা যদি নিমাই বলিয়া কান্দ তাহলে নিমাইকেও পাইবে না কৃষ্ণকেও পাইবে না যদি কৃষ্ণ বলিয়া কান্দ তাহা হইলে পরে কৃষ্ণকেও পাইবে নিমাইকেও পাইবে ও যে কৃষ্ণ ভজনা করিবে তাহার কোলেই যে আমি বিদ্যমান। বিষ্ণুপ্রিয়াও

না জানিতেন কিবা শচী আইও না জানিতেন যে প্রভু গৃহত্যাগ করিবেন এখন প্রভু শয়ন মন্দিরে যাইলেন আর দেখো বিষ্ণুপ্রিয়া হস্তে চন্দনের বাটী ফুলের মালা তাম্বুলের বাটা লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেবী প্রভুর অঙ্গে চন্দন লেপিয়া চন্দনের বিন্দুর ফোঁটা দিলেন তাহারপর দেখো গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ যে অমানুষিক দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু তাঁর গাত্রবর্ণ যে স্বর্ণের মত তিনি যে সদ্য যৌবনা। প্রভু প্রিয়ার ভুবনমোহিনী রূপ দেখিয়া বলিলেন আইজ যে তোমাকে নিজ হস্তে সাজাইব। এই বলিয়া কপালে সিন্দুরের ফোঁটা হইল সেই ফোঁটার চতুর্দিকে চন্দনের নকশা হইল খঞ্জন নয়নে অঞ্জনের রেখ নব কমলিনী যেন ভুজলতা বেড়ি আলিঙ্গন লেখতো দেখি লেখতো দেখি লেখ লেখ সায় হৈল কিনা অমনি সকলে বলিয়া উঠিল সায় হৈল সায় হৈল সায় হৈল।

অমনি কেন পটুয়ার মনে আইল জলদ সুন্দর বসনে কলেবর সহাস্যবদন অঙ্গুরি বাম করশাখ অই যেন শ্রীপতিবৌ শয্যা রচিতেছেন তুরঙ্গ কেশর যেন চাঁদোয়ার চিত। অমনি মনে আইল যেন নারিকেল দিয়া রান্ধে বুঝি শাক রুই চিথল মৎস্য তথি বার্তাকু সিম অই বুঝি মুহরি জিরক দিয়া রান্ধে কলামূল নিম ও দেখ বুঝি নালিতা কলম্বী পলা কড়া সারি সারি কচু করেল কুমুড়া। গোস্বামী বাখানিছেন প্রিয়া কথা প্রভু বিহনে সকলি শিরে করে করাঘাত পটুয়া ভাবিতেছেন কিনা কিবা হইল ঘরে এবা না জানি আষাঢ়স্য দিবসে দুঃখ নাহি টুটে না জানি কি বিধি দুঃখ লিখিল ললাটে। কর্দ্দম শুখায় বুঝি যাইব কোন দেশে কমলিনী স্মঙরি পাঁজর ভাঙিছে শেষে এইরূপে। গোস্বামী গাহিছেন গীত কৃষ্ণ কহে শুনহ নারদ তপ ধন পটুয়া দেখিতেছেন শচীআই শিরে করাঘাত করি কাঁদিতেছেন ঈশান দেখায় ঠারি গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া ও ইহান পর পটুয়া ভাবিতেছেন দুখিনি ফুল্লরা হেন প্রীতিআশে প্রস্তর সম ক্ষুধাতৃষাকুল না দেখি না শুনি আঁখি কানে শ্রীপতি বৌ যেন ভ্রমিছেন ঘরে ঘর।

অতঃপর পটুয়া দেখিলেন আনন্দগৃহের বাহিরে মাটিতে যেন

ষোলো পাইতার ছক ও কচুর ডাটা কাঠের বীজ লাউ কুমুড়ার বীজ এতেক সকল ষোলো খানি ঘুঁটি ও একদিকে খুঁট-বাংরা। অই কোণে পাঘা হিঙ্গোল বরণ ঝাইল তাহাতে লাল শালু শতেক আগায় বাঁধা চামর। বিষহরি ব্রত পড়িতেছে সব বন্দনাগান হইতেছে ও একপাশে তাম্রহান্ডিতে ঘৃতে সন্তলিয়া নালিতা শাক ও শুসনি পাতা। একপাশে পাত পড়িয়াছে দেখ নেম্বুর আদ্রক লবণ তথিজল পদ্মপত্র ও হংসগতি পরিবেশ। পটুয়া দেখিলেন চালার একপ্রান্তে সিকায় যেন ধান্য বড়ী মুদ্গ সাটিন বস্ত্র মজুত ও গৌণকুলীনগণ ভাবিতেছেন কেমনে বাহিরিবে জগন্নাথের রথ। অই দূরে টোল মন্দিরে পিদিম জ্বলিতেছে ও চূড়ামনিদেব দেখ তরজা প্রহেলী বিস্তার করিতেছেন।

অমনি শ্রীপতি পটুয়ার মনে আইল পাটশাড়ীটির কথা। নেতর কাঁচুলী কনড়-ছান্দে বাঁধা খোঁপা পাখালিয়া চরণ শ্রীপতিবৌ পুণ্যজলে স্নান করিতেছেন যেন ভ্রমর সন্নিবেশ। পটুয়া অধীর হইয়া উঠিলেন নদীপ্রবাহে ভাসমান কাষ্ঠখন্ড যেমতি কদাচিৎ তটসংলগ্ন হয়্যা থাকে সাংসারিক জীবও তদ্রুপ বুঝি কৃষ্ণভক্তিতে উত্তীর্ণ হইতে সকলে সমর্থ নয়।

মানবজমিন লইয়া কি করিলি রাধে ওপারে সম্বল বুঝি একটিমাত্র নাও ঊষৎপুর ভাবে বিভোর হইয়া রহিল শ্রীপতি পটুয়া দ্রুত পদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৪.

যাইত প্রথম নদী জিজ্ঞাসিয়া করে নদী কোথা হইতে আইলে কোথা ঘর কি জাতি কি নাম ধর শ্রীপতি পটুয়া বড় ধীর পদে ফিরিতেছ ঘর এখন সেইহেতু যেন বনপথে রাত্রীকালীন মৃদু আলো হইতেছে আর দেখ ক্ষীর নদীর অন্তরে অই যে চাঁদ। অই খেঁকশিয়াল ডাকিতেছে অই ভাম অই খটাশ অই নেউল চলিল অই কিবা বুঝি কলাবাদুড়ে ডানা ঝাপটাইল। পথপার্শ্বে ঘেঁস্যা ঘেঁস্যা সন্ধিশালুক আরো যতেক ফরৎ গাছের পাশে নয়ানজুলিতে

পানিফল পদ্ম প্রস্ফুটিত। দিব্য বাতাসে আলোড়িত হইয়া সেইসব কখনো বলিতেছে হাঁ যাও কখনো বলিতেছে না যাও। রাইতি পটুয়া কায়া মনসিদ্ধ নাহি প্রাণ হৃদয় ঠাঞিঃ পাষান দুই চক্ষু ভ্রমে নিরন্তর ভাবিয়া মলিন মুখ হৃদয় বিদরে বুক প্রাণ বুঝি করে থরথর। কোঁচড়ে খই কলাই গুঁড়া মধু ঘৃত শুন্ঠিখন্ডনাড়ু বোধ হইল দেখ শ্রীপতি পটুয়া বুঝি ছবি ভাবিতেছেন। ঊষৎপুর হইতে কখন অই গোস্বামী বিদায় লইয়াছেন ও তাঁহার সর্বাঙ্গে যে অগুরু চন্দন ফুলমালা তিলক পট্টবস্ত্র কস্তুরী দুকূল গোস্বামী কাঁদিতেছেন হরি হে আমার গৌরাঙ্গ কই আমার গোলকপতি কই আর দেখ ভাবাবেশ বিভোর হইয়া ছুটিতেছেন শিশু বৃদ্ধ নারী সজন দূর্জ্জন হরিবোল হরিবোল শব্দে পেছু লইয়াছে লোকজনপদ সাথে কান্দিতে কান্দিতে পথে গোস্বামী ডাকে নিমাঞিঃ বলিয়া হে প্রভু হে শ্রীরূপ জীবগণে দয়া করো।

পটুয়া আপনমনে ফিরিতেছেন ঘর ও ভাবিতেছেন যেন লক্ষ্মী প্রায় দীপ্ত নিত্য সিন্দুর ভূষণ পটুয়া বিহনে বুঝি নেত্রকোণে নীর কনক কুন্ডল টাড় অঙ্গুরি পাশুলি বধূ গুণিতেছে বুঝি দন্ড নিশির ও তথির কারণে পটুয়ার মনে বুঝি দারুণ সন্তাপ। ইহান বুঝি ত্বরা করিতেছেন দেখ দেখ চন্দ্রপুর আসিল দেখ রাধাবন আসিল ও সে এক গহীন বন সে বনের পথ উঁচু পথ নীচু। সেই বনে অন্তস্থ হইয়াছে হিংস্র জীবজন্তু বিষধর ভুজঙ্গ অতি গজরাজ। শ্রীপতি পটুয়া ত্যাজিছেন ভয় বনজ কিরাত পদে তেজিছেন নিশি ভাবিতেছেন যেন তিমির অন্ধ পথে নবদ্বীপ জাগিতেছে ধীরে দেখিতেছেন যেন বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু অঙ্গে চন্দন লেপিতেছেন অগৌর গন্ধ তিলক দিব্য মালতীর মালা দিল পঁহু অঙ্গে শ্রীমুখে তাম্বুল কাচ যেন নানা রঙ্গে। দেখিতেছেন যেন বুকে বুক মুখে মুখ রজনী গোঁয়ায় ও এইরূপে দুইজনে সুখে নিদ্রা যায়। অন্তে কোন প্রত্যুষে গৌরাঙ্গ গৃহত্যাগ করিয়াছেন শচীআই টেরটিও পান নাই ও বিলাপ করিতেছেন দেখ গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি শচীআই কান্দে বাহির দুয়ারে। আঙিনার শ্বেতধান্য ঘটবারি দুঃখের রক্ষণ করিতেছে আরো দেখ বিষ্ণুপ্রিয়া পাষাণবৎ

যেন চোখের জলে মেঘডম্বর নেতপাটোল তাহার ছন্দ হারাইয়াছে শুয়াঠুঁটি খোঁপার জাদ আলগা হইয়াছে কাজল বিন্দু চন্দন অলকা-তিলক কখন মুছিয়া গিয়াছে অই বুঝি চেড়ীরা চিত্রমেঘী শাড়ি আনিয়াছে সেইসকল বিষ্ণুপ্রিয়া দেখিয়াও দেখিতেছেন না। শ্রীগৃহ অন্তঃপুরে চৈতন্যের মৃগমদ সুবাস ভার নামিতেছে শূন্য গৃহে। পটুয়া দেখিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া স্বর্ণপাশুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া মুর্ছিত হইয়া পড়িলেন অমনি সে পাশুলি কত কত পথ উজাইয়া দেবীদহে আসিয়া পড়িল। দেবীদহের ক্ষীণ রেখাটি অমনি তখন ক্ষীর নদীপানে যাত্রা শুরু করিল। অঞ্জড় বনপথ জুড়িয়া তখন রজতশুভ্র আলোক। শ্রীপতি পটুয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন অংশুক আকাশে পূর্ণচন্দ্র সিংহরাশিতে অস্ত যাইতেছেন। ষড়বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ। অন্তরীক্ষে যতেক দেবগণ অধিষ্ঠান করিতেছেন। ক্ষীর নদীর জল ফুরাইতেছে ও সেইস্থলে জাগিয়া উঠিতেছে ক্রমে এক গূঢ়মন্দির। শুকনাসা তিলক গবাক্ষ ঝম্পসিংহ চতুরস্র গর্ভগৃহে ধারণ হয়্যাছে উড়মঞ্জরী পঙ্খ বিচিত্রিত যেন গজলক্ষ্মী হংসদল গোশকটে ত্রস্ত যেন অষ্টভূজা মাতৃকা কিন্নরাদি বলদৃপ্তা কৃপাণ ধনুর্ধারিণী ঢাল দন্ড পদ্ম শৃঙ্গ হীনমুন্ড যক্ষিণী ভূধরভেদী অশ্ব ভল্ল বৃষদলসজ্জিতা।

পটুয়া দেখিলেন যেন রেখ দেউলের অগ্রভাগে নক্সাতোরণ বুঝিলেন যেন মুন্ডহীন যক্ষীরা প্রতিভাত হইতেছেন ধীরে ও দেখ দেখ একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরমূর্তি অই মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে যেন ক্রমাগত খনন কার্যে লিপ্ত। স্কন্ধভার বীর অই প্রস্তরমূর্ত্তির চোখ শালকি দিয়া ছিদ্র অঙ্গে নিরুপম আভরণ তরুণ বিভা ললিত ত্রিভংগ ঠাম হস্ত পদ শোভা জন্মিয়াছে প্রতিরন্ধ্রে। স্বেদ জাগিতেছে যেমতি মধুরস গড়াইয়া পড়ে পিত্তল কলসে সুযন্ত্রিত লাঙ্গল কর্ষিছে মৃত্তিকা দুইহস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় যুক্তি করিয়া বন্ধনে গাহিতেছে গীত অই ঢুলুকী গীত যেন আহ্বান করিতেছে মন্দ মন্দ বহত পবন বিরহিনীজন হৃদয় দাহন সঘন মত্ত ময়ুর নাচত যক্ষ যক্ষী আয়েরী। সে ঢুলুকী গীতের বয়াতি শীতল মন্দির ঘর আবহ রচিতেছে। সে প্রস্তরমূর্তির চন্দনের উর্দ্ধ পুন্ড্র তিলক কপালে যেন

ভৌত জ্ঞান লোপ পাইয়াছে কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং সে মুরতি যেন কায়িক শ্রমে লাঙ্গল মাথায় তুলিতেছে ও ইহান পর সশব্দে ভেদিতেছে মেদিনী ও আহ্বান করিতেছে আয় আয় আয়।

শ্রীপতি পটুয়া অস্ফুটে কহিলেন হে ধম্ম হে গণেশ ও ইহান পর ঘৃত আনি মধু আনি কুশমূলে নাম লেখি বনপথে প্রস্থান করিলেন ইতি কিনা লিখকো দোষ নাস্তি যথাদিষ্টং তথা লিখিতং হইল। এতেক সময়ে দেখ সে প্রস্তরমূর্তি খর শব্দে দারুণ দৈব গতি প্রাপ্ত হইল। শঙ্খ ঘন্টাদি বাজে ভেরি মহরি খমক স্বর্ণরজতাদি ক্ষীর নদীর দুই কূলে অই দেখ যেন প্রহেলিকা ও ঊষাকাল রচিতে লাগিল। নদীখাতে বহিল কিরণ। সম ধ্বনি ঘেরিল অবনী। এবং সে অবনীমন্ডল অন্তে কৌম জনগোষ্ঠী নমঃশুদ্র বাগদী বাউরী রুইদাস ডোম সদগোপ অস্ট্রিক দ্রাবিড় আর্য বৌদ্ধ জৈন সমাজ যেন সেই ঊষাকালে ভোরের আলোর আকাশে সূক্ষ্ম মলমলের মতো থির হইয়া রহিলেন।

(বানান, যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত)

ভালো থেকো ফুল...

রুমা মোদক

যদিও সেদিন টুকটুকির কারণে বখাটেরা আমাকে মেরে তক্তা বানিয়ে দিয়েছিলো তবুও তৃতীয়বারের মতো যেদিন টুকটুকি পালালো আর শহরময় ঢি ঢি পড়ে গেলো, আমি কিন্তু ওর উপরে মোটেও রাগ করতে পারলাম না। কেননা সেদিন সন্ধ্যায় ওর মুখে যে অপার্থিব হাসিটি দেখেছিলাম, সেটি ছিল তার অপরূপ সৌন্দর্যের চেয়েও অধিকতর ঝলমল। কেননা তার দু মাস তিন দিন আগে আমি টুকটুকিকে মোবাইলে এসএমএস পাঠিয়েছিলাম, ভালো থেকো ফুল, মিষ্টি বকুল ভালো থেকো। আর তারও কুড়ি বছর সাতমাস আগে আমি টুকটুকির প্রেমে পড়েছিলাম আর একমাস আটদিন আগে আমি টুকটুকিকে জড়িয়ে ধরেছিলাম আর পনের বছর নয় মাস আগে টুকটুকিকে দেখেছিলাম শ্রী দুর্গা জুয়েলার্সে হিরের আংটিখানা দরদাম করতে।

থাই গ্লাসের উপর ফুল-পাতার নকশায় "আপনার সৌন্দর্যে আনে শিল্পের ছোঁয়া - শ্রী দুর্গা জুয়েলার্স", প্রতিশ্রুত বাণী ছাপিয়ে দোকানের ভিতরে হীরার দ্যুতির মতো চমকে ওঠা ঐশ্বারিয়ার সালংকারা মুখচ্ছবি দিনমান ঝলসায় মাথার উপর ছাদ ফুঁড়ে তেড়ে আসা আলোর জোয়ারে। দুখানা দুর্মূল্য ইলিশের আঁশটে গন্ধমাখা বাজারের থলে হাতে নিয়ে এক কেজি খাসির মাংসের জন্য মাখন কসাই এর ডেরার দিকে যেতে যেতে শ্রী দুর্গা জুয়েলার্স এর ঐশ্বারিয়ার বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য্য ম্লান করা টুকটুকির সৌন্দর্য্য দেখেই কি না কে জানে, আমার হুট করে মনে পড়ে গেল মা বলেছিলেন একবার স্যাকরার ঘর ঘুরে আসতে। ঘরে যা দু এক ভরি গয়না আছে মায়ের বিয়েতে পাওয়া, তার নকশা আর

ডিজাইন সব হালে অচল, পুরোনোটা বদলে নতুন নিলে কেমন দরদাম পড়বে জেনে আসতে। রিক্সা চালককে বিদায় দিয়ে সামনের মুদি দোকানদারকে যথেষ্ট অনুনয়-বিনয়ে গলিয়ে তার দোকানে বাজারের থলেখানা রেখে যখন শ্রী দুর্গা জুয়েলার্সে ঢুকি, তখন অবশ্য পুরনো গয়না, নতুন গয়না ইত্যাদি প্রয়োজনসমূহের কথা বেমালুম ভুলে যাই। দেখি টুকটুকির সাথে থাকা ছেলেটা প্রচুর খেপে দোকান কর্মচারীকে মারতে যাচ্ছে। ব্যাটাও যেমন! অর্ধেক দাম রেখে ওদের চাহিদামতো বাকিতে আংটিটা দিয়ে দিলে ল্যাঠা চুকে যায়, যেখানে সঙ্গের ছেলেটা রানিং এমপির ভাতিজা, তায় আবার পুত্রহীন এমপির পুত্রসম, মোটরবাইকে যার দাপট অবিরাম গত কয়েক মাস ধরে বিস্ময়ে দেখছে এলাকাবাসী- কিন্তু ব্যাটা দেবে না। এমপির ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্ধত ঘুষির মুখেও সে নির্বিকার রেকর্ড বাজিয়েই যাচ্ছে- মালিকের নিষেধ আছে..., মালিকের নিষেধ আছে..., টুকটুকির টানা হ্যাঁচড়ায় ছেলেটি কর্মচারীর শার্টের কলার ছেড়ে বার-দুয়েক চেষ্টা চালায় মালিকের ফোনে, অতপর না পেয়ে টুকটুকি তার বাঁ হাতের অনামিকা থেকে যখন চমকানো হিরের আংটিখানা খুলে দেয়, তখন তার মুখে অপমান-অপ্রাপ্তি-হতাশা ইত্যাদি মিলেমিশে যে অচেনা আলোছায়া খেলা করে তা দেখে দোকান কর্মচারী কাজটা কতোটা অন্যায় হয়েছে ভাবতে পারে কিনা জানি না, তবে আমার কাছে ফরজ হয়ে দাঁড়ায় খুলে রেখে যাওয়া আংটিখানা আবার টুকটুকির অনামিকায় উঠিয়ে দেয়া। ‘এক্সিট’ লেখা গ্লাসের দরজা ঠেলে বের হয়ে এমপির ভ্রাতুষ্পুত্রের মোটর বাইকের পিছনে বসে ফুড়ুৎ করে হাওয়া হয়ে যাওয়ার সময় দেখতে না পাওয়ার যে উপেক্ষাটুকু আমার জন্য টুকটুকি রেখে যায়, আমি তা মোটেও গায়ে না মেখে কর্মচারীর গুছিয়ে রাখা আংটিখানা খুব ভালো করে দেখে নিই। মনে মনে হিসাব করি আংটিখানার যা দাম, তা কিনতে আমার কতদিন লাগতে পারে কিংবা এটা আমি আদৌ কিনতে পারবো কি না কোনোদিন! আর কিনলেও তা টুকটুকির অনামিকায় উঠিয়ে দিতে পারবো কি না, সে কথা ভাবতে ভাবতে

হিসাবের টাকা থেকে দশ টাকায় একটা ফিল্টার সিগারেট কিনে মুদি দোকানদারকে খুশি করার চেষ্টা করে আবার মাখন কসাই এর ডেরার পথ ধরি এক কেজি খাসির মাংসের সন্ধানে।

আর পরদিন দুই লাখ টাকা কাবিন, ত্রিশজন বরযাত্রী আর দু ভরি গহনার আদান-প্রদানে সবচেয়ে বড় বোনের বিয়ের পাকা কথা সেরে পাত্রপক্ষ চলে যাবার পর, শোকেস থেকে খুলে আনা চিনামাটির পিরিচে মেহমানদের রেখে যাওয়া খাসির মাংসের তলানি ঝোল দিয়ে পোলাওয়ের লোকমা মুখে তুলে নিতে নিতে বন্ধু পাভেলের কল আসে মোবাইলে। পাভেল জানায়, টুকটুকি এমপির ভাতিজার সঙ্গে পালিয়েছে। সারা শহরে রটে যাওয়া খবরটা আমার কাছে পাচারে পাভেলের কোনো অসদুদ্দেশ্য নেই, আসলে পাভেলই আমার একমাত্র বন্ধু যে টুকটুকির প্রতি আমার অসম দুর্বলতার বিষয়টি জানে। টুকটুকি যখন স্কুলে যায়, তখন রিক্সায় ওঠার সময় পায়ের পাতা ছুঁয়ে থাকা সালোয়ারখানা একটু উপরে উঠে গেলে ওর ধবধবে ফর্সা পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকার বুভুক্ষু দৃষ্টিটা কেবল পাভেলেরই চেনা। না, আমার বলতে হয়নি কিছুই। সময় পেলে আমি যেমন পাভেলের সিডির দোকানে আড্ডা পেটাই, তেমনই পাভেলও আমার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হ্যানিম্যান হোমিও ক্লিনিকে সময় কাটাতে কাটাতে কিছু জিনিস নিজ বুদ্ধিগুণে বুঝে নিয়েছে। কিন্তু পাভেলের ফোনে আমার প্রেমিক মন যতটা বিক্ষিপ্ত হবার কথা, ততটাই নিস্পৃহতার সুরেই বোধ করি পাভেল কথা না বাড়িয়ে ফোনটা কেটে দেয়। টুকটুকি কোথায় গেল কী বৃত্তান্ত ইত্যাদি জানার কোনো কৌতূহলই আমার মাঝে জাগে না, যতটা জেগে থাকে অমূল্য কিংবা দুর্মূল্য হিরের আংটিটির জন্য বেদনা। টুকটুকির পালিয়ে যাবার খবরটি শোনার পর আমি মোটামুটি সিদ্ধান্তে স্থিত হই, ওটা আমিই কিনে দেবো টুকটুকিকে। যে করেই হোক, বলা বাহুল্য সেই মুহূর্তে এ-ই হয়ে ওঠে আমার আগামী জীবনের লক্ষ্য।

টুকটুকিকে আমি যেদিন জড়িয়ে ধরেছিলাম, মনে হয়েছিলো এই মুহূর্তের পর আমার আর বেঁচে না থাকলেও চলে, কিংবা

এর চেয়ে বেশি কিছু আমার একজীবনে প্রত্যাশা ছিলো না, হবেও না। সেদিন আশাহত হলেও কেন জানি টুকটুকি খুব বাধা দেয়নি, আমি দুহাত বাড়িয়ে উন্মত্তের মতো ওকে জড়িয়ে ধরলাম, ওর ঘাড়ের সুগন্ধে মুখ ঘসলাম, এবং আমি ঠিক জানতাম না কী করবো, এবং সেদিন টুকটুকির মাঝে সমর্পণ ছিলো। কিন্তু সেদিনও আমার হিরের আংটিখানা কেনা হয়নি। আগের দিন ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে দেখেছিলাম হাজার সাতেক টাকা পড়ে আছে। অথচ আংটিখানার দাম তার কয়েকগুণ। নিজের উপর খানিক আক্ষেপ জেগেছিল। বিশটি বছর ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি, অথচ আজ বড়বোনের ছেলের খতনা, মেজবোনের বরের গলব্লাডার স্টোনের অপারেশান, মায়ের চোখের ছানি অপারেশান, ছোটবোনের সিজার তো কাল রান্নাঘরের খুঁটি পাল্টানো ব্যাংকে জমা টাকাটা পাঁচ অঙ্কের ঘরে পৌঁছানো মাত্রই কেমন দৈবপাকে প্রয়োজনগুলো সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না। বোনদের মায়ের জীবনের প্রয়োজনের চেয়ে প্রেমিকার হিরের আংটির প্রয়োজনটাও বড় করে ভাবলে নিশ্চয়ই আমি আর মানুষ থাকিনা, কিন্তু হিরের আংটির প্রয়োজনটাও যে কম বড় নয়, নিজেকে ছাড়া কাউকে আর সে কথা বোঝাতে পারি না, চাইও না। টুকটুকি অবশ্য সে আংটির ইতিবৃত্ত মোটেই জানে না। ও অপেক্ষায় ছিলো আর কারো, ও আমার বাসায় এসেছিলো আর কারো জন্য। ও সত্যিই ভেবেছিলো বিদেশ ফেরত কোনো নীরব প্রেমিক সত্যি ওকে বিশ বছর ধরে গোপনে ভালোবেসে যাচ্ছে। আমি মুঠোফোনে ক্ষুদেবার্তায় ওকে যা বলেছি বারংবার। যতোবার বলেছি, ও অবাক হয়েছে, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কেমন করে আমি জার্মানি থেকেও ওর সম্পর্কে সব জানি। স-ব। অথচ কী অসীম গভীরতায় গভীর প্রণয়ের কথা এতোদিন মুখ ফুটে প্রকাশ করিনি পর্যন্ত। আমি ঠিক ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে টের পেয়েছি আমি যতোটা কৌশলে ওর দুর্বলতা স্পর্শ করছি, ও ততোটাই সরলতায় আত্মসমর্পণ করছে। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় আমাকে জানিয়েছিলো যে টুকটুকির দুর্বলতা কী, আর মানুষের

দুর্বলতা স্পর্শ করাই হলো তার কাছে যাওয়ার সবচেয়ে সহজতর উপায়। পরপর দুবার পালিয়ে বিয়ে করার পর শহরময় ওর যে কুখ্যাতি, আমি প্রথমেই তাতে বুলিয়েছিলাম প্রশ্রয়ের সান্ত্বনা। প্রথমবার, বয়স যখন ওর সবে ষোল বছর সাতমাস, যদিও সে পালিয়েছিল এমপির ভাতিজার সাথে, তবু টুকটুকির বিত্তশালী ও প্রতাপশালী পিতা অপ্রাপ্তবয়স্কের সার্টিফিকেট দিয়ে খুব সহজেই ওকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। কাজটি আরো সহজ করে দিয়েছিল এমপি সাহেবের সহযোগিতা। ক্ষমতা উপভোগের চতুর্মুখী সুসময়ে পচা শামুকে পা কাটার ঝুঁকি তিনি নিতে চাননি বলে ব্যাপারটি না ঘাঁটাঘাঁটি করে আপসে টুকটুকিকে বাপের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে ভাতিজাকে বিদেশ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওর বর্তমান অসহায়ত্বের প্রতি আমার অসীম মমত্ব ওকে যতোই মুগ্ধ করছিল, আমি ততোই সাবধান ছিলাম ও এটাকে দয়া বা করুণা না ভাবুক। যদিও আমি নিশ্চিত জানতাম হিরের আংটি খুঁজে ফেরা টুকটুকি আমার সত্যিকারের পরিচয় জানলে আমার সুক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ সব ঢিল ছুঁড়ে ফেলে দেবে আমার জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা টলটলে দীঘিতে। কিন্তু আমি সেসব ভয়াবহ পরিণতি কল্পনায় না এনে ওকে ক্রমাগত বলে গেছি, বলেই গেছি। লোকে যতোই মন্দ বলুক, ওরই বা দোষ কী! দ্বিতীয়বার গৃহশিক্ষকের সাথে পালিয়ে যাবার পর গৃহশিক্ষকের মৃত্যু না হলে ওর তো আসলে আর ফিরে আসার প্রয়োজন ছিল না পিতৃ-মাতৃহীন ভাই আর ভাইবউদের সাজানো সংসারে উটকো ঝামেলা হয়ে। যে উটকো ঝামেলা এখন উপড়ে ফেললেই তাদের সংসারে শান্তি ফেরে। ওর এখন ভীষণ একটা আশ্রয় দরকার। মানসিক, শারীরিক, সামাজিক। কী নিশ্চিন্তে ও বিশ্বাস করে যায় জার্মান প্রবাসী মানুষটিকে। সে বিশ্বাস আমার মতো নগণ্য হোমিওপ্যাথ মানুষে মোটেও নয় জেনেও আমি হ্যানিম্যান হোমিও ক্লিনিকের বাক্সে আর্নিকা, থুজা সাজাতে সাজাতে কথার পিঠে কথাগুলোও সাজাতে থাকি। অতপর রাত গভীর হলে দূর থেকে যখন একটা কুকুরের একটানা আর্তনাদ ভেসে আসে বিষণ্ণ অন্ধকার চিরে

চিরে, পৃথিবীতে পুরানো ফ্যানের ঘটর ঘটর আওয়াজ ছাড়া আর কোনো সাক্ষী থাকে না, তখন বালিশের নীচ থেকে মুঠোফোনটা তুলে এনে ডায়াল করি টুকটুকির নাম্বারে, স্বপ্ন বুনি। কয়েকমাসের মধ্যেই আমি আবার জার্মানি চলে যাবো, যাবার আগে হিরের আংটি বিনিময় করে বিয়েটা সেরে ফেলবো, আর গিয়ে মাস কয়েকের মধ্যেই ওকে নিয়ে যাবো, আর ফিরবো না আমরা এই অবিবেচক অসুস্থ নির্দয় সমাজের কাছে। আমি চোখ বন্ধ করে বলে যাই, মশারির ফাঁক গলে ঢুকে পড়া কানের কাছে ভনভন করা মশাটার ওড়াউড়ি অগ্রাহ্য করি। ক্ষমা করে দিই দীর্ঘকালের ব্যবহারে ক্ষয়ে যাওয়া ফ্যানটার বাতাস না দিতে পারার ক্ষমতা। ভ্যাপসা গরমে ঘামতে ঘামতে আমি দেখি হিরের আংটির ঠিকরে পড়া ঔজ্জ্বল্য, চোখ বন্ধ করে হাঁটতে থাকি ঝকঝকে অচেনা এক শহরের রাস্তা ধরে; আমার হাতে হাত রেখে হাঁটে টুকটুকি। স্বপ্নে ভাসতে ভাসতে একদিন আমি টুকটুকিকে রাজি করিয়ে ফেলি দেখা করতে। কল্পিত প্রেমিকটির সাথে দেখা করতে আমার বাড়ি পর্যন্ত ও চলেই আসে শেষ পর্যন্ত। প্রতারিতের তীব্র রোষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবো বর্তমান সহ পুরো ভবিষ্যৎ নিয়ে, জেনেও আমি পরিচয়টা প্রকাশের লোভটুকু সামলাতে পারি না। কিন্তু স্বপ্ন কিংবা আশাভঙ্গের বেদনা কিংবা প্রতারিত হবার ক্ষোভ কিছুই আমি দেখিনা টুকটুকির দৃষ্টিতে, দেখি অসহায়ত্বের অশ্রু। যে অশ্রু মুহূর্তের জন্য ওকে টেনে নিয়ে যায় আত্মসমর্পণে। যে অসহায়ত্বের সুযোগটুকু আমি নিই। থরো থরো বুকে, কাঁপা হাতে আমি ওকে জড়িয়ে ধরি..., আমার কুড়ি বছর আটমাসের অপেক্ষা পরিণতি পায়, এই প্রথমবার, আমি নিশ্চিত শেষবারও...।

কুড়ি বছর আট মাস আগে যেদিন টুকটুকির মা টুকটুকির হাত ধরে স্কুল ফিরতি পথে আমার হ্যানিম্যান হোমিও ক্লিনিকে ঢুকেছিল, তখন আমি দেয়ালে তারকাঁটা স্কচটেপ সহযোগে মহাত্মা হ্যানিম্যানকে কোনোরকমে বসানোর চেষ্টা করছি। অকাল প্রয়াত বাবার এই হোমিও ক্লিনিকে এই আপাত বসা যে একদিন চিরস্থায়ীই হয়ে যাবে আমার জন্য তখনো ভেবে উঠতে পারিনি।

গঞ্জের কলেজে সবে ইন্টার ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। ঘরে অনূঢ়া তিনজন কলেজগামী বোন আর না গ্রাম না শহর এলাকায় একতলা বাসাটা রেখে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বাবা যখন হঠাৎ মাঝ উঠানে মাথা ঘুরে পড়েই নেই হয়ে যান, তখন পরিবারটির উপর কেমন অনিশ্চিত অন্ধকার নেমে আসে, তা অপরিণত বয়সের কারণে আমি তেমন টের না পেলেও আমার মা পেয়েছিলেন। বাবা-ন্যাওটা হওয়ার কারণে জ্বরে 'রাশটক্স', পেট ব্যাথায় 'নাক্স' এরকম গুটিকয়ওষুধের নাম জানার সীমিত জ্ঞান তখন ভীষণ কাজে দিয়েছিল। দুবেলা ভাত যোগাড়ের জন্য মা বসিয়ে দিয়েছিলেন হ্যানিম্যান হোমিও ক্লিনিকের দরজা খুলে। আমি না জানলেও মা জানতেন সবে উন্নয়নের জোয়ার লাগা এই শহরটিতে হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিতে কিছু মানুষ আসে বিশ্বাসে আর কিছু স্বল্প খরচের খাতিরে। ভুল-ভাল প্রয়োগে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না খুব। একটি পরিবার বাঁচানোর জন্য তাই যৎসামান্য জ্ঞানে চর্চা চালানো খুব অন্যায় কিছু নয়। টুকটুকির মা আসতেন প্রথমটার খাতিরে। নইলে স্বামী যার ডাকসাইটে ঠিকাদার, বনেদি ধনী, শহরতলিতে একমাত্র যাদের তিনতলা বাড়িটিকেই মোবাইল টাওয়ারের সাথে পাল্লা দিয়ে অনেক দূর থেকে আমগাছ জামগাছ বাঁশগাছের ঝোপ ডিঙিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, এই শহরে যাদেরই একমাত্র নিশ্চিতভাবে জেলা সদর পার হয়ে রাজধানীতে বড় হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য রয়েছে এবং মৃত্যুর আগে শেষ মুহূর্তে তাকে নিয়েও যাওয়া হয়েছিল, সে কেন জরায়ূ টিউমারের চিকিৎসার জন্য হ্যানিম্যান হোমিও ক্লিনিকের উপরেই ভরসা করবে? মৃত পিতার জন্য শোক আর আমার জন্য আর্শীবাদ বরাদ্দ করে তিনি প্রথম দিনই টুকটুকিকে বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে- দেখছাইন বে বাবা, খাওনঅ রুছি নাই কেরে। সবে হ্যানিম্যান হোমিও ক্লিনিকে বসা আমি বিজ্ঞের মতো অজ্ঞতা লুকিয়ে টুকটুকির মোমরঙা তুলতুলে হাতখানা হাতে নিয়ে পালস গুনতে গুনতে আমি ভিতরে হঠাৎ জনপদ ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া ভূমিকম্প টের পাই, বাবার কাছ

থেকে শেখা পদ্ধতিতে জিহবার রং দেখতে দেখতে ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলি জন্মের মতো। কাঁপা হাতে চোখের রং দেখতে দেখতে ওর দৃষ্টির ছিপে আটকে যাই মাছের মতো, বুঝে নিই আগামী জীবনেও এই ছিপে আটকানো মৃত্যুই অনিবার্য পরিণতি। এই অনুভূতির সাথে আগে আমার আর পরিচয় হয়নি কখনো।

বোনেদের বিয়ে হয়ে যাবার পর, মায়ের মৃত্যুর পর লক্ষ্মীর স্পর্শহীন বাড়িটা ছাড়া বাড়ির মতো, মধ্যরাতে হ্যানিম্যান হোমিও ক্লিনিকের ঝাঁপ ফেলে, বুয়ার রান্না করা তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে মশারির ভিতর পাভেলের কাছ থেকে ধার করে আনা সেকেন্ডহ্যান্ড ল্যাপটপটি নিয়ে প্রবেশ করি একমাত্র আশ্রয়ে, মুভি দেখায়। পাভেলের সিডির দোকানে বসতে বসতেই যে নেশায় পেয়েছে আমাকে। শাকিব-অপু, সোহম- শ্রাবন্তী, দেব- শুভশ্রীর সঙ্গে একাকীত্বের ভয়াবহ আক্রমণ থেকে বেঁচে যায় আমার রাতগুলি। সহজ সমীকরণের নায়ক-নায়িকা ভিলেন এর রসায়ন ছাপিয়ে সেদিন হঠাৎ চোখ এবং মন আটকে যায় বিদ্যা বালানে, আলো-আঁধারিতে ধীর পায়ের ছন্দোময় পদক্ষেপে বিদ্যা বালান বলতে থাকে- ভালো থেকো ফুল, মিষ্টি বকুল ভালো থেকো।অবাক হয়ে যাই, আরে এতো আমার মনের কথা! বারবার পজ অপশন টিপে টিপে কবিতাটা টাইপ করে ফেলি মুঠোফোনে, ধরা পড়ে গেলে জানালা গলিয়ে ঐ একলা দাঁড়িয়ে থাকা ডোবাটার টলটলে জলে চিরতরে ডুবিয়ে দেবো সিমকার্ডটা।এর চেয়ে বেশি কিছু আমার আর কী বলার আছে টুকটুকিকে, ভাবতে ভাবতে দুঃসাহসী হাতে ক্ষুদেবার্তাটা পাঠিয়ে দেই টুকটুকির নাম্বারে। মাত্র দু মাস তিন দিন আগে, আর আমাকে রাজ্যের শিহরণ সুখ আর বিস্ময়ে ডুবিয়ে পরদিন টুকটুকি প্রত্যুত্তর পাঠায় ‘কে আপনি?’ হিতাহিত-পরিণতি ভাবনা শূন্য আমি অতঃপর এগিয়ে যেতে থাকি, সত্য নিয়ে, মিথ্যা নিয়ে, যেটুকু ওর জানি সব সত্যি, যেটুকু আমার জানা তার পুরোটাই মিথ্যে। মিথ্যেটুকু না বললে যে আমার সকালের অপেক্ষাটা মিথ্যে হয়ে যেতো, ওর দুঃখগুলো অপেক্ষাগুলো

অসহায়ত্বটুকু ওকে আমার বাসা পর্যন্ত টেনে আনতো না মোটেই। বাস্তবে একখানা হিরের আংটি কেনায় অক্ষম আমি যে কল্পনায় ওকে হিরের আংটি কিনে দেয়ার মতো সক্ষম হয়ে উঠি। স্বপ্নের মতো গল্পের মতো ওকে কাছে পাবার যোগ্যতার মতো সক্ষম।

তাৎক্ষণিক আবেগ-বিহ্বলতা কেটে যাবার পর আমার অযোগ্য অক্ষমতাকে ক্ষমা করতে পারেনি টুকটুকি, শুনতে পাই, উপজেলা সদরের হাসপাতালের সদ্য আগত এক ডাক্তারের প্রেমে আবার পড়েছে টুকটুকি। একদিন হাসপাতালের ব্যাচেলর্স কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আসার সময় পথ আগলে দাঁড়ানো বখাটে ছেলেদের হাত থেকে টুকটুকিকে বাঁচাতে গিয়ে ওদের সম্মিলিত হাতের উপর্যুপরি চড়-ঘুষি খেয়ে বিপর্যস্ত লুটিয়ে পরতে পরতে আমি ঝাপসা চোখে দেখতে পাই, ডাক্তারের হাতে হাত রেখে সত্যি সত্যি টুকটুকি নিরাপদে হারিয়ে যাচ্ছে বড় রাস্তার পথ ধরে.......।

সেদিন সন্ধ্যায় হাতে মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা আমি বাসায় ফিরতে ফিরতে তাদের আবিষ্কার করি শ্রী দুর্গা জুয়েলার্সের উজ্জ্বল আলোর নীচে, ঝলমল হাসছে টুকটুকি, ঠিক ওর সৌন্দর্যের মতোই মাথা ঘুরিয়ে দেয়া সে ঝলমলে হাসি, ভাবি বোধহয় হিরের আংটিটা এবার কিনা হয়েছে ওর। আবারো শহরময় ঢি ঢি পড়ে গেলেও আমার মোটেও ঈর্ষা জাগে না, আমি গায়ের সমস্ত ব্যাথা অস্বীকার করে কবিতা পড়ি, ভালো থেকো ফুল.....মিষ্টি বকুল.......।

ছবি: চিরঞ্জিত সামন্ত

এমাজনের পেঁপে

একক

একটি তেপায়া কেদারা, একটি জরাগ্রস্ত চৌপাই ও বেপথু তোষক সম্বল করিয়া দুইজনের সংসারখানি যেদিন সাড়ে ১২১ নম্বর অক্রুর দত্ত লেনে আসিয়া দাঁড়াইল, কৌতূহলী প্রতিবেশী বলিতে জুটিয়াছিল কেবল পাড়ার বিড়াল কুতকুতি ও ন্যাজকাটা কুকুর ভোদাই। মধ্য কলিকাতার তস্য গলিতে, অতটা আধুনিকতা এখনো প্রবেশ করে নাই যে নূতন ভাড়াটে আসিলেও পড়শীদের কৌতূহল যৎপরনাস্তি সংবৃত থাকিবে। এই ক্ষেত্রে, মালবাহী টেম্পোর সঙ্গে একটি মধ্যবয়স্ক পুরুষ ও প্রায় চলচ্ছক্তিহীন সত্তরোর্ধ বৃদ্ধা ও সেই তেপায়া কেদারা, জীর্ণ চৌপাই ইত্যাদির বা সবকিছুর মধ্য দিয়া এমন একটি হতশ্রী ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, যে সকল স্বাভাবিক পরচর্চায় সেই স্থানেই ছেদ পড়িয়া যায়।

প্রথমদিকে মাতাপুত্রের সংসারে চতুষ্পদ ভিন্ন কাহারো উৎসাহ না থাকিলেও, অচিরে কাক -শালিখরা টের পাইল, যে, এমত কলহমুখীন প্রতিবেশী তাহারা দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষ করে নাই। বৃদ্ধ বায়স রামাধীন, দত্ত গিন্নির ফেলিয়া দেওয়া ম্যাকডি বার্গার জুৎ করিতেছিল ভগ্ন পাঁচিলে বসিয়া। অকস্মাৎ ধাতব তৈজসপত্র পতনের বিকট আওয়াজ ও "মর মর মরিসনে কেন বুড়ি !! " চিৎকারে তাহার বার্গার ছিটকাইয়া পার্শ্ববর্তী নালায় পতিত হয়। বায়সকুলে ভূপতিত খাবার তুলিয়া খাইবার রেওয়াজ থাকিলেও বার্গারবিচ্যুত একটি সতেজ মাংসখণ্ডকে কাকচক্ষু নর্দমার জলে বহিয়া যাইতে দেখিয়া বুকে শেল বাজিল রামাধীনের। সে প্রতিজ্ঞা করিল এ পাঁচিলে, আর নয়।

কুতকুতি কিন্তু ইতর মনুষ্যের ভাষা বুঝিত, তথাপি তাহার

বাপ বহুবাজারের ডাকসাইটে হুলো এই অভিমানে ম্যাওভাষা ভিন্ন উচ্চারণ করিত না। মাতা ও পুত্রের শ্রীহীন সংসার, মারমুখী সন্তান, ক্রন্দনরতা মা এইসকল অলীক রঙ্গ দিন দুই ন্যাজ খাড়া করিয়া শ্রবণপূর্বক সে প্রতীত হইল যে, মানবজগতে স্নেহ ও মমতার যে সামাজিকতা সে ইতিপূর্বে দেখিয়া আসিয়াছে তাহা আর যাহাই হউক স্বতঃসিদ্ধ নহে। মধ্যবয়স্ক সন্তানটি কোনো অজ্ঞাত কারণে বারবেলা অবধি বিছানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধা মাতা তখন নাকিসুরে দরজায় বসিয়া কাঁদিয়া মরে। নিদ্রা ভাঙিয়াই কুম্ভকর্ণ ক্ষুধায় চিৎকার জোড়ে ও মাকে গালিগালাজ শুরু হয়। বৃদ্ধার নাকিসুর উচ্চগ্রামে উঠিতে উঠিতে পরের পর সপ্তক আরোহণ করিতে থাকে সেইসঙ্গে অনুযোগ যে ; বাজার না করিলে রন্ধন কীরূপে হইবে, এই বয়েসে হাড় কালি করিয়া বাজার ঘর করা অসম্ভব, ঈশ্বর কেন তাঁহাকে মৃত্যুর পরম আশীর্বাদ দেন না ইত্যাদি ইত্যাদি ও অতঃপর সন্তানের দ্বারা মাতার মৃত্যুকামনা।

কুতকুতি এই খণ্ডহরগীতি একদিন শুনিল, তিনদিন শুনিল, অতঃপর নেহাতই ব্যাজার ও বিরক্ত হইয়া ; দত্তগিন্নি, বোসজায়া প্রমুখের দ্বিপ্রাহরিক আড্ডায় কান দেওয়া অধিক মনোরঞ্জনের, বিশেষত পাঁচিলে পাঁচিলে না ঘুরিয়াও পাঁচ পাড়ার খবর তো পাওয়া যায়, এই ভাবিয়া স্থানত্যাগ করিল।

মার্জারকুলীনের অলক্ষ্যে কিছু ঘটনা ঘটিতেছিল।

সাড়ে ১২১ নম্বরের বাটীতে বহুকাল কোনো ভাড়াটে আসে নাই। মামলা ও ডিসপুটের হেতু, বাটীর অর্ধ অংশ বিলকুল ফাঁকা ও কালক্রমে মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়াছিল। কুম্ভকর্ণ সন্তানটি একরাত্রে কিঞ্চিৎ অসাব্যস্ত হইয়া আসিয়া বাটীর ভগ্নাংশ বরাবর ঝাঁকি দিতেছিল, উদ্দেশ্য পুরাতন পরিত্যক্ত আসবাব বেচিয়া দিবার মতো কিছু আছে কিনা তল্লাশ। এমতাবস্থায় বাটীর প্রান্তে একটি ক্ষুদ্রায়তন ঘরে এক পানওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ, অন্তত তাহার রকম সকম দেখিয়া সেইরূপ বোধ হয়। তক্তপোষে বসিয়া

বিপুলাকৃতি ডালায় জলসিক্ত লাল সালু মুড়িয়া সে কে বা কাহাদের সহিত দরদাম হাঁকডাক করিতেছিল তাহা কুম্ভ ঠাহর পায় নাই। অদ্ভুত শান্ত এই ভগ্নবাটীর মধ্যে এইরূপ একটি জমকালো বিপণি আছে তাহাই সে জানিত না ! পীতাভ অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া লাল সালুর দিকে সে অঙ্গুলিনির্দেশ করিল। পানওয়ালা কাপড় সরাইযা যাহা বাহির করিল তাহা পান নহে, পেঁপে। ঘন সবুজ নধরকান্তি পেঁপের গাত্রে ততোধিক সবুজে লিখিত "এমাজনের পেঁপে, সুনকারিনারপুল"। একখানি কর্তনী লইয়া পেঁপে চারফালি করিয়া কুম্ভের হস্তে একফালি তুলিয়া দিল পানওয়ালা। চতুষ্পার্শ্ব হইতে কাহারা যেন বলিল: "খাইয়া লও", সে নির্দেশে তীব্রতা নাই কিন্তু তীক্ষ্ণতা আছে, যেন অনাদিকালের মালসাভোগের মাঝে আসিয়া সে ভাগ্যক্রমে প্রসাদ পাইয়া গিয়াছে। কুম্ভ সেই এমাজনের কাঁচা পেঁপে কচকচ শব্দে চর্বণ করিতে করিতে ভগ্নাংশময় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

পূর্বে সে কখনো খেয়াল করে নাই এই বাড়িটির দেয়ালে দেয়ালে এতো ছবি। খুব স্পষ্ট নয় আবার সেইসব ভাষা যে বড় দুর্গম তাহাও নহে। একটি বেগনী দেয়ালে ঘন নীল বাঁশির শব্দ চলিয়া গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে জলের কুলকুল ছবি আর ছাতিমছাপ আইসকিরিমের গন্ধ। আরেকটু আগাইলেই মাটি কাঁপে। ও কাহারা করমচা আঁকিয়াছে গৃহের ছাদ জুড়ে ? ক্রমে কুম্ভের সামনে দৃশ্য আসিল, অগণিত অস্পষ্ট তবু নিশ্চিত অবয়ব ছেনি লইয়া দেয়াল কুটিতেছে আর প্রতিটি আঘাতে দেয়ালময় ছবি রং আর ছবি। হাতুড়ি পড়িতেছে ছেনির উপর টুং ড্রঙ ঢিন ঝিপ ঝিপ টং সু সু। আর রক্ত। রক্ত না হইলে কি রং হয়। বড় প্রীত হইয়া এদিক সেদিক ঘুরিতে লাগিল কুম্ভ, কখন যে নিজেও একটি ছেনি ও হাতুড়ি তুলিয়া লইয়াছে টের ও পাইল না। যেন এক আনন্দ রেলগাড়িতে উঠিয়া পড়া ;আর ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, মা মাগীর নিত্যি মুখঝামটা নাই শুধু টুং ড্রঙ ঝিপ ঝিপ সু।

কুম্ভ আলোয় ডুবিয়া গেল। আর দেয়াল কুটিবার অনাহত শব্দে। রূপ। ভলকে ভলকে রূপ।

দুইদিবস পরঃপ্রাতে কুতকুতি যখন পুনরায় সরেজমিনে আসিল, বিস্ময়জনকভাবে আর চিল্লৌত নাই। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বৃদ্ধাটি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিবার অবস্থাতেও ছিল না। দাঁতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুটে কিছু গাল দিতেছিল অদৃষ্টের উদ্দেশে আর তাহার কুম্ভকর্ণ পুত্রটি দুইদিবস যাবৎ নাসিকা গর্জন করিয়া নিদ্রিত, খাইতে চাহে নাই, গালিগালাজ করে নাই। তাহার মাথার পার্শ্বে অর্ধভুক্ত কাঁচা পেঁপের ফালি এবং ছেনি ও হাতুড়ি রাখা।

জানালা দিয়া ব্যাপার দেখিয়া কুতকুতি বলিল: ম্যাও। অর্থাৎ গৃহে শান্তি ফিরিয়াছে। বৃদ্ধ বায়স রামাধীন রাস্তার উল্টোবাগের কার্নিশে বসিয়া রোহিতকন্টকে বৃথাই মৎস্যসন্ধান করিতেছিল। সে বলিল: ক্ক। অর্থাৎ লক্ষণ ভালো নয়।

সেই প্রথমদিবসে বার্গারবিয়োগহেতু, রামাধীন সাড়ে ১২১ নম্বর বাটীর পাঁচিলে আর বসে নাই কিন্তু তাহার প্রাজ্ঞ নজরের বাহিরেও কিছু নহে। উপরন্তু সায়ংকালে যখন সে দেখিল, কুম্ভকর্ণ জাগিয়া উঠিয়া চৌপাইতে বসিয়া কাঁচা পেঁপে চিবাইতেছে, তাহার আর বুঝিতে বিশেষ বাকি রহিল না। ব্যঞ্জনবর্ণমালার প্রথম অক্ষরে তাহার অবস্থান, কুলীন বায়স ; ম্যাওভাষায় অভিমানী কুতকুতি মেনি কী বুঝিবে এ রহস্যের ! বৃদ্ধা মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া হীনবল হতআশা হইয়া একবার প্রবল চিক্কুর দিল: মর মর ! পুরুষমানুষ ভাত জোটাতে পারিস না সব খেয়েছিস এবার মা টারেও খা খেয়ে মরণ হোক তোর !! রামাধীন খানিক চমকাইয়া টাটকা নেংটিতে মনোনিবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই গবাক্ষ হইতে আবার পরুষ চিৎকার: "আলো, আলো, কত রং ! রং খাবো ! খেতে দে !!" এবং ভগ্ন ক্লিষ্ট নারীকণ্ঠে একটি অস্ফুট আর্তনাদ। রামাধীন হলুদ আকাশের পানে চাহিল একবার। একবার অভুক্ত নেংটির প্রতি।

এই ছিন্নমুণ্ড কাহিনীতে ভোদাই এর কোনো গুরুদায়িত্ব এতদবধি নাই। প্রাণীকুল সে সর্বাপেক্ষা অকুলীন। শুধু কয় দিবস পর তাহার চিৎকার ও অস্থির দৌড়াদৌড়িতে আকর্ষিত হইয়া

পাড়ার কয়টি চেঙড়া ছেলে বৃদ্ধার দুর্গন্ধময় শব উদ্ধার করে। কপাল কীলকবিদ্ধ। হাঁ মুখ বহিয়া পিপীলিকার পাল। ম্যুনিসিপ্যালিটির শকট আসিয়া শবদেহ সংগ্রহপূর্বক ধাপার মাঠে চলিয়া যায়।পুরা সময়টুকু গাড়ির সামনে পিছনে দৌড়াইয়া,আত্মঘোষণা করিয়া ভোদাই তাহার সামাজিক কর্তব্যে অবিচল থাকে।যদিও ন্যাজ কাটা হওয়ায় এবিষয়ে তাহার মানসিক পরিস্থিতি ঠাহর পাওয়া যায় নাই।

কুতকুতির ব্যস্ততা সর্বাপেক্ষা বেশি গিয়াছে কারণ দত্তগিন্নি, বোস জায়া ও নকুড় মিষ্টান্ন ভান্ডারের সম্মুখের আড্ডাস্থল এই পুরা এলাকাটি ঘুরিয়া পরচর্চার দলিল সংগ্রহ তো ফেলনা কাজ নয়। প্রকৃত সত্য, সেও বুঝি কিছু জানিত।তবে ম্যাওভাষাভিন্ন অপর জবান মুখে না লওয়ার ঘোর প্রতিশ্রুতি বলিয়া কথা !

রামাধীন কোনো চঞ্চলতা প্রকাশ করে নাই। মা -ছেলের ঘরের মেঝেতে পড়িয়া থাকা অভুক্ত এমাজনের কাঁচা পেঁপের শেষতম টুকরাটি চাখিয়া দেখিবার কিঞ্চিৎ ইচ্ছা তাহার হইয়াছিল, কিন্তু ত্রিকালদর্শনের প্রাজ্ঞতা হেতু নিজেকে সংবরণ করে। কুম্ভকে শেষ মুহূর্তে ছুটিয়া সাড়ে একশো একুশ নম্বর বাটীর ভগ্নাংশের দিকে যাইতে সে দেখিয়াছিল। সন্ধ্যার পীতাভ আকাশে বার দুই ডানা ঝাপ্টাইয়া রামাধীনও সেই পানে উড়িয়া যায়।

প্রাথমিকভাবে গুরুচণ্ডা৯ র 'হরিদাস পালেরা' ব্লগবিভাগে প্রকাশিত

একটি অবাস্তব গল্প

সোমেন বসু

শিরশিরে অনুভূতি জাগিয়ে একটা সাপ সড়সড় করে চলে গেল। একটা পেঁচা ডাকলো ধারেকাছেই। একটা কাকও। কাঁচাঘুম ভেঙ্গে। একটু দূরে মাঠের মধ্যে একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ তাকিয়ে আছে। শিয়ালও হতে পারে, ভামও। রাতচরা এবং দিনচরা দুদলই বেশ বিরক্ত হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। স্বাভাবিক। নিজস্ব কাজ বা বিশ্রাম, দুয়েরই ব্যাঘাত ঘটলে শুধু মানুষ নয়, সমস্ত প্রাণীই বিরক্ত হয়।

কিন্তু সেই বিরক্তির কারণ যখন অপেক্ষাকৃত বলশালী কেউ তখন সেই বিরক্তি গোপন করে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। পুরো গোপন করা না গেলেও অন্তত তাকে প্রতিবাদের রূপ তো দেওয়াই নেই। এও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম। তাই মানুষগুলোও কিছু বলছে না। তাদেরও ঘুম ভেঙ্গেছে। পাড়া জুড়ে ইতস্তত ক'টা কুপির আলো আর হঠাত করে হাট ছেয়ে ফেলা তিনটে পুঁতি ব্যাটারীর দশ টাকা দামের কয়েকটা টর্চের হঠাত হঠাত জ্বলে উঠেই নিভে যাওয়া দেখে মালুম হচ্ছে। বিরক্তিই উঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এখন তার জায়গা নিয়েছে উৎকণ্ঠা আর ভয়।

কুকুরগুলো তো আরও সেয়ানা। রাতে গ্রামে কোনও বাড়িতে কুটুম আসলেও চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। কিন্তু এখন টু শব্দ দূরের কথা, টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না একটারও।

ওরা বলশালী। ওরা পুলিস। ওদের কাছে বন্দুক থাকে। ওরা এসেছে। এই মাঝরাতে। গ্রামে ঢোকার মেঠো রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে আছে ওদের দুটো গাড়ি। আলো নিভিয়ে, চুপ করে, গুঁড়ি মেরে।

কোনও বাড়িতে ঢোকেনি, সোজা চলে গেছে গ্রামের উত্তরধারের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অলসভাবে ছড়িয়ে পড়ে থাকা মাঠটাতে। নির্দিষ্ট করলে, মাঠের পশ্চিমপাড়ে, যেখানে বিরাট বাঁশঝাড় আর একটা ছোটখাটো ঝোপজঙ্গল রয়েছে, তার ধারে।

মোট আটজন। একটা ছোট বৃত্ত। চারটে বড় পাঁচ ব্যাটারীর টর্চ। জ্বলছে। একটা তার মধ্যে মাঝেসাঝে একটু পাড়াটা বা মাঠে চোখ বোলাচ্ছে। যেসব মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণীরা তাদের এই কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছে, তাদের মধ্যে কোনও অবাঞ্ছিত চাঞ্চল্য ঘটছে কিনা মেপে নিচ্ছে। আর বাকি তিনটে আলো স্থির। ঐ বৃত্তটার কেন্দ্রে। কেন্দ্র মানে ঠিক বিন্দু নয়। বরং আর একটা বৃত্ত। দু'জন কনস্টেবল শাবল দিয়ে ক্রমাগত ঝপাঝপ কুপিয়ে যার পরিধি আর গভীরতা সমানে বাড়িয়ে দিচ্ছে। তিনটে টর্চের সাথে পাঁচজোড়া চোখও ওই দিকেই নিবদ্ধ। বাকি একজোড়া চোখ আলাদা। সেও দেখছে ওদিকেই। কিন্তু ওই আলগোছে। মাঝেমাঝেই চোখ সরাচ্ছে। কখনও বুজছে। এই চোখজোড়ার মালিক গোটা দলটার মধ্যেই যাকে বলে অড ম্যান আউট। বাকিরা সবাই সশস্ত্র, সবার কাছেই থ্রি নট থ্রি রাইফেল, কেবল এই দলটার নেতা যে, স্থানীয় থানার মেজবাবু, এস আই দিবাংশু কর, যে সিগারেট টানছে, গর্ত খোঁড়াটা নজর করছে আর মাঝেমাঝে আড়চোখে ওই লোকটাকে দেখছে, তার খালি কোমরে সার্ভিস রিভলভার। কিন্তু এই লোকটা নিরস্ত্র। সুঠাম চেহারা, একটা চোখ আর ঠোঁটের কোনটা ফুলে রক্ত জমে আছে। পরনে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি আর আস্ত লুঙ্গি। দুটো হাত সামনে জড়ো করা। হ্যান্ডকাপ লাগানো। কোমরেও একটা মোটা দড়ি বাঁধা যার খুটটা পেছনে এক কনস্টেবলের শক্ত মুঠোয়।

সুপেন মণ্ডল খুব যে দরের ক্রিমিনাল তা নয়। উত্তর দিনাজপুর জেলার যে অংশটা ম্যাপে বকের গলার মতো সরু হয়ে উত্তর দিকে দার্জিলিং জেলায় গিয়ে আছাড় খেয়েছে, সেই এলাকায় গরু এবং ফায়ার আর্মসের চোরাকারবার অনেকেই করে থাকে। একপাশে বাংলাদেশ, একপাশে বিহার। পূর্ণিয়া, কাটিহার, মুঙ্গের।

মাল আমদানির স্বর্গরাজ্য। এই যে রায়গঞ্জ শহরে লুম্পেন্সির এত বাড়বাড়ন্ত, প্রায় সব চ্যাংড়াপ্যাংড়ার হাতেই নাইন এম এম শোভা পায়, সেগুলো সবই মুঙ্গেরি মাল। পুলিসকর্তারাও এসব ভালোই জানে আর এই র্যাকেটের লোকেদের সাথে তাদের বেশ খাইখাতিরেরই সম্পর্ক হয়। সুপেনের সাথেও তাই। কিন্তু গণ্ডগোল পাকালো বিকেলে থানায় এসপির ফোনটা। বড়বাবু ছুটিতে আছে। ফলে জ্ঞান, কিছু প্রচ্ছন্ন হুমকিও, সবটাই গেল দিবাংশুর ওপর দিয়ে। মেজাজটা খাট্টা হয়ে ছিলই। সেইসময়েই নজরে পড়লো থানার উল্টোদিকে বাজারের মধ্যে চোলাইয়ের দোকানটায় সুপেন ঢুকলো। ব্যস, আর যাবে কোথায়! বস্তুত, এসব সময়ে সুপেনের চেয়ে সফট টার্গেট বোধহয় আর কেউ হতেই পারে না। এমনিতে দিবাংশু জানে ইদানীং ওর কারবারের রমরমা বেড়েছে। আর সবচেয়ে ভালো ব্যাপার যেটা, এই ব্যাটা কোনও নেতার তাঁবে থাকে না। সম্পর্ক সবার সাথেই ভালো রাখে, কিন্তু ওরকম গুরুঠাকুর কেউ নেই।

নেশা জমে ওঠার মুখে আকস্মিক তলবেও লোকে বিরক্ত হয়। কিন্তু সুপেন সেই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মটা মনে রাখেনি। বাংলার ঘোরেই হয়তো। ফলে তুলে আনার সময় কিছু বলপ্রয়োগের চিহ্ন আপাতত শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছে। ওইটুকুই। থানায় নিয়ে আসার পর দিবাংশু ওকে বুঝিয়েই বলেছে ওপরমহলের চাপের জন্যই ওকে আপাতত একটু ঢোকাতে হচ্ছে। আর সাথে ওকে কিছু মালের হদিশ দিতে হবে। সিজার লিস্টটাও তো দেখাতে হয়। সুপেন জানে এগুলো। কিন্তু একটু ঘাড়ট্যারা করে বসেছিল অনেকক্ষণ। আর তারপর বললো তো বললো, এই আড়তের হদিশটাই দিলো। কেন? বাংলা? সে যাই হোক, সব মিলিয়ে সুপেনের ভাবসাব ভালো লাগেনি দিবাংশুর। তাই কোমরে দড়িটা পরাতে হল। ফোর্সও একটু বেশি নিতে হল। বলা তো যায় না! যতই গেলাস ভাগাভাগি হোক না কেন, দুইতরফের পারস্পরিক সম্পর্কটা তো অবিশ্বাসের।

পেয়ে গেছে। একটা বড়সড় প্লাস্টিকের প্যাকেট। সুন্দর

বেঁধে প্যাকিং করে রাখা। যে দুজন খুঁড়ছিলো, তাদেরই একজন প্যাকিংটা খুলে ফেললো। ছটা নাইন এমএম, দুটো ওয়ান শাটার, একটা অটোমেটিক সিক্সার। কিছু বুলেটও আছে। মন্দ না, ভাবলো দিবাংশু। কিন্তু ও টর্চ মেরে গর্তের মধ্যে কি হাতড়াচ্ছে? আরেকজন যে খুঁড়ছিলো, নেপালি কনস্টেবল সুদেশ থাপা, সে? দিবাংশু ওর পাশে গেলো। উঠে পড়েছে সুদেশ, হাতে একটা ছোট্ট প্যাকেট। উঠেই তাকালো দিবাংশুর দিকে, দিবাংশু সুপিনের দিকে, প্যাকেটটা নিতে নিতে। সুপিনের ভুরুদুটো বিশ্রীরকম কুঁচকে গেছে। প্যাকেটটা খুলে টর্চটা জ্বেলে তার মধ্যে উঁকি দিলো দিবাংশু। মুখটা বের করলো কয়েক মুহূর্ত পর। সুপিনের দিকে তাকিয়ে বললো, "এসবও শুরু করেছিস!"

অন্ধকারে কেউ খেয়াল করলো না, প্যাকেটের ভেতর থেকে মুখটা বাইরে আনার মধ্যে মুখের বিস্ময় আর উত্তেজনার রেখাগুলো মিলিয়ে দেওয়ার জন্য এস আই দিবাংশু করকে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে হল।

২.

ভোরের দিকে যখন রত্নার ঘুমটা গাঢ় হতে শুরু করেছে, তখনই এলো আক্রমণটা। ওর প্রথমে মনে হলো কোনও জন্তু। হ্যাঁচড়প্যাঁচড় করে কোনওরকমে একটু হাত-পা ছুঁড়তে চাইলো। বুঝলো, সম্ভব না। তখন, চিৎকার করতে চাইলো। সেও হলো না। গলা দিয়ে অস্ফুট গোঙানির মতো কিছু একটা আওয়াজ বের হলো। ও বুঝলো, ওর দম আটকে যাচ্ছে।

আসলে রত্না ঘুমের মধ্যে ছিলো তাই, নইলে এই আক্রমণের সাথে ও অপরিচিত নয়। কোনও কিছুতে প্রচণ্ড খুশি হলে বা আনন্দ পেলে দিবাংশু এরকমটা করে। ঘুমটা ভালো করে কাটার পর সারা শরীরময় প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়েও ও বুঝতে পারলো দিবাংশু কোনও কারণে খুব আনন্দিত হয়েই ভোররাতে বাড়ি ফিরেছে।

ব্যাপারটা মিটলো একসময়। দিবাংশু আর সময় নষ্ট করলো

সূচীপত্র

না। ছাড়া জামার মতো রত্নার যন্ত্রণাক্লিষ্ট শরীরটা বিছানায় ফেলে রেখে তড়াক করে উঠে পড়লো। একটা সিগারেট ধরালো। মোবাইলটা নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো। দরজা বন্ধ করার শব্দ আসলো। কোনও জরুরি ব্যাপারই বটে। উঠে পড়লো রত্না। গোটা শরীরটা টাটাচ্ছে। কিন্তু চা তো বসাতেই হবে।

কিন্তু ফোনটা কাকে করা যায়? বড়বাবু? অসম্ভব! পুরো ক্ষীরটা নিজে মেরে দেবে! এস পি? হুম... করা যায়... কিন্তু...! আচ্ছা, সরাসরি হোম সেক্রেটারিকেই জানালে কেমন হয়? এটা তো সেই লেভেলেরই ব্যাপার। দিবাংশু নম্বর ডায়াল করে।

আর মিনিট দশেকের মধ্যেই ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। পকেট হাতড়ে প্যাকেটটা আর কোমর হাতড়ে রিভলবারটা একবার অনুভব করে নেয়। রত্না তখন সবে বাথরুম থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকছে চা বসানোর জন্য। দিবাংশু বলে...

"শোনো, আমি বেরোচ্ছি। কলকাতা যাচ্ছি। ফিরতে রাত হবে। নাও ফিরতে পারি..."

"চা খেয়ে যাবে না?"

"না... সময় নেই..."

দিবাংশুর পুলিস লেবেল লাগানো সাদা টাটা সুমোটা যখন চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে দক্ষিণমুখে দৌড় দিলো তার ঠিক মিনিট চল্লিশেকের মধ্যেই আরও একটা পুলিস লেবেল লাগানো জমকালো মাহীন্দ্রা স্করপিও একইমুখে ছুট লাগালো। উত্তরবঙ্গের এই ক্ষুদ্র জনপদে এতক্ষণে ভোরের আলো ফুটে যাওয়ার কথা, কিন্তু হাইরোডের ধারে নিজের গুমটি চাদোকানটার উনুনে আঁচ ধরাতে ধরাতে বুড়ো চাদোকানি দেখলো আজ আকাশটা কেমন জানি গুম মেরে রয়েছে।

৩.

টেবিলটা গোল। আর তার ঠিক মাঝখানে রাখা রয়েছে

জিনিসটা। তার দ্যুতিতে টেবিলটা, ঘরটা তো বটেই, রাজ্য তথা দেশীয় রাজনীতির অতীত এবং ভবিষ্যতের অনেকটা পর্যন্ত আলোকিত হচ্ছে।

জিনিসটা একটা মুকুট। ছোট্ট। আক্ষরিক মুকুট না বলে মুকুটের রেপ্লিকা বলাই ভালো। খাঁটি সোনার। হবেই। তখনকার রাজারাজড়ারা রাজকীয় ঠাটবাট সম্বন্ধে ভালোই সচেতন ছিল। আর এ তো খোদ ইংল্যান্ডেশ্বরীর উপহার। প্রাপক কোচবিহারের মহারাজ। ঘোষিতভাবে মহারাজের শিল্পসংস্কৃতির চেতনা এবং তার প্রজাপরায়ণাতে মুগ্ধ হয়ে রানী তাকে এই উপহার দিয়েছিল। নিন্দুকেরা অবশ্য বলে, ওসব বলার কথা। আসল ব্যাপার, কোচবিহারের রাজা ব্রিটিশ বশ্যতা স্বীকার করার তোফাস্বরূপ এই রত্নখচিত দান। হ্যাঁ, রত্নও আছে বটে! ছোট মুকুটটার ওপর পাঁচখানা কুচি হীরে এই দিনের বেলাতেও ঝলসানো দীপ্তি ছড়িয়ে সে কথা প্রমাণ করছে।

ফলে বস্তুটার অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক মূল্য নিয়ে তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু, আপাতত সেসবকে ছাপিয়ে এর রাজনৈতিক মূল্যটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। বস্তুটি আপাতত একটি নির্ভেজাল চোরাই মাল। ভালো ভাষায় বললে হারানিধিও বলা যেতে পারে। এটি রক্ষিত ছিলো কোচবিহার রাজবাড়ীর মহাফেজখানায়। বেশ আঁটোসাঁটো নিরাপত্তাবলয়ের মধ্যে। কিন্তু বজ্রআঁটুনির মধ্যেই ফসকা গেরো থাকে গুরুজনেরা বলে গেছেন। আট বছর আগে সেইরকম কোনও ফসকা গেরো দিয়েই বেপাত্তা হয়ে যায় মুকুটখানা। হৈ হৈ ওঠে চারদিকে। "বাঙালির আর কিইবা থাকলো!" হাহাকারে রাজ্যের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। তৎকালীন রাজ্য সরকার, যারা নাকি তার দু'বছর পরেই গদিচ্যুত হবে, তারা তখন এমনিতেই নানান অশান্তিতে জেরবার। তার মধ্যে এই শাকের আঁটিটাও যখন চাপলো, তারা আর রিস্ক না নিয়ে সিধা সিবিআইয়ের ঘাড়ে ঠেলে দেয় কেসটা। তারপর চারবছর ধরে সিবিআইয়ের গোয়েন্দাদের গাড়িতে সাতমণের বেশিই তেল পোড়ে, জনগণ নামক রাধা নেচে সরকারও উলটে

দেয়, কিন্তু মুকুটের হদিশ মেলে না। সিবিআই কর্তারাও কিছুদিন পরে সাংবাদিক সম্মেলন করে বেশ ভারি ভারি শব্দ বলে কেসটা থেকে হাত ধুয়ে ফেলে, বাঙালিও বুঝতে পারে, তাদের অনেক কিছুই রয়ে গেছে। অতএব একটা মুকুটের কথা ভুলে গেলেও খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

এহেন মুকুটই কিনা পাওয়া গেলো সুপেন মণ্ডলের জিম্মায়! মাটির তলে! সযত্ন অবহেলে! ভাবা যায়!

৪.

টেবিল ঘিরে আপাতত সাতজন। মুখ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্য ও শিক্ষামন্ত্রী। ক্ষমতার বিন্যাসে নাকি এরা মন্ত্রীসভার দুই এবং তিন। মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসা তার সুন্দরী, যুবতী পিএ। দুই দুঁদে আমলা, মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব। এবং এস আই দিবাংশু কর। অড ম্যান আউট! কিন্তু হলেও আজকের বৈঠকের উপলক্ষ এবং মধ্যমণি এই লোকটাই।

মুখ্যসচিব কথা শুরু করলো...

"সুপেন মণ্ডল কি কনফেস করলো মি.কর? মানে জিনিসটা ওর কাছে এলো কি করে?"

"বলছে, অনেকদিন আগেই নাকি ওর কাছে এসেছে স্যার। যারা চুরিটা করেছিল, তারা নেহাতই চোর। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিংয়ের সঙ্গে জড়িত নয়। ওদের থেকে মালটা কিনে নেয় কোচবিহারের এজেন্টরা। কোচবিহার থেকেই হয়তো বেরিয়ে যেত জিনিসটা। কিন্তু তখন সিবিআই ইত্যাদির উৎপাতে ওরা ব্যাপারটা দিনাজপুরের এজেন্টদের হ্যান্ডওভার করে। তখন থেকেই এটা সুপেনের জিম্মায়। ও মূলত আর্মসের কাজ করে বলে ওর দিকে নজর পড়বে না, এরকমটাই হিসেব ছিল। আর সেটা মিলেও গেছে। তবে কার কাছ থেকে ও এটা পেলো, সেটা বলেনি। আমিও চাপ দিইনি। দরকারে দেবো স্যার.."

"হুঁ... সুপেন মণ্ডলও তাই বলছে..." স্বরাষ্ট্রসচিব বললো...

"ওনার ওপর রাগারাগিও করছে না?" মুখ্যসচিবের ঠোঁটের কোণায় একটু হাসি খেললো...

"হুঁ... উনি নাকি বলেছিলেন এই কেসে ওকে জড়াবেন না..." স্বরাষ্ট্রসচিবও হাসলো...

"মানে স্যার... এগুলো... আপনারা..." দিবাংশু সত্যি বুঝতে পারছে না। পারার কথাও নয়...

"সে বলছি..." স্বরাষ্ট্রসচিব আবার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ঘেরাটোপে, "একটা জিনিসে খটকা লাগছে মি.কর... লোকটা এত সহজে আপনাকে জায়গাটা দেখিয়ে দিলো কেন?"

"এটা স্যার আমারও মনে হয়েছে..! আমি ওকে বলেছিলাম কিছু আর্মস রিকভার... মানে ওর কাছে যা যা ইললিগাল আর্মস আছে আর কী..."

"হ্যাঁ, সে আমরা জানি... ক্যারি অন..."

"হ্যাঁ স্যার..." ঢোক গিললো দিবাংশু, "ওই এই জায়গাটা বললো। আর সেখানে খুঁড়তেই দেখি এটা... আলাদা করে রাখা ছিলো অবশ্য.. আর একটু ডিপে... মনে হয় স্যার, সেদিন ওর মাথা ঠিক কাজ করছিলো না.. নেশা করেও ছিলো... হয়তো মনেও ছিলো না ওখানেই ওটা রেখেছে..."

"ওয়েল, মি.কর..." মুখ্যসচিব বেশ ডিসিসিভ ভঙ্গিতে শুরু করলো, "লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট। প্রথমেই আপনাকে অভিনন্দন জানাই এই ব্রেক থ্রুটার জন্য। আপনি বিষয়টা সরাসরি আমাদের জানিয়েও খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। বাট ফ্রম নাউ, ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ ইট। সুপেন মণ্ডলকে ইতিমধ্যেই আমরা কলকাতায় আনিয়ে নিয়েছি। ক্রাউনটাও রইলো আমাদের জিম্মাতেই। বুঝতেই পারছেন আশা করি, বিষয়টা কতো গুরুত্বপূর্ণ। আপনাকে আর একটা কাজই করতে হবে, কাগজপত্র

থেকে সুপেন মণ্ডলকে জাস্ট ওয়াইপ আউট করে দিন। মানে কাল ওকে তোলার যদি কোনও কাগজপত্র আপনাদের কাছে থেকে থাকে আর কী। আর পারলে আপনার মেমোরি থেকেও। নাউ দ্যাটস অল, মি.কর। থ্যাঙ্ক য়ু অ্যান্ড কনগ্র্যাচুলেশনস এগেইন... ওঃ হো হো... সরি সরি... আসল কথাটাই বলা হয়নি... আপনার প্রমোশনের ব্যাপারটা আমরা দেখছি...." মিষ্টি হাসলো লোকটা!

"কিন্তু স্যার..." আর্তনাদ করে উঠলো দিবাংশু! ওর মুখচোখ থমথম করছে...

"স্যার আপনার নেক্সট মিটিংয়ের টাইম হয়ে গেলো..." মুখ্যমন্ত্রীর যুবতী পিএ বলে উঠলো। মুখ্যমন্ত্রীকেই...

"হ্যাঁ, উঠি... আচ্ছা, একটা কাজ করুন। এর জন্য যে সিআইডির স্পেশাল টিমটা বানানো হবে, তাতে এই ভদ্রলোককে যাতে ইনক্লুড করে নেওয়া হয়, সেটা বলে দিন... আচ্ছা, নমস্কার! ভালো থাকবেন...!"

প্রথম অংশটা পিএর প্রতি, মাঝেরটা মুখ্যসচিবের প্রতি, এবং শেষটা দিবাংশুর প্রতি বলে মুখ্যমন্ত্রী উঠে দাঁড়ালো। হাতটা জোড় করা। ঠোঁটে অমায়িক হাসি ঝুলছে।

সবাইই উঠে পড়লো। স্বাভাবিক। অগত্যা দিবাংশুও। কিন্তু ও বেচারি মুখ্যমন্ত্রীকে পালটা নমস্কার করতে ভুলে গেলো!

রাতে যখন দিবাংশু বাড়ি ঢুকলো, রত্না ড্রয়িংরুমে বসে টিভি দেখছে। একটা খবরের চ্যানেল চলছে। দিবাংশু দেখলো, সেই অমায়িক হাসি দেওয়া লোকটা। প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে। লোকটা বলছে...

"কোচবিহারের রাজমুকুট বাংলার সম্পদ। আমরা সেটা ভুলে যাইনি। প্রথম দফায় অনেক কাজকর্মের মধ্যে আমরা এদিকে মনোযোগ দিতে পারিনি। আর তখন সিবিআই দেখছিলও ব্যাপারটা। যাইহোক, আমি কাউকে দোষারোপ করছি না। তবে এটুকু জোরগলায় বলছি, বাংলায় যোগ্য পুলিস অফিসার এবং

কর্মীর অভাব নেই। আমরা কেসটি রিওপেন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর জন্যে সিআইডির বাছাই করা অফিসারদের নিয়ে নতুন টিম করা হচ্ছে। কোচবিহারের রাজমুকুট আমরা যেকোনও মূল্যে ফিরিয়ে আনবোই। বাংলার মানুষের কাছে এ আমাদের প্রতিজ্ঞা!"

"শুয়োরের বাচ্চা...." গাড়ীর চাবিটাই টিভির দিকে ছুঁড়ে মারলো দিবাংশু। টিভিতে না লেগে লাগলো পাশের দেওয়ালে বুকে দাঁড়িয়ে থাকা একটা টিকটিকির গায়ে। পালালো টিকটিকিটা। লেজটা মাটিতে পড়ে কাঁপতে লাগলো তিরতির করে। রত্না তাড়াতাড়ি রিমোট টিপে বন্ধ করলো টিভিটা। আর করতে করতেই আঃ বলে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে ব্যথায় কুঁকড়ে যেতে যেতে অনুভব করলো, তীব্র আনন্দ আর তীব্র রাগের অভিব্যক্তি একইরকম হয়।

৫.

ঠিক সাতদিন পর কোচবিহারের মহার্ঘ্য, ঐতিহাসিক রাজমুকুট উদ্ধার করলো সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দল। অফিসিয়ালি। মুখ্যমন্ত্রী পোজ দিল, বাইট দিল, বাংলার হৃতগৌরব উদ্ধারের পবিত্র কর্তব্য থেকে যে তার সরকার একমুহূর্তের জন্যও সরে আসেনি সে কথা জোর গলায় ঘোষণা করলো। এই উদ্ধারপর্বে এনকাউন্টারে নিহত হল সুপেন মণ্ডল। জানা গেল, সে ছিল আন্তর্জাতিক চোরাচালানচক্রের চাঁই। সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দলের সদস্য হিসেবে দিবাংশুও মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে অনেক রাতে বাড়ি ফিরলো। ফিরে রত্নার ওপর চড়াও হল।

সবই সুন্দর, মসৃণ এবং মোলায়েমভাবে মিটে গেলেও দিনপাঁচেক পরে আবার একটা লাশ পাওয়া গেল। সে তো রোজই রাজ্যের কোথাও না কোথাও অমন এক আধটা পাওয়া যায়। এমন কিছু গুরুতর খবর নয়। মুকুটরহস্যের সাথেও তার কোনও সম্পর্কও নেই...

করুণাধারা

দীপেন ভট্টাচার্য

১.

“জানো, অমল, আমিখুবঈশ্বরভক্তছিলাম,”নিরঞ্জনদার কথাগুলোর মধ্যে যতখানি স্বীকারোক্তি ছিল, তার চেয়ে বেশী ছিল ক্লান্তি।গ্রীষ্মের গুমোটে তাঁর ক্লান্তি আমি অনুভব করতে পারছিলাম। দূরে কোথাও কাক ডাকছিল, গ্রীষ্মের অশান্ত কাক। রাস্তার পিচ গলে যাচ্ছিল নিদাঘ কমোলতায়। নিরঞ্জনদার কুকুর কানু কুণ্ডলী হয়ে ঘুমিয়ে ছিল বিছানার নিচে।

শুয়ে ছিলেন নিরঞ্জনদা, তাঁরতোবড়ানো গালেতিনদিন না-কামানো দাড়ি, অপসৃয়মান সাদা চুল সময়ের সাথে ক্রমশঃই কপালকে উন্মুক্ত করছে, সেই প্রশস্ততায়জমছে স্বেদবিন্দু, গড়িয়ে পড়ছিল কপালের ধার ঘেঁষে বিছানায়। কপালের নিচে জ্বলজ্বল চোখ, কিন্তু চোখকে ঘিরে নির্ঘুম কালিমা। রাত জেগে নিরঞ্জনদা জীবনের গঠন খুঁজছেন, কিন্তু তাঁর জীবনের সময় ফুরিয়ে আসছিল। নিরঞ্জনদা নিজেকে জার্মান গণিতবিদ গিওর্গ ক্যান্টরের শিষ্য ভাবতেন। ক্যান্টর অসীমের সন্ধান করতেন, অসীম থেকে অসীমতর, মনে করতেন অসীমের ধারণা এসেছে ঈশ্বর থেকে, ঈশ্বর অসীম, কাজেই সেই ঈশ্বরের কীর্তিও অসীম হবে।

“কিন্তু সে আমাকে আশাহত করেছে বারবার।”কথাটা উনি খুব আস্তে বললেন, অনেকটা স্বগতোক্তির মত, বাইরের কাকের শব্দে চাপা পড়ল।

“কে আশাহত করেছে আপনাকে নিরঞ্জনদা, ঈশ্বর?”

ঈশ্বরের কাজই হল মানুষকে আশাহত করা, নিরঞ্জনদার এই স্বীকারোক্তি আমাকে বিস্মিত করে না। হতে পারে অসীমের গঠন সন্ধান করতে গিয়ে নিরঞ্জনদা আশাহত হয়েছেন। সসীম জীবনে অসীমকে শেষ পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারেন নি।

তাঁর মাথাটা বিছানার ওপর অল্প নড়ে । তারপর বলেন,"ইসহাক মাস্টারকে ছেড়ে দেয়া উচিত হয় নি।"

"ইসহাকমাস্টার কে, দাদা?"

"ইসহাকমাস্টার আমাদের গ্রামের মেয়েদের স্কুলে পড়াত। অঙ্ক, ভূগোল, ধর্মশিক্ষা যখন যেমন লাগে। ১৯৭১ সন, আমরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে যাব বলে বসে আছি। যুদ্ধ করার জন্য যথেষ্ঠ অস্ত্র নেই। অস্ত্র কবে আসবে, তারপর আমাদের ডাক পড়বে।"

এটুকু বলে নিরঞ্জনদার কণ্ঠস্বর ঘরের বাতাসের কোটি কোটি অণু পরমাণুকে আর আন্দোলিত করার শক্তি রাখে না, স্বরতন্ত্রী হাল ছেড়ে দেয়। তাঁর কপালে ডান করতল রাখি, ঘামের নিচে ত্বক আমার আঙুলকে উষ্ণ করে।

নিরঞ্জনদার পিসিমা, তাঁর একমাত্র জীবিত স্বজন, একটা জলভরা ডেকচি নিয়ে ঘরে ঢোকেন, উনি নিরঞ্জনদাকে জলপট্টি দিতে চান। পিসিমাকে বলতে চাই, "কষ্ট করে লাভ নেই, জলপট্টি ওনার কোনো কাজে আসবে না।" কিন্তু আমি বলি, কিছুটা নিজেকে আশ্চর্য করেই, 'ইসহাক মাস্টার কী করেছিল, পিসিমা?'

অমিতা পিসিমা নিরঞ্জনদার আপন পিসিমা নন, নিরঞ্জনদার থেকে বছর পনেরো হয়তো বড় হবেন। ঋজু মানুষ। জলের ডেকচিটা নামাতে নামাতে বললেন, "যুদ্ধের সময় ইসহাক মাস্টারকে রাজাকার বলে গ্রামের ছেলেরা ধরেছিল, সে নাকি পাকিস্তানি সেনাদের বল্লায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।"

তারপর? জিজ্ঞেস করি।

"ছেলেরা নিরঞ্জনকে সালিশ মানে। নিরঞ্জনই ইসহাককে

চাকরিটা করিয়ে দিয়েছিল। নিরঞ্জন জিজ্ঞেস করেছিল, ‘ইসহাককে বল্লা যেতে কেউ দেখেছে?’ কেউ নাকি দেখে নি, কথাটা কিছুটা শোনা। নিরঞ্জনের কথায় ছেলেগুলো ইসহাককে ছেড়ে দিল।”

নিরঞ্জনদার গলা থেকে একটা শব্দ বের হয়। তাঁর মুখের কাছে কান পাতি, নিরঞ্জনদা ফিসফিস করে বলেন,“ঈশ্বরের কথায় ছেড়েছি।”

অমিতা পিসিমা বলতে থাকেন, “দুদিন বাদে ভোরে ইসহাক পাক বাহিনিকে নিয়ে আমাদের গ্রামে নিয়ে আসে। আমরা বাঁচি, তবে অনেকেই বাঁচে না। যুদ্ধের পরে ইসহাককে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।”

নিরঞ্জনদা আবার যেন কিছু বলতে চান। কান পাতি। উনি বলেন, “ঈশ্বর করুণা করতে চেয়েছিল।”

দুপুর গড়িয়ে বিকেল পড়ে। কুকুর কানুর ঘুম ভাঙে। বিছানার নিচ থেকে বেড়িয়ে এসে আড়মোড়া ভাঙে। কানুর গায়ে কালো চুল, কপালে সাদা লম্বা দাগ।পিসিমা ভেতরে যান, কানু তার পেছন পেছন যায়।

২.

ঘরে বই-ঠাঁসা পুরোনো দুটো আলমারি, কাঠের টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, আর এক পাশে বিছানা। টেবিলের ওপর চার-পাঁচটা বাঁধানো খাতা। হয়তো তাতে নিরঞ্জনদা লিখেছেন, সব অসীম সংখ্যা এক নয়। হয়তো অসীম থেকে অসীমতর সংখ্যা কল্পনা করা যায়। সেইসব খাতা অপরিচিত গাণিতিক সংকেতে পূর্ণ, সেই সংকেতের পাঠোদ্ধার কে করবে? বাইরে সরু রাস্তাটা উপচে পড়ছিল রিক্সার ভিড়ে। গ্রীষ্মের তৃষ্ণার্ত কাকের দল তারস্বরে চিৎকার করছে বিদ্যুতের তারের ওপর বসে। সেই গরমে আমি চাইছিলাম একটা শান্ত শীতল দুপুর, ঠাণ্ডা বাঁধানো মেঝে, বরফ-জমাট জল। আবহাওয়া সংবাদ শুনেছিলাম আজ সকালে, বৃষ্টি শুরু হবে কাল সন্ধ্যা থেকে। বৃষ্টির অপেক্ষায় বসে

ছিল শুষ্ক শহর বহুমাস।

নিরঞ্জনদা সেই সন্ধ্যায় বেঁচে ছিলেন, পরদিন দুপুরেও ছিলেন। ঐ দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য জ্বরটা কম ছিল, কণ্ঠে জোরও পেয়েছিলেন। বাজার করে নিয়ে এসেছিলাম, অমিতা পিসিমা সেগুলো নিয়ে গেলেন ভেতরে।চেয়ার টেনে নিরঞ্জনদার পাশে বসলে উনি অস্ফূট কণ্ঠে কি যেন বললেন। ওনার কাছাকাছি মুখটা নিলে শুনলাম বলছেন, 'অমল, তুমি আমাকে একটা করুণার গল্প বল, তাহলে আমি তোমাকে একটা বেদনার কাহিনি শোনাব।'

নিরঞ্জনদা মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কোনো ব্যর্থতার কথা ভাবছেন, হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত অসমাপ্ত অধ্যায় যা কিনা ভেসে উঠছে আপন প্লবতায় তাঁর মস্তিষ্ককে বেদনায় আপ্লুত করে। সংখ্যা দিয়ে কি করুণা সৃষ্টি করা যায়? গ্রীষ্মের সকালে আমার রাতের না-ধোওয়া খাবার বাসনে যে পিঁপড়ারা আসে তাদের প্রতি কি আমি করুণা করি? নাকি একাধারে পৈশাচিক নরপতি ও ঈশ্বর হয়ে আমি সিদ্ধান্ত নেই হাজার পিঁপড়ার মধ্যে কয়েকটি পিঁপড়াকে বাঁচাতে। সেটুকুই আমার করুণা, এর বেশী কিছু না।

ব্যর্থতা সঙ্গী ভালবাসে, তাই নিরঞ্জনদার প্রশ্নে যে স্মৃতি মুহূর্তে আমার মনে পড়ল তা একান্তই ব্যর্থতার। বহু তীক্ষ্ণ বেদনা ছাড়িয়ে একটি স্বল্প-স্থায়িত্বের ঘটনা স্মৃতিতে ভেসে ওঠে, বলতে শুরু করি, "আমার বয়স তখন কম ছিল। এক ভিড় রাস্তায় হাঁটছিলাম। সাদা শাড়ী-পড়া এক তরুণী কোনো অন্ধদের প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্য তুলছিল। তার কালো লম্বা বিনুনি এখনো মনে পড়ে। সারাদিন হেঁটে তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। আমাকে বলল, 'ভাই, অন্ধদের জন্য একটা টাকা দেবেন?'আমার কাছে টাকা ছিল, কিন্তু যা হয়, মুখ দিয়ে বের হল, 'ভাংতি নেই।' সেই তরুণী আকুল হয়ে বলেছিল,'ভাংতি করে দেব, ভাই, আপনি দিন।' আমাকে আপনি করে সম্বোধন করেছিল, আমি ছোট ছিলাম কিন্তু তবু সে আমাকে আপনি করে বলেছিল। কিন্তু আমি থামি নি, চলে এসেছিলাম। এরপর ২০ বছর পার হয়েছে, সেই স্মৃতি এত বছর

পরেও ভুলি নি, সেই মেয়ের আশাহত মুখ মনের কোথায় গেঁথে আছে। সেদিন একটা টাকা দিয়ে ব্যর্থতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত থাকতে পারতাম।”

আমার কাহিনিটা করুণার হল না, বরং বেদনার হল। আমি করুণা করতে পারি নি। নিরঞ্জনদা বুঝলেন, মনে হল হাসলেন - বেদনারই হাসি। তারপর ভাঙা গলায় বললেন, “তার নাম ছিল করুণা। আমাকে বলেছিল, দাদা আমাকে উদ্ধার করুন। আমি পারি নি।”

পিসিমা ঐ সময়েই চা নিয়ে ঢুকলেন। দু কাপ চা। টেবিলের ওপর রাখলেন। উনি নিরঞ্জনদার কথা শুনতে পেয়েছেন কিনা বুঝতে পারলাম না। করুণার কথাটা তাঁকে জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে কি হবে না এ সব ভাবতে ভাবতেই নিরঞ্জনদা বললেন, “করুণার বর ওকে ফেলে চলে গিয়েছিল, হয়তো বিয়ে করেছিল অন্য জায়গায়। পরিত্যক্তা করুণার বাবা-মা আমাকে অনুরোধ করেছিল মেয়েটাকে উদ্ধার করতে, ওকে পাড়ায় রাখা যাচ্ছিল না।”নিরঞ্জনদার কণ্ঠস্বর আবার পশ্চাতপটের মৃদু কোলাহলের সঙ্গে মিশে গেল।

পিসিমার দিকে তাকালাম, ওনার দৃষ্টি জানালার কড়িবর্গা পার হয়ে পাশের বাড়ির হতশ্রী দেয়ালটায় আটকে ছিল। উনি সব কথাই শুনতে পেয়েছেন। আবার আমার কান নিয়ে আসি নিরঞ্জনদার মুখের কাছে। শুনি বলছেন, “করুণাকে আমি ঠিকই ঢাকায় নিয়ে আসতাম, কিন্তু গ্রামের অন্য লোকেরা আমাকে ভয় দেখাল। বলল, আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ না হলে ওকে গ্রাম থেকে বের হতে দেবে না। বলবে, আমি অপহরণ করেছি। আর হিন্দু ধর্মীয় মতে তো বিচ্ছেদ হয় না। অগ্নিসাক্ষী করে যে বিয়ে তাতে কি বিচ্ছেদ হতে পারে?” এই বলে নিরঞ্জনদা হেসে ওঠেন - জোর করে অট্টহাসি যেটা পরিণত হয় দমকা কাশিতে। তারপর বলেন, “অগ্নিসাক্ষী - সে শুধু নারীর জন্য, করুণার বর আর একজনকে বিয়ে করে সুখেই আছে। ঢাকায় উকিলের সাথে

কথা বলেছিলাম। কোনো লাভ হয় নি।”

“তারপর?” নিজের অজান্তেই প্রশ্নটা মুখ থেকে বের হয়ে এল। “তারপর?” যন্ত্রণায় নিরঞ্জনদার কপালের চামড়া কুঁচকে ওঠে, দুটো ভুরু এক হয়ে যায়। মনে হল এরপর হাসলেন, শুষ্ক ফেটে যাওয়া ঠোঁটের দুদিক প্রসারিত হয় কালো ছোপ-ধরা গালে। “আমার ওপর ভরসা করেছিল করুণা, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিল।করুণা অপেক্ষাও করেছিল - দশটি বছর।তারপর একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল।”

“করুণার লেখা সব চিঠি ঐ আলমারিটায় পাবে।” হাত দিয়ে আলমারিটা দেখানোর চেষ্টা করেন নিরঞ্জনদা, করুণার ব্যাপারে যেমন সাহস করতে পারেন নি, শীর্ণ হাতটাও যেন তেমন - ঐকান্তিক ইচ্ছের অভাবে - বিছানা ছেড়ে বেশীদূর উঠতে পারে না। নিরঞ্জনদার যুক্তির গণিতে ঈশ্বর কি সরাসরি আবির্ভূত হতেন যে তাকে করুণাকে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছিলেন? সেটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করা হয় না, সেই প্রশ্নের সময় বোধহয় পার হয়ে গিয়েছিল।

বিকেলে নিরঞ্জনদার কলেজের দুজন সহকর্মী আসেন। তারা কানুকে ঘরের মধ্যে দেখে ঘাবড়ে যায়। কানু বিছানার নিচ থেকে, মাথাটা সামনের দু-পায়ের মধ্যে রেখে গভীর কালো চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুই সহকর্মী অস্বস্তি নিয়ে চেয়ারে বসে ঘরটাকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। আমি বুঝি তাদের দৃষ্টি টেবিলের ওপর নোটখাতাগুলিতে প্রায়ই আটকে যাচ্ছে। ভাল লেকচার দিতেন বলে নিরঞ্জনদার সুনাম ছিল, এরা ভাবছিল তাঁর মৃত্যুর পরে যদি নোটগুলো হাতানো যায়। জানতাম ওগুলো দিয়ে এদের কোনো লাভই হবে না। ঐ খাতাগুলোতে নিরঞ্জনদা বাস্তবকে সংখ্যা দিয়ে গঠন করতে চেয়েছিলেন।আমি নিশ্চিত উনি তাতে সফল হন নি, কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টার গাণিতিক ভাষা এদের জন্য হবে দুর্বোধ্য। আমি তাদের প্রায় জোর করে বিদায় করে দিলাম।

এরপরে নিরঞ্জনদা আর ঘন্টা দুয়েক বেঁচে ছিলেন। খবর

পেয়ে স্কুলের বন্ধু মোস্তাক হাজির, ও এই পাড়াতেই থাকে, নিরঞ্জনদাকে চিনত, শ্রদ্ধা করত। আমাকে বলল, 'তোকে কিছু করতে হবে না, ট্রাকের ব্যবস্থা করছি।

নিরঞ্জনদা আচার-অনুষ্ঠান না করতে বলেছিলেন। পিসিমা শক্ত মানুষ, অবশ্যম্ভাবীর জন্য প্রস্তুত ছিলেন, নতুন একটা কাপড় নিয়ে এসে বললেন, "আর কিছু না কর, এই কাপড়টা পরিয়ে দিও।" আমি বললাম, "শ্মশানে চলুন।" উনি বললেন, "তুমি জান মেয়েদের যেতে নেই।" বললাম, "চলুন, আমাদের সমাজ তো এই ক'জনই, আপনাকে ছাড়া আমরা যেতে পারব না।" মোস্তাক, আমি, পিসিমা আর পাড়ার দুজন দেহর সাথে ট্রাকের পেছনে উঠলাম। কানু বাড়ির বন্ধ দরজার পেছনে ঘেউ ঘেউ করছিল। ট্রাক ছেড়ে যাচ্ছিল, চালককে থামাতে বললাম। নেমে বাড়ির দরজা খুলে কানুকে বের করে নিয়ে এলাম, ট্রাক যাত্রীদের বললাম, "এও হবে আমাদের শ্মশানবন্ধু।" কেউ আপত্তি করল না, মোস্তাক কানুকে ওপরে তুলতে সাহায্য করল। কানু শান্ত হয়ে গুটিশুটি হয়ে নিরঞ্জনদার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল।

সেই রাতে দিনের গরম কমে আসছিল, বাতাসের আর্দ্রতা আমাদেরকে কিছুটা শীতল করল। শ্মশানে পিসিমাকে চিতায় আগুন দিতে বলেছিলাম। উনি বললেন,"তা কি হয়, আমি বড় হয়ে এই কাজ করতে পারি না।"আমি একটা শলা দিয়ে কাঠে আগুন ধরাই। কানু এবার বোঝে নিরঞ্জনদাকে পুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, ও আগুনের চারদিকে দৌড়ায়, ঘেউ ঘেউ করতে থাকে, আগুন যে নিরঞ্জনদাকে চিরতরে অদৃশ্য করবে সেটা সেও বোঝে । অন্য লোকেরা বিরক্ত হয়, কানুকে সামলে নিয়ে দূরে ঘাসের ওপর বসি। কানুর চোখে চিতা জ্বলে।

প্রকৃতি যেন দাহ-কার্য সাঙ্গ হবার জন্য বসে ছিল। বৃষ্টি নামার আগে কিছু ছাই সংগ্রহ করি। আমরা বাড়ি ফিরি মুষলধারা বৃষ্টির সাথে। পরদিন গেল নিরঞ্জনদার বাড়ি খালি করতে, তার নোটখাতা আর কিছু বই আমার ছোট ফ্ল্যাটবাড়ির আরো ছোট

কামরায় নিয়ে আসি। মোস্তাক আসবাবপত্রগুলো বিলি করে দেয়। দুদিন পরে একটা গাড়ি ভাড়া করি, যদিও গাড়ি ভাড়া করা ছিল আমার জন্য নিতান্তই বিলাসিতা। অমিতা পিসিমাকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে নামিয়ে দিতে হবে, নিরঞ্জনদারই গ্রাম। কানুকেও শহরে রাখা যাবে না, আমি যেখানে থাকি সেখানে কুকুর রাখা যায় না, তাই কানুও চলেছে আমাদের সাথে, আমার আশা কানুকে ওখানে রেখে আসা যাবে। অমিতা পিসিমা ফিরে যাচ্ছেন তাঁর আপন ভাইপোর বাড়ি, তারা রাজি হয়েছে ওনাকে রাখতে।আমাদের সাথে ঘটে ছাই ছিল, নিরঞ্জনদার গ্রামের পাশে বেণু নদী, সেই নদীতে নিরঞ্জনদাকে ছড়িয়ে দেব বলে।

৩.

নিরঞ্জনদার মৃত্যুতে প্রকৃতি যেন সত্যিই দুঃখিত হয়েছিল, তাঁর চলে যাবার পর থেকে যেবৃষ্টি শুরু হয়েছিল সেটা থামছিল না। সেদিন রাস্তাতেও বেশ বৃষ্টি পেলাম। আমাদের চালক ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর একটি বড় বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের আগে অমিতা পিসিমা চিৎকার দিয়ে উঠেছিলেন, তাতে চালকের ঘুম ভাঙে, শেষ মুহূর্তে সে গাড়িটা তার লেনে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়।মানুষের কখন মৃত্যু হয় আর কখন হয় না সেটা হয়তো সম্ভাব্যতা তত্ত্ব দিয়ে বিচার করে চলে, এই দেশে বছরে কয়েক হাজার মৃত্যু হয় রাস্তার দুর্ঘটনায়। যতক্ষণ না সেই সংখ্যার কৌটা পূর্ণ হবে ততক্ষণ রাস্তার রক্তপিপাসু দেবতা দাবি করবে আরো মৃত্যুর। অমিতা পিসিমা ঈশ্বরের নাম নেন আর আমি রক্তপিপাসু দেবতাকে ফাঁকি দিয়েছি বলে তৃপ্তি অনুভব করি। চালককে কিছু গালমন্দ করি, ঘটনার আকস্মিকতা সামলাতে সে গাড়ি থামিয়ে চা খায়।

গ্রামে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর পার হয়ে গেল। জোর বৃষ্টিতে কাঁচা রাস্তায় কাদা জমে গাড়ির চাকা আটকে দিচ্ছিল। গাড়ি আর সেই ভাইপোর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। দৌড়ে যখন তাদের বাড়িতে ঢুকলাম আমরা দুজনে (এবং কানু) ভিজে একশা। বড়

দোতলা পাকা বাড়ি, বাইরে উঠোন। ভাইপো পিসিকে দেখে খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। বুঝলাম সেখানে বেশীক্ষণ থাকা যাবে না, কিন্তু কিছু কাজ অসমাপ্ত ছিল। একটা ছাতা মাথায় করে ঐ বাড়ি থেকে বের হয়ে নদীর ধার ধরে হাঁটলাম। নিরঞ্জনদার বেণু নদী বর্ষায় প্রাণ পেয়েছে, তাতে ভেসে যাচ্ছে কচুরিপানা, বালুভর্তি ঘটঘট-করা নৌকা। একটা উঁচু জায়গা থেকে নিরঞ্জনদার ছাই ঢেলে দিই বেণুর স্রোতে, মুহূর্তে সে বিলীন হয়ে যায় জলের নিচে।

অমিতা পিসির ভাইপোর বাড়িতে যখন ফিরলাম তৎক্ষণে বৃষ্টিটা থেমেছে, সূর্য ডুবু ডুবু করছে। আমি বললাম,“যাই পিসি। কানুকে কি এখানে রেখে যাওয়া যাবে?” এই প্রথম অমিতা পিসির চোখে যেন জল দেখলাম। তাও সামলে নিয়ে বললেন, “অমল, কানুকে রাখতে ওরা রাজি হচ্ছে না।” কানুকে যে ওরা রাখবে না সেটা আগেই বুঝেছিলাম, অমিতা পিসিকে যে থাকতে দিচ্ছে এটাই ভাগ্যের ব্যাপার যদিও এই ভাইপোকে পিসি কোলে পিঠে মানুষ করেছিলেন। অমিতা পিসিকে বিদায় জানিয়ে কানুকে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম।গাড়ি ছাড়ল, অল্প কিছুদূর যেয়ে চালককে গাড়ি থামাতে বললাম। তৎক্ষণে রাতের অন্ধকারটা চেপে বসছে, দিগন্তে একটা আবছায়া লাল আভা ভেসে আছে। আমরা তখনো গ্রামটা ছাড়াই নি। কানুকে গাড়ি থেকে নামিয়ে এক জায়গায় বসালাম। সে বাধ্য ছেলের মত বসে রইল।আমার ওকে ঢাকায় নেবার কোনো উপাই নেই। বললাম, “আমাকে ক্ষমা করিস, কানু। তোকে ঢাকায় রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।” কানু হয়তো আমার কথা বুঝল, সেই অন্ধকারেও কানুর গভীর কালো চোখে মনে হয় বেদনা দেখেছিলাম। রাস্তাটা এখানে কাঁচা, এদিক-ওদিক বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে, নিশ্চয় ওর ভাগ্যে কিছু জুটে যাবে।

গাড়ির চালক আমার এই কাজে আশ্চর্য হয়, কিছু বলে না। কুকুরের সঙ্গে মানুষের যে আত্মিক যোগাযোগ হতে পারে সেটা সে জানে কিনা জানি না। আবার গাড়িতে উঠে বলি, “চলেন।” আমি পেছনে তাকাই না। গাড়ি বড় রাস্তায় ওঠে, মিনিট দশেক

পার হয়, কাচের জানালার বাইরে অন্ধকার বিশ্ব দেখতে দেখতে ভাবি আমার করুণার আধার কতখানি। ভাবি, কানুর কাহিনি আর একটি বেদনার কাহিনি হয়ে রবে, কিন্তু এই বেদনাকে মুছে দেবার সিদ্ধান্ত তো আমার হাতে। চালককে বলি, “গাড়ি ঘোরান”। ফিরে আসি কানুকে যেখানে রেখে এসেছিলাম সেখানে, কিন্তু কানুকে দেখি না।

রাস্তাটার দু-পাশে ছোট ছোট একতলা বাড়ি, তাদের পাশ দিয়ে পায়ে-চলা গলি ঢুকে গেছে। পাশের বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসা বিদ্যুতের আলো চেষ্টা করছিলসেই গলিগুলোর পথকে চিহ্নিত করতে। তারই একটাতে ঢুকি, আলো-আঁধারে সংশয়ে পা ফেলি,পা ফেলতে ফেলতে কানুর নাম ধরে চিৎকার করি। পাশ দিয়ে দু-একজন চলে যায়, আমার দিকে তাকিয়ে, তারা ভাবে কানু বোধহয় আমার বন্ধু বা আত্মীয়। তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না, কত পথের কুকুরই না তারা দেখে। এইভাবে মিনিট পনেরো ঘুরি, তারপর বুঝি পথ হারিয়েছি। সময়ের সাথে সব গ্রামের মানুষও যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। বৃষ্টি মুষলধারে না পড়লেও বিরাম দেয় না কোনো। ছাতা চুঁইয়ে জল পড়ে জামায়, প্যান্টে। গলির কাদা জুতো পার হয়ে মোজাকে ভিজিয়ে আঠালো করে দেয়। হঠাৎ হঠাৎ গলিগুলো যেয়ে পড়ে কোনো ডোবার পাশে কিংবা সেগুন বাগানে। মাঝে মধ্যে বিজলির আলো তাদেরকে স্পষ্ট করে তোলে। ধীরে ধীরে একটা আতঙ্ক মনে দানা বাঁধে, এই গ্রাম থেকে আমার আর বার হওয়া হবে না। মনে হল যেন ঘন্টাখানেক এরকম গোলকধাঁধায় ঘুরলাম। মাঝে মধ্যে দু-একটা বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে মানুষ দেখি। ছেলে-মেয়েরা গানের রেওয়াজ করছে, কেউ পড়াশোনা করছে, টেলিভিশন চলছে, রান্নাঘরে পাত্রে তেল ফুটছে, মশলার গন্ধ আসছে। ঐ সন্ধ্যায় তাদের জীবনকে আমি ঈর্ষা করছিলাম। ভাবি, গ্রাম ধীরে ধীরে শহর হচ্ছে। ইচ্ছা করলে এদের দরজা ধাক্কা দিতে পারি, কিন্তু এদের কী বলব, আমাকে আশ্রয় দিতে? কানুর খবর জানে কিনা? আমার গাড়ি কোথায় আছে? এগুলোর

কোনোটাই যে ঠিক করা যাবে না সেটা পাঠক আমার থেকে হয়তো ভাল জানেন।

অবশেষে একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ি। সেখানে একটা বড় চাতাল দেখতে পেলাম, তাতে বাঁধানো উঁচু জায়গা, প্রায় ত্রিশ ফুট বাই ত্রিশ ফুট। তার ওপর ছাউনি, টিনের ছাদ, কাঠের স্তম্ভ দিয়ে ধরা। একটা টিমটিমে বিদ্যুতের আলো তার থেকে ঝুলছে। সেই আলোয় দেখলাম গোটা পাঁচেক মানুষ বসা শোয়া, নারী ও পুরুষ। হয়তো বৃষ্টিতে আশ্রয় নিয়েছে। এদেরকে কানুর কথা জিজ্ঞেস করব কি, বড়ইদ্বিধায় পড়লাম। একটা কুকুর হারিয়েছে, এরকম বেওয়ারিশ কত কুকুর বাংলার পথে ঘাটে ঘোরে। আমাকে দেখে মানুষগুলো চেয়ে রইল, আমি অজানা লোক। বৃষ্টি ইতোমধ্যে আবার চেপে বসল। উঁচু জায়গাটাতে উঠতে যাব, তখনই সেই টিমেটিমে বালবের আলোয় দেখলাম শ্বেৎপাথরের ফলক, বাধাঁনো চাতালেরনিচু দেয়ালে, তাতে কালো লেখা -

এইকাননেরমতোসুশীতলছায়া

কোথাআছেপৃথিবীতে, শ্রান্তআত্মাযেথা

একমুহূর্তেরতরেকরিবেবিশ্রাম! (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

শ্রী ঈশ্বর পাল কর্তৃক ক্লান্ত পথিকের উদ্দেশ্য নির্মিত, ১৪০৫

ঈশ্বর পাল? “ঈশ্বর পাল!”হতে পারে কি আমি এতদিন যা ভেবেছি তা ঠিক নয়?‘ঈশ্বর পাল’কথাটা মনেমনেভেবেছিলাম উচ্চারণ করেছি, আসলে আমার কথা বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে বারান্দায় শোয়া-বসা মানুষগুলোর কানে পৌঁছে গিয়েছিল। একজন বছর পচাত্তর বয়সের বৃদ্ধা শুয়ে ছিলেন আঁচল পেতে, তিনি মাথা তুলে বললেন, “ঐ যে আলো দেখা যায় ঐটা উনার বাড়ি।”

সেই বাঁধানো চাতালে আর উঠি না। বৃদ্ধা যে বাড়িটা দেখালেন সেখান থেকে একটা টিমটিমে আলোর বিচ্ছুরিত কিরণরেখা আমাকে পথ দেখায়। দেখি একটা টিনের দরজা, সেটা খোলা। চাতাল ছেড়ে সেদিকে এগোই, দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে যায়

ক্যাঁচক্যাঁচ করে। একটা ছোট আঙিনা, কিছু ফুলগাছ, তারপরে একটা ছোট একতলা ঘর। সেটার দরজায় টোকা দিই। কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। নিরুপায় আমি জোর গলায় চিৎকার করি, "ঈশ্বরবাবু, বাড়ি আছেন?" এর সেকেন্ড ত্রিশ পরে দরজাটা খুলে যায়, ভেতরে দেখতে পাই দাঁড়িয়ে আছে একজন - লম্বা সাদা চুল, শ্মশ্রুমণ্ডিত, চোখে চশমা, সেই চশমার কাচ পার হয়ে তার চোখ দেখা যায় না। সে বলে, "কে?"

আমি উত্তর দেবার আগেই ঘরে ঢুকে - ছাতাটা বাইরে রেখে - আমার কর্দমাক্ত জুতো নিয়ে। বলি, "আমি নিরঞ্জনদার বন্ধু। নিরঞ্জনদা মারা গেছেন।"

উনি আমার হাতটা ধরে নিজেকে সামলাতে চান, প্রায় খালি ঘরে একটাই চেয়ার, ওনাকে সেই চেয়ারে বসাই। অস্ফুট কণ্ঠে বলেন, "নিরঞ্জন চলে গেল?"বলি, "নিরঞ্জনদা আপনার ভক্ত ছিলেন। আপনার কথা মানতেন।" উনি আমার দিকে তাকান, সেই দৃষ্টিতে অবোধ্যতা। আমার হাতে সময় বেশী নেই, যা বলার এখনি বলতে হবে। বললাম, "আপনাকে ঈশ্বরতুল্য জ্ঞান করতেন?"উনি মাথা নাড়ালেন যেন এই কথাটা অস্বীকার করতে চাইছেন। আমি বলতে থাকি, "আপনিইওনাকে ইসাক মাস্টারকে ছেড়ে দিতে বলেছিলেন?"

ঈশ্বর পাল অবোধ্য দৃষ্টিতে ঘরের এক কোণায় তাকান, হয়তো মনে করার চেষ্টা করেন সেই সুদূর ঘটনা, তারপর বললেন, "আমি করুণা করতে চেয়েছিলাম।"

এই হল নিরঞ্জনদার ঈশ্বর, যাঁর কথা নিরঞ্জনদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। এই পৃথিবীর ঈশ্বরকে নিরঞ্জনদা বিশ্বাস করেছিলেন? যাঁর করুণার ফলে এই গ্রামের মানুষ মারা গিয়েছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, "আর করুণা মেয়েটি? তার প্রতি কি যথেষ্ট করুণা করা হয়েছিল?"

করুণার কথায় ঈশ্বর পালের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ

চুপ থেকে বললেন, “করুণাকে আমি ভালবাসতাম, তাই নিরঞ্জনকে না করেছিলাম।”

এরকমঅকপট স্বীকারোক্তি আশা করি নি, তাহলে করুণার সঙ্গে স্বার্থপরতা জড়িত ছিল। “তারপর?”আমার কণ্ঠে ছিল তীক্ষ্ণতা।

“আমি করুণাকে উদ্ধার করতে পারি নি, আমি কাপুরুষ ছিলাম।”শেষের কথা কয়েকটা মিলিয়ে যায় নিস্তব্ধতায়, বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে।

“করুণার কোনো খবর জানেন?” উনি মাথা নাড়ালেন, জানেন না।

ঈশ্বর পালের কথা শুনে ক্রোধ হল, তারপর ক্রোধ প্রশমিত হল। বললাম, “তাই এখন সমস্ত করুণা ঐ ছাউনির পেছনে ঢালছেন?”

আমার শ্লেষ হয়তো তিনি ধরতে পারলেন, বললেন, “আমি জানি করুণা সবসময় কার্যকরি হয় না, কিন্তু এছাড়া আমাদের কী আছে বলুন?”

আমি শান্ত হই, হয়তো ক্রোধ ও শ্লেষের অর্থহীনতা বুঝতে পেরেই। হয়তো এই কাহিনিতে আমার অংশগ্রহণের সীমাকে অনুধাবন করে, হয়তো পৃথিবীর কাজে আমার অক্ষমতাকে স্বীকার করে। নিরঞ্জনদা অসীমতার মাঝে ঈশ্বরের করুণা খুঁজতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মানুষের জীবনে করুণাকে সংখ্যা দিয়ে গড়া অসাধ্য। ঈশ্বর পাল শেষপর্যন্ত সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। দেরি হয়ে গেছে অনেক, আমাকে যেতে হবে, বিদায় জানিয়ে বের হয়ে আসি, বাইরে তখন বৃষ্টি ছিল না। আকাশের তারা দেখা যাচ্ছিল।

চাতালে ফিরে এসে দেখি কানু বসে আছে সেই বৃদ্ধার পাশে। কেন জানি আশ্চর্য হই না। কানু আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ায়, লেজ নাড়ায়, আমি বসে ওর গায়ে হাত রাখি। বৃদ্ধা আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন। সেই হাসিতে যেন নিশ্চিন্ত হই, ঢাকায় কানুর

একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি আজ - এই কথাগুলো যখন লিখছি - বলতে পারি ঐ চাতালে বসে, সেই মুহূর্তে যে গভীর প্রশান্তি অনুভব করেছিলাম সেরকম আর কখনো করি নি। তারপর চোখে পড়ল, একটা বড় আমগাছছাড়িয়ে , দূরে অন্ধকারে, গাড়ির আলো। আমাদের চালক আলো জ্বালিয়ে রেখেছে যাতে আমি পথ চিনে তাকে খুঁজে পাই। দিনের বেলায় তার অবিমৃষ্যকারিতায় মরতে বসেছিলাম, এখন তার আলোকবর্তিকা দেখে তাকে মনে মনে ক্ষমা করে দিলাম। ভাবলাম এখন আমার করুণাধারার সময়। ছাউনির পাশ দিয়ে, আমগাছের শাখা ছাড়িয়ে এক চিলতে আকাশ দেখা যাচ্ছিল, তাতে জ্বলজ্বল করছিলবৃহস্পতি, সেদিকে তাকিয়ে রইলাম অনেকক্ষণ - সেই সময়ের স্নিগ্ধতায়।

পদ্মবীজ

জয়ন্তী অধিকারী

সব শিশুদেরই নানাবিধ বিরল প্রতিভা থাকে, আমার সামান্য মনীষার বিচিত্র স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল চারপাশের লোকজনের নানা অদ্ভুত নামকরণে-যেমন ভজুদাদু (কারণ অজ্ঞাত), পা খাওয়া দাদু(পায়ে চুমু খাওয়ার অভ্যাস ছিল), গেঞ্জিদাদু, খরখরিদিদা, তুড়ুকপিসী, আরশোলাদাদু, ভুম্বু(নিজের মাকে দেয়া নাম, কারণ যথারীতি অজ্ঞাত), চচ্চড়িঠাম্মা ইত্যাদি।

তবে বড়বেলা অবধি যে নামটি টিঁকে গেছিল,তা হল বইমাসি।

মনে হয়, বইমাসিকে চান করা ও সিঁড়ি ওঠার র সময়টুকু বাদ দিলে বইবিহীন অবস্থায় কেউ দেখে নি। খাওয়া, চুল আঁচড়ানো, টিভি দেখা, সিঁড়ি নামা সব কিছুই তিনি করে যেতেন একহাতে বই ধরে। বুলটুদা বলত মাসি নাকি সিনেমা দেখতে গেলেও ব্যাগে বই রাখত, ইন্টারভ্যালে পাতা উলটে নিত, বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়ে কনের পাশে বসে উপহারের বইএর মোড়ক ছিঁড়ে একটু পড়ে নিতে মাসির কোন কুণ্ঠা ছিল না।

বিজ্ঞানে মাসির অনীহা ছিল না, কল্পবিজ্ঞান, সত্যজিৎএর শঙ্কু, নারায়ণ সান্যাল, মহম্মদ জাফর ইকবাল, হুমায়ুন আহমেদ খুঁটিয়ে পড়েছিল, ইকবালের "তমোক্রনিক রূপান্তর"এর প্রশংসাও করেছিল খুব। তবে ভালবাসত সাহিত্য পড়তে, ওড়িয়া, কন্নড় ভাষা শিখে নিয়েছিল, বাংলা তো আছেই, অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কবিতা, গল্প, উপন্যাস সবই পড়ত মূল বা অনুবাদে।

বাংলা কবিতা নিয়ে কঠিন কঠিন গবেষণা করে ডক্টরেট পেল, বেথুন কলেজে অধ্যাপনা করে জীবন কাটিয়ে দিল, বিয়েটিয়ের

ঝামেলায় গেল না। আজীবনের সঞ্চয় দিয়ে দুটি মুখোমুখি ফ্ল্যাট কিনেছিল, একটি বইদের জন্য, একটিতে ভাইএর সংসার।

মাসির ভাই, কিন্তু আমরা ভাইবোনেরা মামা বলতাম না। দিল্লি থেকে রাজধানীতে কলকাতা ফেরার সময় মাসির সঙ্গে অমূল্য মানে এই ভাইটির আলাপ, সেই আলাপই আস্তে আস্তে গাঢ় হয়ে জন্মদিন, পুজোয় জামাকাপড়, ভাইফোঁটা হয়ে এখন তো পাশাপাশি ফ্ল্যাট পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে।

কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ইঙ্গিতে আমরা ভাইবোনেরা অমূল্যভাইটিকে তেমন পছন্দ করতে পারিনি। কেমন তোম্বা মুখ, সোজাসুজি তাকায় না, নীচু গলায় কথা বলে, পুজোপার্বণে মাসিকে বিশ্রী রংএর জ্যালজেলে শাড়ি দেয়। তার ছেলে অনন্তটি তো গুণের আধার, সর্বদাই বাইক নিয়ে রাস্তায় চক্কর কাটছে নয় তারস্বরে আড্ডা মারছে।

"বইমাসি, দুটো ফ্ল্যাটেরই সব ইনস্টলমেন্টগুলো তুমি দিচ্ছ?"

"আহা, প্রথমদিকে কয়েকটা আমি দিচ্ছি।ওর এখন কত খরচ বল, ছেলেটাকে মেডিকেলে পড়াতে চায়, কোচিংএর খরচাই কত!

ভাইবোনদের মধ্যে বইমাসির সবচেয়ে প্রিয় ছিলাম আমি। প্রচণ্ড বইএর নেশা, ন্যালাখ্যাপামো, অগোছালো স্বভাব- এর যে কোন একটা বা সবগুলোর কারণে। পুজো, নতুন বছর, জন্মদিনের উপহারে সবচেয়ে ভাল বইগুলো আমার, একটু বড় হওয়ার পর ছোটখাট বেড়ানোতে সঙ্গী একলা আমি, বাবামা নাচ শিখতে দেবে না কিছুতেই (কে রোজ রোজ নিয়ে যাবে?), মাসি দায়িত্ব নিয়ে পাঁচ পাঁচটি বচ্ছর নাচের ইস্কুলে নিয়ে গেল, ফেরত আসার পথে টিফিন খাওয়াল, ব্যাগে চকোলেট গুঁজে দিল।

পরীক্ষার আগের রাতে মাসি এসে আমার সঙ্গে রাত জাগে, মাঝরাতে দুধকফি, টোস্ট বানিয়ে খাওয়ায়, মাসির গায়ে হেলান দিয়ে পড়ি, একটু পরপরই বলি পড়া ধরতে, বেচারি প্রাণপণ চেষ্টা করে আমার বলে যাওয়া কেমিস্ট্রির ফরমুলার সঙ্গে বইয়ের

লেখা মেলাতে। সক্কাল সক্কাল বানিয়ে ফেলে পাতলা মাছের ঝোল (এই একটি রান্নাই জানে), স্কুল লেভেল পর্যন্ত পরীক্ষার হলে নিয়েও গেছে।

মাসির সেমিনার থাকলে আমি গিয়ে হাজির হই, রবীন্দ্রনাথ-জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে-বুদ্ধদেব বসুর কবিতা নিয়ে লেখা দুর্বোধ্য খটোমটো পেপার শুনি চুপচাপ, কলকাতায় তো বটেই, দিল্লি, মুম্বাইতেও সঙ্গে যাই। ফুড পয়জনিং হয়ে মাসি নার্সিং হোমে, আমি ঠায় বসে আছি দুদিন, যেন আমি গেট পেরোলেই কিছু ঘটে যাবে। কলেজে ঢোকার পর মাসির দোকান বাজারের বেশিটাই আমি করি। দুজনারি একমাথা চুল, লম্বা চেহারা, পছন্দ, অপছন্দ, শখ, বিরক্তি, এমনকি টিকটিকি দেখে ভয় পাওয়া -অনেকটাই একরকম।

বইমাসি আমার চেয়ে ষোলো বছরের বড়। পারিবারিক মিথ অনুযায়ী, মাসির জীবনে যা যা ঘটত, অদ্ভুত সমাপতনে আমারও ঠিক তাই ঘটত, ষোলো বছরের ব্যবধানে-যেমন চিকেন পক্স, টাইফয়েড, ডান হাত ভাঙা, প্রথম লেখা প্রকাশিত হওয়া, পি এইচ ডি, ইয়োরোপ যাত্রা, কলেজে চাকরি ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার বা মাসির জীবনে কিছু ঘটা মাত্র সকলে হিসেব মেলাতে ঝাঁপিয়ে পড়ত। মনে হত মাসিও যেন অপেক্ষা করে থাকত ওর জীবনের পুনরাবৃত্তি আমার মধ্যে দেখবে বলে।

কিন্তু আমি চাইতাম এই মিথ ভেঙ্গে দিতে। বি এস সি পাশ করার পরেই তাই লম্বা চুল কেটে ছোট করে নিয়েছিলাম, বোনঝি যেন মাসির ফোটোকপি -শুনতে শুনতে তিতিবিরক্ত হয়ে গেছিলাম।

আমার বিয়েতে মাসির আনন্দ ছিল সবচেয়ে বেশি, কিন্তু ওর চোখে আমি নির্ভুল দেখেছিলাম একটু আশাভঙ্গের বেদনা, যেন এমনটা না হলেই ভাল হত।

কিন্তু এ সবই এখন বহু পুরনো কথা।

মাসি সময়ের আগেই রিটায়ার করেছে, (এখনও কত বই পড়া বাকি!), বাড়ি, লাইব্রেরী, কলেজ স্ট্রীট করে মহানন্দে আছে। সেই ভাই, ভাইবৌ নাকি দেখাশোনা করে।

কোন মন্ত্রবলে মাসিই জানে, অমূল্যর শ্রীমান ডাক্তারি পড়তে ঢুকেছে ! এই সেদিনও মাসির সঙ্গে আমার এমত বাক্যালাপ হল-

"বইমাসি, এখনো দিয়ে যাচ্চো দুটো ফ্ল্যাটের কিস্তি?”

"আহা, অমূল্য কোথায় পাবে বল, ছেলেটা ----”

"সে তো দুবছর হয়ে গেল। ডাক্তারি পড়ার ব্যবস্থাও তো তুমিই করে দিয়েছ, শুনতে পাই।"

"আহা, ছেলেটা যদি দাঁড়িয়ে যায়-"কাঁচুমাচু মাসি কথাটা শেষ করতে পারে না। ওদের জন্য মাসির দয়ার অন্ত নেই, সব বাক্যই শুরু করে "আহা" দিয়ে।

"অই আহা যেদিন বাহা হয়ে যাবে, সেদিন বুঝবে।"

"কী ই যে বলিস, জানিস রমা বলেছে, আপনার তো পাখির আহার, আমি ই দুটি দুটি রেঁধে দোব, আলাদা করে রান্নার লোক রাখার দরকার কী?"

"বইমাসি, মাসি -ই-ই, কতবার তোমাকে বলেছি ওদের দেওয়া খাবার একদম খাবে না, একদম না। কথা না শুনেছ তো, আমি, আমি-----"

"ঠিকাছে, ঠিকাছে, শান্ত হ, খাব না ওদের কাছে, হল তো?" মাসি হাতের বই রেখে আমার চুলে তেল দিতে বসল।

আমি পুরোপুরি গৃহিণী, নিজের স্বামীসন্তান, কলেজে পড়ানো, সংসার, টুকটাক লেখালেখি ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকি, চব্বিশ ঘন্টার দিন কখন শেষ হয়ে যায় টের পাই না। তবে মাসিকে কখনও অবহেলা করিনি, দিনান্তে ফোন তো বটেই, সপ্তাহে একবার গিয়ে খবর নিয়ে থাকি বরাবরই। ইদানিং অবশ্য মাসি

একটু অস্বস্তি বোধ করে, "তোকে এতবার দৌড়ে আসতে হবে না, সংসারে কত কাজ। দরকারে আমি ডেকে নেব "-অপরাধী মুখ করে এইসব বলে।

গত বুধবার সকাল দশটা নাগাদ ফোনে মাসির আতঙ্কিত গলা শুনে তাই অবাক হয়ে গেলাম ।

"রিম্মি, শিগিগিরই একবার আয়। খুব বিপদে পড়েছি।" ভয়ে ত্রাসে গলা যেন আটকে আসছে।

কী হল রে বাবা, অসুখবিসুখে ভয় পাওয়ার পাত্রী নয়,তবে কি অমূল্যভাই ফ্ল্যাট থেকে উৎখাত করে দিল গুণ্ডা দিয়ে?তা ও হতে পারে না, সেক্ষেত্রে ফ্ল্যাটের বাকি টাকা গুনবে কে?

তাছাড়া এ যেন অন্যরকম ভয়ের গলা, কোন একটা প্রচন্ড বিভীষিকা অনেকক্ষণ দেখলে এমনটা হয়। টিকটিকি? কালো, বিরাট, ছোপছোপ? সেক্ষেত্রে তো আমিও অসহায়, আমাকে ডেকে সুবিধে হবে না ভালই জানে, তবে?

সাত পাঁচ তেরো উনিশ সব ভাবতে ভাবতে ছোটবড়োমেজসেজ কাজের বন্দোবস্ত করি, ওলা ক্যাব ধরি, শরীর জানিয়ে দেয় সকালে এক কাপ চা ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি।

লিফট অচল,প্রায় ছুটে ছুটে সিঁড়ি ভেঙে মাসির চারতলার ফ্ল্যাটে ঢুকি।

দেখি, মাসি সেলফোনের স্ক্রীনে তাকিয়ে আছে, অসম্ভব ভয়ে চোখ ঠিকরে আসছে।

"কী-ই দেখছ? দেখি, দেখাও" করতে করতে ফোন কেড়ে নিই, কিন্তু যা দেখি তাতে আমারো কেমন গা গুলিয়ে ওঠে।

একটি মেয়ের কাঁধের একটা অদ্ভুত ফটো, ঘাড়ের কাছে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ঘা, গোল গোল কালো ফুটো,ভেতরে যেন পোকা বিজবিজ করছে।

হঠাৎ বমি উঠে আসে,দৌড়ে বেসিনে যাই।

চোখেমুখে জল দিয়ে ফিরে আসি, মাসি তখনো শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে আছে।" এই বিচ্ছিরি ছবিটা দেখছ কেন বসে বসে? কোথায় পাও এইসব? ওঠো,খেতে দাও আমাকে।"

মাসি যেন শুনতে পায় না।

"আমার হয়েছে এই রকম,জানিস?"

"তোমার? সে কি?" বলি, কিন্তু পিছিয়ে দাঁড়াই, আবার যেন বিবমিষা হয়।

মাসি আস্তে আস্তে পিঠের কাপড় সরায়, দেখতে পায় না আমি পিছিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু চোখ সরাতেও পারছি না।

আশ্চর্য হয়ে দেখি, কয়েকটা ছোট্ট ঘামাচি কেবল, ফর্সা পিঠে লাল দেখাচ্ছে।

"এ কি? কয়েকটা র‍্যাশ হয়েছে তো, মলম লাগাও, সেরে যাবে, এতে ভয়ের কী আছে?"

"ওরে, ওগুলোতেই ঐরকম গিটিগিটি ঘা হবে, সাতদিনের মধ্যে। অনন্ত বলে গেল, এই ছবিটাও লোড করে দিল।"

এবার কিছুটা বুঝতে পারি।

"মাসিই ই, কতবার তোমাকে বলেছি তোমার ঐ আদরের অনন্তভাইপোকে ডাক্তারি করতে ডাকবে না। একবার উল্টোপাল্টা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে তোমার কী হাল করেছিল, ভুলে গেলে?সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, পড়াশোনা কতটা করে সন্দেহ, তাকে তুমি বিশ্বাস করো?" কেঁদে ফেলি প্রায়।

মাসি কেমন অন্য জগতে চলে গেছে, আমার কথা যেন শুনতেই পাচ্ছে না।

"অনন্ত আমার পিঠের ছবি নিল, তারপর ইন্টারনেটে কিসব খুঁজেটুজে দেখে বলল, যারা পুরোনো বইপত্র বেশি ঘাঁটাঘাটি

করে, তাদের শরীরে এইরকম হয়। এর ওষুধ নেই তেমন।"

"চলো, তোমাকে স্কিন স্পেশালিস্টের কাছে নিয়ে যাই, ওষুধ হয় না এমন রোগ আছে নাকি আজকাল?"

মাসি শোনার পাত্র নয়, রাগ করি, হাত ধরে কাঁদি, মিষ্টি কথায় বোঝাই, কিছুতেই কিছু হয় না।

"বই পড়া ছেড়ে দিতে হবে তাহলে, বল? সে ছাড়ব না হয়। কিন্তু রিম্মি, তুই রোজ এসে আমাকে দেখে যাস, আসবি তো?"

মাসির রান্নার লোক এসে গেছে, জিজ্ঞেস করে, খেয়ে যাবে তো দিদি?

উত্তর দিতে পারি না,বাড়ি ফিরে আসি। সারাদিন কেবল ঘুরে ফিরে মনে পড়ে, না, মাসির কথা নয়,ঐ ছবিটা। মানুষের পিঠে গোল গোল গর্ত্ত, তাতে কিলবিলে পোকা। আমার ভয়ে যোগ হয় মাসির আতংক ভরা ফোন--

“কী হবে রে, যদি সারা শরীরে ঐরকম গোল গোল বেরোয়?”

“জানিস, কাল স্বপ্ন দেখলাম আমার হাতে পায়ে সর্বত্র পোকা, গিজিগিজি-”

“জানি, আমি একজন শিক্ষিতা মহিলা, অধ্যাপিকা ছিলাম, কিন্তু সব যুক্তি বুদ্ধি যেন ভেসে যাচ্ছে!!”

দিনে তিন চার বার মাসির ফোন আসে, যেতে পারিনা, যাব কী, নিজেই বমি, জ্বরে শয্যাশায়ী, সর্বক্ষণ মাথায় ঐ বীভৎস ছবি, পাগল হয়ে যাব মনে হয় ।

তিনদিন হয়ে গেল, সহকর্মীরা ফোন করে। সাইকোলজির অধ্যাপিকা রঞ্জনাকে সব খুলে বলি, কাউকে বলা খুব দরকার যে। তবে শুধু মাসির কথাটুকুই বলি, নিজেরটা নয়।

আশ্চর্য হয়ে দেখি, পরদিন ল্যাপটপ নিয়ে রঞ্জনা বাড়িতে হাজির।

"দ্যাখ তো, এই ছবিটা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই রকমই তো! তু তুই কোত্থেকে পেলি?"

রঞ্জনা হাসতে হাসতে শুয়ে পড়ে-"ছাগল, তুই একটা ছাগল। আরে ওটা একটা ফোটোশপ করা ছবি, পদ্মবীজের ছবি মানুষের ঘাড়ে ফেলে বানিয়েছে। ঐ বদমাস ছেলেটা তোর মাসিকে ভয় দেখানোর জন্য নেট থেকে বের করেছে।"

পদ্মবীজ, পদ্মবীজ, পদ্মবীজ,!!

রঞ্জনা চলে যাওয়ার পরেও মাথায় ঘোরে অনবরত।নেট খুঁজে খুঁজে বের করি, হ্যাঁ, সেই ছবিটাই তো।

বের করি -

"Trypophobia-Trypophobia is a proposed phobia (intense, irrational fear, or anxiety) of irregular patterns or clusters of small holes or bumps."

বিশ্রী, ভয়ংকর সব ছবি নেটে-খুব সাধারণ জিনিস কিন্তু তোলার কায়দায় ভয়ানক- মৌচাকের,ফুটন্ত দুধের,পদ্মবীজের,গাছের গুঁড়ির। শিক্ষিত মন দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বুঝি, এ ভয় সম্পূর্ণ অকারণ, তবু ছবি দেখি, দেখে যাই,চোখ সরে না। দেখলে ভয়ে কেমন কম্প আসে, হাতপা কাঁপে, মনে হয় হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ি, আর কাঁদি, খুব কাঁদি।

দেখতে দেখতে কেমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি, সংসার,কলেজ সব কেমন ত্যাগ হয়ে যায়। ছবির মত বাড়ি ধুলিধূসরিত, কলেজে সব ছুটি শেষ, হোম ডেলিভারির খাবার খেয়ে খেয়ে সকলে বিরক্ত।

সারাদিন, সারাক্ষণ ঐ গিটিগিটি ছবিগুলো দেখতে ইচ্ছে করে।

মাসির ফোন আসে-

“বই পড়তে আর ভালো লাগে না, বুঝলি। কী যে হল, সর্বদা ঐ ছবিটা দেখি, মনে হয় গায়ে পোকা হাঁটে, ভয়ে কেঁদে ফেলি

কিন্তু না দেখেও পারি না।”

“মনে হয় হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচে লুকিয়ে পড়ি, আর কাঁদি, খুব কাঁদি।”

বিদ্যুৎ চমকে যায় মাথায়, Trypophobia, দুজনেরি Trypophobia!!

ষোলো বছর সময় যদি কমে আসে?

“হ্যাঁরে রিম্মি, আর আসবি না কোনদিন? ঘেন্না পাস খুব? আর কাকে ডাকি বল?"

"না মাসি, তা নয়। আমার যে জ্বর খুব। অমূল্যরা দেখে না তোমাকে?"

“ওরা তো গ্রামে গেছে রে। আমি একদম একা। ভালো কথা,যেদিন আসবি, ভালো দেখে একটা ব্লেড আনিস তো, ঘাড়ের ঐগুলো চেঁছে ফেলে দেব একদম।"

“আনব।"

পরদিন, খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে মাসির ফ্ল্যাটে চলে যাই। চাবি থাকে আমার কাছে।

সোফার ওপরেই পড়ে ঘুমোচ্ছে, গালে জলের দাগ শুকিয়ে আছে, কবে এত বুড়ি হয়ে গেল!

কিন্তু, পদ্মবীজ মুছে ফেলতেই হবে, ভেঙে দিতে হবে মিথ!

ব্যাগ থেকে নাইলনের শক্ত দড়িটা বের করি।

দুর্মতি ছিল চাঁদ ছোঁবার। একটি ব্যাগে পুরো দেবার ইচ্ছে ছিল সম্পূর্ণ নব্বইয়ের দশককে। সম্ভব না হওয়ায় পরিবর্তে প্রকাশিত হয়েছিল নব্বইয়ের ১৯ জন কবির কবিতা একই সঙ্গে, একই ব্যাগে ১৯৯০। এক ব্যাগ ৯০।

নব্বইয়ের রূপকথাদের উদযাপনের এই অধ্যায়ে - একসঙ্গে ঊনিশটি কবিতার বই, চিরঞ্জিত সামন্তের প্রচ্ছদে ধরা বদলাতে থাকা, বদলে যাওয়া সময়ের সাক্ষ্য এবং হাওয়ার শব্দ।

সেখান থেকেই কিছু কবিতা থাকলো এখানে।

কবিতার পাতার সব ছবি ঋতুপর্ণ বসুর আঁকা

বাছাই নব্বই

ধরতাই - ফরিদা

না হয় মানসভ্রমণ হোক এইবার। ট্রেনে বাসে ইচ্ছেমতো নামা ওঠা হবে, চুপ করে দেখা হবে জানলা দিয়ে আর দু'পাশের রাস্তা ইচ্ছেমতো পিছনে সরবে। সরে সরে কতদূর সে রাস্তাটি? নব্বইয়ের দশক মন্থনে কেউ কি অমৃত পেয়েছিল? কার ভাগ্যে জুটেছিল সে তীব্র গরল - জানা নেই, সে সব বড়লোকি ব্যাপার। উলুখাগড়ার দিল সেই নব্বইয়ের সড়কে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পেয়ে যান কবিতার পংক্তিগুলি। কেউ পোশাক পরলেন, কেউ তা দিয়ে বাঁধলেন ঘর। কেউ তাকে পালকের মতো উষ্ণীষ করে ঘুরে বেরিয়েছেন। সম্পর্কের শিকড়ে জড়াচ্ছেন, কেটে উড়ে যাচ্ছেন। শান্তি পাচ্ছেন, অশান্তিতে ফুটে উঠছেন, কাঁদছেন অথবা অভিমানে বুঁদ। ঊনিশ কবির কবিতার ঘোড়া নব্বই জুড়ে টগবগ করছিল।এই সংকলন থেকে খুঁজে নেওয়া যাক তার কিছু সুদ।

একের পর এক বই টেনে নেওয়া হয় এতে - যখন গন্তব্য নেই, ঠিক মিউজিক্যাল চেয়ারের খেলা নয়, কিছুটা লুডোর দান (বুলা দি'র জন্য নয়), হয়ত কিছুটা যেন একটা কবিতায় পা রেখে কুমীরডাঙা খেলে, তারপরে চোখ বেঁধে তুলে নেওয়া পরের বইটা। যে যেভাবে আসে আমাদের জীবনে সচরারচর কিছুটা অনিশ্চিত, নৌকার পাটাতন কেউ পেয়ে ভাসে, কেউ পায় ঘাটের পৈঠা।

সোমনাথের "রেলিং জড়িয়ে প্লাস্টিক" সম্পর্কে শাক্যজিৎ বলছেন "প্রেম ও বিস্মৃতির মনোরম মেলাংকলি"। তা, "সে ছিল কেমন" - কবিতায় সোমনাথ বলছেন -

"সে ছিল যেমন স্টোরেজের ঘরে জমে থাকা ধুলো

বাসনের ফাঁকে দেখিনি জমেছে খসখসে ঝুলও
ভুল কলতলা, জমা নলপথ, দলা করা চুল
বেরিয়ে পড়েছে, বাড়ির থেকেই আচমকা ভুল
পাড়ার মোড়ে কি মরা বটতলা, শনি মন্দিরে
সে ছিল যেমন সিকি ছুঁড়ে দিতে সপ্তা-র ভিড়ে....”

নব্বইয়ের বয়:সন্ধিজাত স্পর্ধার চিহ্ন দীঘা ভ্রমণ দিয়েই যাত্রা শুরু হোক এই পথচলা।

দীঘা

সোমনাথ রায় (রেলিং জড়িয়ে প্ল্যাস্টিক)

যে দীঘায় মৃত্যু দিলে তার জালে বন্দি করে আজ
হঠাৎ আকাশে মেঘ খুলে দিল তটভূমি ভাঁজ-
বালিতে আয়না ছিল, ভোগের উৎসে বিরহীর
কাতানে রক্ত জমে মৃত ইলিশের মত স্থির

যে দীঘায় মৃত্যু দিলে তার জালে বন্দি করে পাড়া
ঘরেফেরা হাইওয়ে জ্যামে খন্দে ক্রমাগত তাড়া
ক্রমশঃ নিকটে এলে ফড়িং-এ যে উৎসব জাগে
এবং পরের দিনই ঘুম ভরে যায় বীতরাগে

যে দীঘায় মৃত্যু দিলে তার জালে বন্দি করে, টা-টা
করোটি যে কটি আছে গেঁথে মালা গলে নিয়ে হাঁটা

রক্তরাগ বীতস্পৃহা কিছুইতো দাওনি কখনও-
স্মৃতি-বিভ্রম থেকে অভিযোগ রেখে যাই, শোনো।

যে দীঘায় মৃত্যু দিলে তার জালে বন্দি- বারবার
ফিরে তো আসছি আমি কমরেড, প্রতি হত্যার,
বোকে-র দোকান থেকে সাজিয়ে নিয়েছি ফুলহার
দীঘা ছেড়ে যেতে যেতে ওই রূপ দেখেছি তোমার-

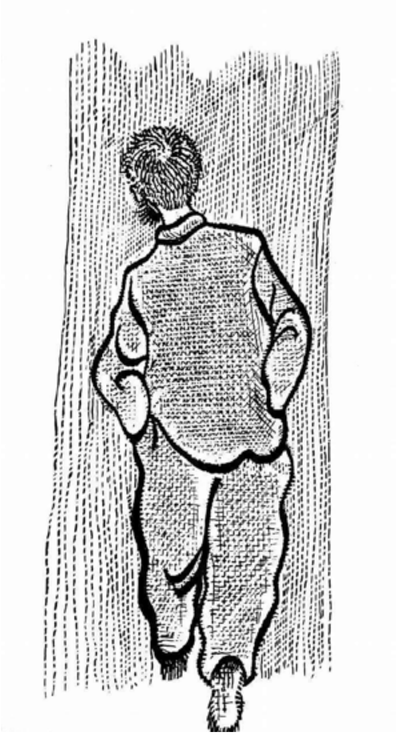

আর্যনীল পরীক্ষাকবি। এত সহজে একজন কবিকে চিহ্নিত করা ঠিক নয় মানি। তবে এটা তার অন্যতম উৎকর্ষের জায়গা, যা তাকে আলাদা করেছে বাকিদের চেয়ে, সেটা বোঝাতে চেয়েছিলাম। তাঁর জলতলের ফোটোগ্রাফি হাতে উঠে আসে দীঘা ভ্রমণের পরে। দেখি এক ত্রবাদুরের রচিত ১২০০ সালের সেস্তিনা ছন্দ, যাতে প্রথম ছয় লাইনের ছত্রের প্রতি লাইনের শেষ শব্দগুলি ফিরে ফিরে আসে পরবর্তী ছত্রের শেষ শব্দ হয়ে। আর্যনীল তাকে বানালেন সাত লাইনের ছত্র। নাম দিলেন হেপ্তিনা। কিন্তু কবিতার কারগরির দিক অজানা থাকলেও সে কবিতা রসসৃষ্টিতে সার্থক হয়ে ওঠে নিখাদ কাব্যগুণে।

সেস্তিনা, হেপ্তিনা

আর্যনীল মুখোপাধ্যায় (জলতলের ফোটোগ্রাফি)

কেউ আসেনা এ বাড়িতে
তবু তালাবন্ধ কেন, খালি ঘরগুলো?
সিঁদুরখেলার মানে না বুঝে খেলো না হেমন্তে
গগনভেদী ডাকছাড়া ঐ মারীচ, সেও খুলে পড়ছে টের পায়
যেমন মানেভঞ্জন গ্রামে কেউ বুঝতে পারেনি আমাদের কথা
কেবল একটা পাখি দেখাতে ছোটো মেয়েটি বললো -গংতালি, গংতালি
তার পিছু পিছু সেই মুহূর্তে উড়ে পাখিটা

দেখি পাহাড়ের পেছনে বৃষ্টি ধুয়ে ফেলেছে ইজেলের ঘরগুলো

আর এত হাওয়া সেতারের তার ছিঁড়ে যাবারই কথা
তুলি, ক্যানভাসও ছিঁড়ে যাচ্ছে, কঙ্কালে-কাঠামোতে ব্যথা পায়
ঘেমো মেয়েটি পায়ের নূপুর খোলে তখনও গান দুপুরের পাখিটা
আমরা পাঁঠার নলি চুষছি আপ্রাণ আজ এই খালি বাড়িতে
কেবল তালেবর ছোট মেয়েটা কাকে ডাকে - গংতালি, গংতালি
বইয়ের ভাঁজে রাখা যে পাতা, ভাঙলো মিশে গুঁড়ো গুঁড়ো হেমন্তে
শুয়ে শুয়ে জনতার তালি শুনে কি একটা ভয় করছে গংতালি
তোমাকে শুনতে পাইনা কেন ক্যালেন্ডারে, পাতার পায় পায়
খুলে নতুন ক'রে বোনা শিখেছি এ হেমন্তে
খোলা বগিগুলো জোড়া হচ্ছে, ঠিক তখনই উঠলো আমাদের কথা
কেবল কাগজ আর কলম দিয়েই ওরিগ্যামির পাখিটা
রচিত যার রঙিন জামাগুলো গুণে, বুনে তোলা ঘরগুলো
অথচ আজও কেউ এলোনা ভাসা পাতার বাড়িতে

(অতি পুরাতন এক ইস্পানি কবিতাকাঠামো - সেস্তিনা। যাকে কবি ব্যবহার করেছেন। ছয় লাইনের এক এক ছত্র যার শেষ শব্দগুলো এক একটা গাণিতিক প্যাটার্নে পরের ছত্রে ঘুরে ফিরে আসে। বাংলা পয়ারের কথা মনে রেখে এই সেস্তিনা সাতে, ফলে হেপ্তিনা।)

কবি মিতুল দত্ত জানাচ্ছেন তার "অমরত্বের খাতার নাম 'মায়ের দিব্যি' "। বলছেন "আজও সেই 'মায়ের দিব্যি'র পেটের ভেতরে টর্চ নিয়ে অমরত্ব খুঁজতে বসি।" আমরা খুঁজে পাই "উইকএন্ড" বইটির নাম কবিতাটি যেখানে "সম্পর্ক আসলে এক বেড়াতে যাওয়ার সম্ভাবনা" বলে শুরু হওয়া কবিতাটি টানটান ঋজু ভঙ্গীতে উচ্চারণ করেন শব্দগুলি। নির্মেদ কবিতায় সম্পর্কের দিকগুলি কাছে আসে, সরে যায়, যতক্ষণ না স্পষ্ট উচ্চারণে চরমে পৌঁছে যায়।

উইকএন্ড

মিতুল দত্ত (উইকএন্ড)

সম্পর্ক আসলে এক বেড়াতে যাবার সম্ভাবনা
দূর পাহাড়ের দেশে, যেখানে কুয়াশা ঘন আরও
সম্পর্ক আসলে এক সারাদিন ছিপ ফেলে রাখা
গভীর জলের কাছে, গভীর মাছের দুরাশায়

তুমি যা জেনেছ, রাত্রি, তার বেশি আমিও ভাবিনি
আমিও পারিনি এত দ্বিধাহীন হয়ে বেঁচে থাকা
এই দ্বিধা, সন্দেহের দোলাচল সম্পর্ক আমার
থাকা না-থাকার তীরে থেমে আছে পারাপারহীন

কোথাও থাকার কথা, কোথাও যাওয়ার কথা ছিল
যখন ভোরের ট্রেন ফিরে যায় গোধূলিতাড়িত
যখন আরোগ্যমেঘে মিশে যায় ক্ষুধা ও পশম
সমস্ত জরুরি কথা দাঁত থেকে উঠে আসে দাঁতে

সম্পর্ক আসলে সেই তেরাত্রি-পোহানো হত্যালিপি

কবি শৌভ চট্টোপাধ্যায় পাঠকের হয়ে আক্ষেপ জানান -"শমিত রায় এত কম লেখেন কেন?" শমিত রায়ের বই "উহ্য" বইটি থেকে চোখ বন্ধ করে যে কোনও কবিতাই নেওয়া যেত। যেহেতু পুজোয় বেড়াতে যাচ্ছি বেড়াতে যাচ্ছি করে কবিতা পড়ার সময় "প্ল্যাটফর্ম শব্দটি নিয়ে লেখা একটা কবিতা"য় থামি। তার আগেরটায় থামা যেত। তাকেও রাখা যেত অনায়াসে যেখানে বলা হচ্ছে "আসলে যেকোনও শব্দ দিয়েই কবিতা লেখা যায়" - সেই কবিতায় থামা হল না এ যাত্রা, পাঠক ফিরতেই পারেন সেই "রানওয়ে" তে।

প্ল্যাটফর্ম শব্দটি নিয়ে লেখা একটি কবিতা

শমিত রায় (উহ্য)

প্ল্যাটফর্ম শুনলেই গড়ে ওঠে ঘড়ির আদল। দেওয়ালে
নিপুণ সময় সারিবদ্ধ সাদা ও
কয়েকটি সরু রেখায় ঝুলে থাকে এক
একটি দূরগামী ব্যাগেজের চেনা চেন; শিকল বাহারে
নুয়ে থাকা স্যুটকেসের নিরর্থক পা; অথবা
গোটানো জামা ও কাপড়ের শুয়ে থাকার বাহানাগুলি এইখানে
ডাফল ব্যাগের ফিতে বেয়ে বেড়িয়ে পড়ে,
নিভে থাকা বগি আর চায়ের দোকানে মৃদু
চিৎকারে কথা বলে, উশখুশ
করে। আপাত বিপন্নতায়

উড়িয়ে দেয়, হাতে হাত রাখে;
সিগনালে চোখ বাঁধে আর।

আসলে প্ল্যাটফর্ম - এ শব্দটি শুনলেই দ্যাখা যায়
নিপুণ সময়। দূরবর্তী প্রিয়নামে লেগে থাকা
অপেক্ষাবিধি, অথবা নিরপেক্ষ কিছুটা
যেন নেহাতই একটি নাম ও এফ টোয়েন্টিফোর,
উনিশ আপারে; জেগে থাকে রাতভর চায়ের সন্ধানে
নেমে যায়, পেপারব্যাকের পাতায়
রহস্য জমে ওঠে; উড়ে যায় আধাঘুমন্ত
প্ল্যাটফর্ম, কফির চুমুকে রাখা
কাগজের কাপ।

"যখন ফানুসেরা ওড়ে" - কবি সাম্যব্রত জোয়ারদারের বইটিতে কবিতাগুলির বেশিরভাগেরই নামকরণ নেই। সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত। অনেকে করেন এমন। একটা নৈর্ব্যাক্তিক দূরত্ব রাখেন, সচেতনভাবেই। হয়ত তাতে কবিতা দরকারি জায়গাটি পায়, হাত পা ছড়াতে, খুশি হয়। এই কবিতাটি যেমন "বাইশ" শীর্ষক কবিতাটি বইটির শেষ কবিতা, 'বিকেলে মেঘের বুকে একটি পালক ভেসে বহুদূর গেল" - প্রথম লাইনটি থেকেই কবিতা তার বিস্তার নিয়ে শুরু করে, কোথায় কোথায় নিয়ে ওড়ায় পাঠককে সে পাঠকই জানেন। আমি তাদের একজন হয়ে শেষ কবিতার প্রথম লাইনের ডানদিকের খালি পাতা বেয়ে উড়ে যেতে থাকি, "সূর্যাস্ত মুঠোর থেকে ঝরে পড়ে..."। এই মানসভ্রমন আকাশ পথে - যখন ফানুসেরা ওড়ে।

বাইশ

সাম্যব্রত জোয়ারদার (যখন ফানুসেরা ওড়ে)

বিকেলে মেঘের বুকে একটি পালক ভেসে বহুদূর গেল
সর্বস্ব হারিয়ে বসে ফের কোনও দুর্যোগের নির্ভর হয়েছি মনে হয়
সমুদ্র যেমন ক্ষুব্ধ যেভাবে অস্থির শ্বাস তীরের নিকটে
বসে আছি সেইসব বালি আর সন্তাপের সীমানারেখায়
আয়নায় মুখ দেখি– আয়নার ভিতরে এক মানুষের মুখ
কেমন মানুষ তুমি কেবলই বিষাদ নিয়ে ভাবো
সমস্ত দিগন্ত জুড়ে আয়না পড়ে সারি সারি
আয়নার ভিতরে এক ভাঙাচোরা মানুষের মুখ

স্থাপত্য মন্দির চূড়া ধুলোঝড় দিন ঢলে এখানে পশ্চিমে
রঙিন ঝালর দোলে সন্ধেবেলা একা
রথ ফেরে সুদর্শন তার চাকায় রক্ত লেগে আছে
সূর্যাস্ত মুঠোর থেকে ঝরে পড়ে লিখনি আমার

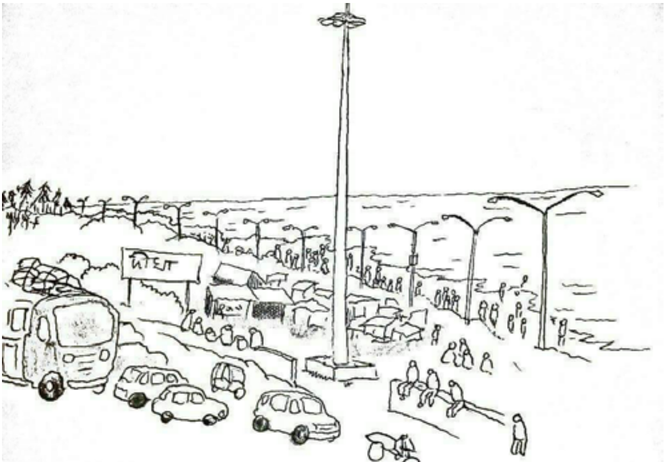

জনান্তিকে সুমন মান্না নিজেকে কবিতার ছাত্রই বলতে পছন্দ করেন। নব্বইয়ের চিহ্ন ধারণ করা কবিতাগুলি বেশ দৃশ্যনির্ভর। হয়ত আগের কবিতার আকাশপথে ভ্রমণের পরে পাঠক নেমে এসেছেন এক নদীর ধারে। এক শীতলা ঠাকুরের মূর্তি যা ভাসান দেওয়া যায় না বলে নদীতীরে ক্ষয়ে যেতে থাকে, বাহনসমেত। তার কাছে হয়ত দতুত বদলে যাওয়া নব্বই কিছুর একটা দোহাই দিয়ে আটকান - যা মাটি আঁকড়ে পড়ে থেকে দেখবে যতটুকু দেখা যায়। এমন কিছু একটা, তখনকার মানুষগুলো যেমন, যতই বেখাপ্পা লাগুক - চট করে কোনও কিছু ফেলতে পারে না।

মা শেতলার থান

সুমন মান্না (ফোনঘর)

এইখানে আশ্রয় পেলে, নদীটির পাশে, ক'দিন রয়েছ বসে
চাপা পড়া ঘাসগুলি হলদে হয়েছে ক্রমে, বাকিরা ফ্যাকাসে
তবু মৃত্যু নিকটে এলে বেঁচে থাকা শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়
সময়ে পড়তে বসে প্রতিটি বালক, তড়িঘড়ি অফিসেও যায়
নদীটির তাড়া নেই, কয়েকশো বছরের পলি বুকে জমে
হাপরের মতো শ্বাস টেনে আজকেও শেষ খেয়া পার করে ক্রমে।

এখানে রয়েছ তুমি, জরিপাড়, রং কিছু রয়েছে এখনও
মাটি খসে খড় বাঁশ বেরিয়েছে রৌদ্রে প্রকাশ্যে কোথাও

বাহনের চোখ গেছে তাও দেখ একঠায়ে রয়েছে দাঁড়িয়ে

কান খাড়া নদী তাক করে, ভাবখানা কেউ বুঝি জাব এনে দিয়ে

বলে দেবে – যত খুশি খাও। তুমিও কি ভাবছ না মনে

সারা শহরের লোক হত্যে দিয়েছিল স্বীয় সঙ্কল্পসাধনে উৎসব রাতে

রাশি রাশি নৈবেদ্য তোমার, উপবাসক্লিষ্ট তৃষ্ণার্ত ম্লান মুখগুলি

হীরের মতোই জ্বলে খালি পেট, জামাহীন কাঠি শরীরে অজস্র মাদুলি।

যশোধরা রায়চৌধুরী তার নব্বই উদযাপন করেছেন "সাক্ষরতা মিশন" দিয়ে। "চলো পড়াই কিছু করে দেখাই" - কথাগুলি একটা লব্জ হয়ে গিয়েছিল। হয়ত এইটুকুই, এই ক'টা কথাই নোঙরের মতো আটকে রাখছিল বদলে যায় দ্রুত সময়টায়। যাকে যশোধারা বলছেন "কিছুদিন বাদে আমি সত্যিই মনে করতে পারব না কোন লেখা আমার আর কোন লেখা অন্যের। সবটা মিলে মিশে আমার মননে চেতনায় পড়ে থাকবে শুধু নব্বইয়ের চিহ্নগুলি।"

বইটির নাম কবিতার প্রথম লাইনে দেখি - "আমি বলাগড় যাবো, তুমি বলাগড়ে নামিও আমায়।' বলাগড় শব্দটা কাগজে দেখেছি। রাজনৈতিক খবরে ছিল হয়ত। ২০১৭ সালে কবিতা পড়তে গিয়ে গুগুল ম্যাপে দেখি হুগলি নদীর বাঁকে থাকা বলাগড় ঘিরে থাকে সারিবদ্ধ পুকুর। পশ্চিমে এক দিঘি। কবিতাটি ফিরে পড়ি ফের। সাক্ষরতা মিশন বুঝতে থাকি।

সাক্ষরতা মিশন

যশোধরা রায়চৌধুরী

চৈতন্যশ্রেষ্ঠতা, আমি বলাগড়ে যাবো, তুমি বলাগড়ে নামিও আমায়।

না আমার দীর্ঘপথপরিক্রমাকারী বন্ধু, হাত ওইভাবে বাড়িও না

ও জিপমোহিনী রঙ্গ, তুমি আজ বিডিও আমার।
সব ধান শুষ্ক হয়ে গেল এই মাসে

সব অস্ত্র ঝরে পড়ল পঞ্চায়েতে, গাঁয়ে
সব গোপনীয় সার, কলের-দাম-দিয়ে-কেনা জল
পাম্পের চাবি ও কাঠিঃ বন্ধ রয়ে গেল ঐখানেঃ শুকনো অঞ্চল আপিশে

ওরা সব হাসতে হাসতে সন্দেশ কিনেছে শুধু, মায়ামোহী লোক
ও আমার বিডিও বান্ধব, তুমি আমাকে ও জিপ দেখিও না
সাক্ষরতা খেলা আমি জানি, ঐ অক্ষর খসেছে ঝোপেঝাড়ে...

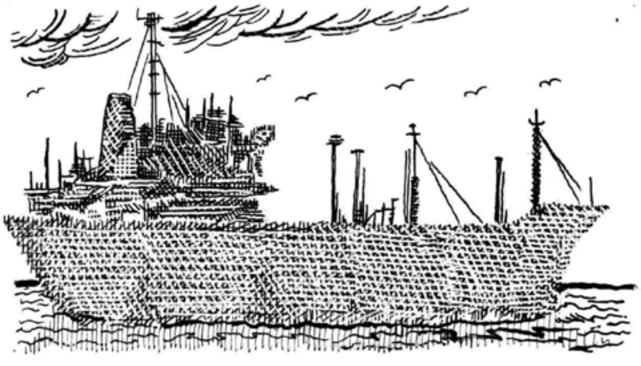

রোশনারা মিশ্র র কবিতা খুব অল্প আঁচড়ে পূর্ণাবয়ব ছবি তৈরি করতে পারে। ব্যাপারটি এত অনায়াস লাগে, আর ছবিগুলি এত জীবন্ত, তাতে পঠন প্রক্রিয়ায় একটা ম্যাজিকের কাজ করে। তার পিছনের অনুশীলন, শ্রম এইগুলি একটুও দেখা যায় না। এত সহজ বুঝি কবিতা রচনা? এমন পরিপূর্ণ রচনা সম্ভব এত অল্প কথায়, এইটুকু শব্দে? কাগজ কলম নিয়ে নিজে চেষ্টা করতে গেলেই বোঝা যায়, কিছুটা। কবিতার মানস ভ্রমণে আমরা এ পর্যন্ত সমুদ্র সৈকত দেখেছি, শিখেছি হেপ্তিনা, ফানুসে উড়েছি, নদীপাড়ে শীতলার থান হয়ে বলাগড় গ্রাম। ছোট ছোট অল্প আঁচড়ে আঁকা ছবি, তাই রোশনারা র ১৯৮৯ বইটি থেকে তিনটি কবিতা থাকুক।

কুকুর

রোশনারা মিশ্র (১৯৮৯)

গরু

শান্ত অচলা সময়,
গরুদের গা ধুইয়ে দিচ্ছি
অগরুও গন্ধ আছে এক
মৃতদেহ ছাপিয়ে যাওয়ার
বাহ্যত কাঠ হয়ে আছে,
বাঁটে তার জমে যাচ্ছে দই

শ্লথ

তাড়া করছে শ্লথ, সময় ধীরগামী
অপেক্ষার কিছু নেই, অপেক্ষাই পথের অন্তিম
বেশি কম উড়ছি সকলে
কে যে কার পাশে নেই কে কবে সে খেয়াল রেখেছি
ভাগ্যিস ডানাও নেই, থাকলে খুব বিড়ম্বনা হত
তাছাড়া তাড়া করছে শ্লথ, তাড়াও তো নেই

বড়জোর গ্লোবের পৃথিবী

সকলেরই সীমান্ত ঘিরে কুঁকড়ে যাওয়ার, জড়ো হয়ে বসার, খাঁজে খাঁজে ভিজে ঠাণ্ডা নাক গুঁজে দেওয়ার – সে যে কি আকুতি......
আমারই বা তার বেশি কি!

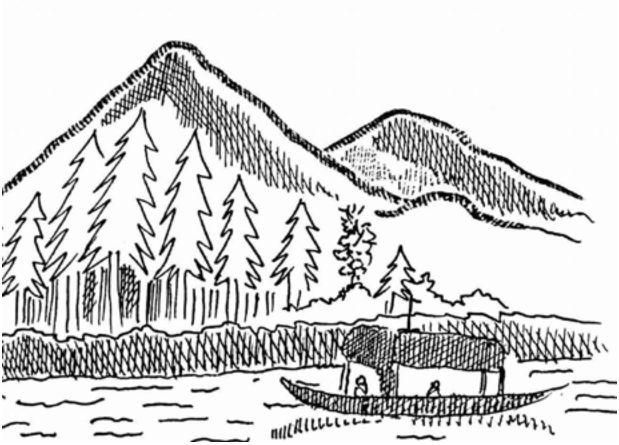

"সরে দাঁড়ালেন লেন্ডল" - কবি অংশুমান করের বইটির নাম আমাদের চট করে পৌঁছে দেয় সেই দিনগুলোতে যখন টেনিসের সবক'টা গ্রান্ড স্ল্যাম জিতে এসে লেন্ডলের অশ্বমেধ থেমে যেত উইম্বলডন এলে। বিরক্ত হয়ে বলে ওঠেন -ঘাস তো গরুর খাদ্য, আর পরের বার ফিরে আসেন নতুন উদ্যমে। তার না পাওয়াটুকু নব্বই তুলে রাখে যত্ন করে। অংশুমান তার "ডিউস" কবিতায় লিখছেন

"লাস্ট চান্স, বয়েস বত্রিশ
পরের সার্ভের জন্য বেকার প্রস্তুত
বাঁ দিকে একটু সরে দাঁড়ালেন লেন্ডল।"

কিন্তু সেটা নয়, যে কবিতা আমাদের তাড়িয়ে বেড়াবে তা "মাইন" - যেখানে "শুধুমাত্র বেঁচে থেকেই কেউ আমাদের কষ্ট দেয়..."

সরে দাঁড়ালেন লেন্ডল

অংশুমান কর

মাইন

শুধুমাত্র বেঁচে থেকেই কেউ কেউ আমাদের কষ্ট দেয়। কোন ক্ষতি করে না আমাদের, ভয় দেখায় না, চাক্কু দেখায় না, ভিড়ের ট্রেনে ছিঁড়ে নেয় না বউ-এর লকেট। শুধু বেঁচে থাকে। বছরের পর বছর, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, মানুষের উপেক্ষা, ছোঁড়া ঢিল, গরম জল হজম করে বেঁচে থাকে। আমরা ভাবি, লোকটা মরলেও তো পারে, কাল থেকে যেন আর না দেখতে

হয় ওর মুখ। কিন্তু পরের দিনও আমরা দেখি মোড়ের মাথায়, শিব মন্দিরের পাশে, প্ল্যাটফর্মের গা ঘেঁষে ঠিক বেঁচে আছে। আমাদের যাওয়া ও আসার পথে ঘুমন্ত মাইনের মতো বেঁচে থেকে অস্বস্তি ছড়াচ্ছে।

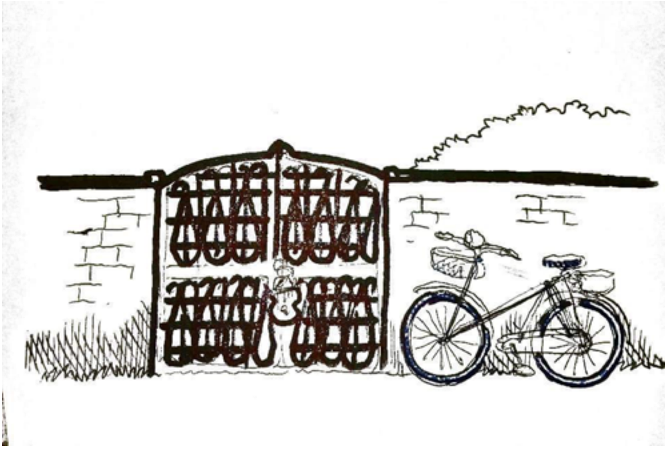

কল্লর্ষিও তাঁর “যে গান শোনে না কেউ” বইতে কবিতার নাম দেন নি। কবিতা আত্মজীবনের অংশ - এই কথা মানলে কবিতার নামকরণ না থাকা আলাদা করে মনে পড়ে না। কবিতার নাম, তাকে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য দেয় বটে, তাতে হয়ত কবি ভাবেন এতে অন্য দিকটি হয়ত কিছুটা ছায়াচ্ছন্ন হল। একটি ছোট কবিতায় লেখা হয়েছে

“ বহুদিন বাদে তোমরা বেড়াতে গেলে আজ / তোমাদের আজ বিবাহবার্ষিকী/ বিবাহিত জীবনের সাধ, কোথাও রাখে নি কোনও খাদ/ যৌথ জীবনের উপস্থিতি, নাড়াচড়া, প্রায় টের পাও / হাইফেন নড়ে, হাইফেন খুলে যেতে চায়/ যখন রাত্রিবেলা, উ: ... ছাড়ো, আ: ... হল না তোমার”

নাম হয়? নামে আঁটে এই জীবন - এমন এক অস্থির পাঁকাল সময়?

অন্য কবিতা রইল কল্লর্ষির পাঠকের নিজস্ব উপলব্ধি নিয়ে ভাস্বর হওয়ার অপেক্ষায়।

যে গান শোনে না কেউ

কল্লর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধবী, সহজ লতা, ফুলেদের জটিলতা ক্রমে
জীবনে এসেছে
আক্রোশে প্রেমের বশে, ছিঁড়েছি তোমার পাতা
মাধবী, হত্যার পর, বৃতির বেদনা যেন

আমাকে বিঁধেছে
মাধবী, গ্রহের টানে, অনেক ভ্রমণ হল
এ বছরে প্রেম হল আমাদের, যার-পর-নেই
হিন্দিতে
অভিজ্ঞতাগুলি, আরব সাগর জলে
মিশে আছে
মাধবী, সহজলতা, জটিলতা থেকে শুধু ফুলগুলি
তুলে নিতে চায়

অয়ন চক্রবর্তী জানান "যখনই অর্থসঙ্কট (অর্থাৎ অনিশ্চয়তা) এসেছে, কবিতা দৌড়ে এসেছে আমার কাছে।" আমরা সবাই যেমন যাই নিজস্ব ভরসার কাছে সমস্যা দেখলেই। বন্ধুর কাছে, গুরুদেবদের আজকাল যে কারণে এত রমরমা। হয়ত কবিতার কাছে কেউ তেমন যাচ্ছেন না মনন রক্তাক্ত হলে, হয়ত বন্ধুরাও দূরে যেতে বসেছে। "বিষণ্ন রূপকথা" - ঠিক সেই কারণেই অবশ্যপাঠ্য বলে মনে হয়। এক জায়গায় লেখা হ'ল -

"তবুও তোমাকে মনে পড়ে
যেভাবে হঠাৎ দাঁত পড়ে গেলে কোন,
শূন্যস্থানে বারবার জিভ চলে যায়।"

অন্য একটি কবিতা পড়ুন পাঠক।

বিষণ্ন রূপকথা

অয়ন চক্রবর্তী

এখানেও সূর্য ওঠে পূর্বদিকে,
এখানেও পূর্ণিমায় বেশ গোল চাঁদ থাকে,
অমাবস্যায় ট্যুরিস্ট আসে কম।
এখানেও গায়ে গুলি-ফুলি লাগলে রক্ত ঝরে
তার রং আশ্চর্যজনকভাবে লাল।
এখানেও বরফের ওপর কেউ মৃত্যু দিয়ে লিখে যায় স্বাধীনতা।
আমরা পড়ি দেশভাগ, পড়ি ষড়যন্ত্র, পড়ি জঙ্গী,

পড়ি দেশদ্রোহ, পড়ি সন্ত্রাস, পড়ি হত্যা,
পড়ি নাশকতা, পড়ি সস্তায় চাল, সস্তায় ডাল,
সস্তায় মরে যায় কেউ কেউ। এমনই অকৃতজ্ঞ।
ভূস্বর্গ সুখের হয় পেলেটের গুণে।

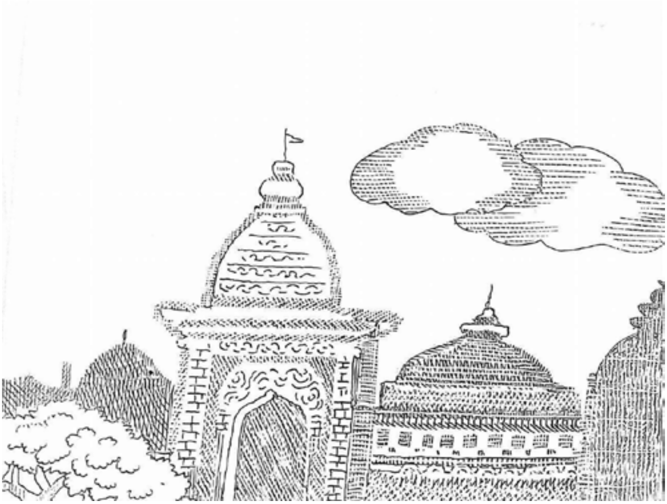

পারমিতার কাব্যজগৎ পোয়েটিক ভিশন আর ভিশুয়াল পোয়েট্রির মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কবি আরও স্পষ্ট করে ঋণ স্বীকার করেন বাংলা কবিতার অগ্রজদের অকুণ্ঠে। এইভাবে চেনা পরিচয় বের হলে তার কবিতার আরও কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। তাঁর "কূর্মাবতার" বইটির "বশীকরণ" কবিতাটি শুরু হয় এইভাবে -

"ভাবছি রূপমোচন ঘটাব। ডাকিনী হব। সোনার কঙখল বাজিয়ে ফুসমন্ত্রে বশ করব তোমায়।"

এই নারী যেভাবে চান তাঁর কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে। সে ঠিক আছে, এমন তো দেখা যায়। কিন্তু কিছুটা এগোতে এগোতে গিয়ে শেষ অবধি কবিতা অন্য দিকে বাঁক নেয়। একটি আদ্যন্ত প্রেমের কবিতা, যা পড়ার পর আর একবার ফিরে আসতে বলে পাঠককে প্রথম পংক্তিতে, এমনকী কবিতার নামটায়। এখানে থাক কবির "দাম্পত্য" কবিতাটি। পাঠক চিনবে এদের। হয়ত জানবে, বা জানতে চাইবে আর পারবে না কোথায় যে কাকে "ভালোবেসে যেতে হচ্ছে, হিসেব মিলছে না।"

দাম্পত্য

পারমিতা মুন্সী (কূর্মাবতার)

হাহাকারের ভেতর দিয়ে তোমাকে ভালোবাসছি, বুঝতে পারছো না?

চড়াই উৎরাই প্রস্রবণ পার করে এসে, ক্লান্ত মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে

ক্যাকটাসের বালুকাপ্রীতির মতো তোমাকে ভালোবাসছি, বুঝতে পারছো না?

শহর ছাড়িয়ে আমি হদ্দগ্রামে বাসা বেঁধেছি। সরাইখানায় যে যুবক

রোজ রাতে মদমাংস খেতে আসে, খুচরো পয়সার প্রতি তার আকর্ষণের

মতো, আমি তোমাকে ভালোবাসছি, তুমি বুঝতে পারছ না?

তুমি বুঝতে পারছ না, এই পথ শেষ হলে এক

নদী পড়বে, তার ওপরে সাঁকো, সে সাঁকো পেরতে

আবার তোমাকে আমারই হাত ধরতে হবে, নদী পেরিয়ে

আবার এক নতুন সভ্যতায় তোমাকে ঢুকতে হবে আমার

হাত ধরে..... এ সহজ সত্য তুমি বুঝেও বুঝতে চাইছো না।

ফলতঃ হাহাকারের মধ্যে দিয়ে, দুঃখের ভেতর দিয়ে,

মিথ্যে হাসির ভেতর দিয়ে, কখনও-বা কল্পদাম্পত্যের

ভেতর দিয়ে আমাকে একতরফা তোমাকে ভালোবেসে

যেতে হচ্ছে, হিসেব মিলছে না।

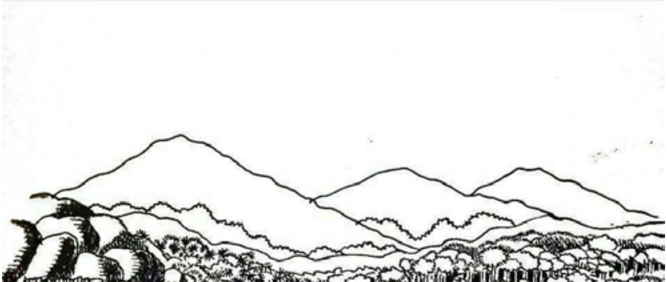

আগের কবিতাটি যদি বাস্তব থেকে ছেঁকে তোলা কবিতার অবয়ব ধরি তো পরের যে বইটি হাতে আসে তাতে দেখি বাস্তব'কে মাঝরাস্তায় রেখে কবি সাঁৎ করে হাওয়া খেতে চলেছেন অন্যতর জগতে। কবি শান্তনু রায়ের "পড় শুধু স্মৃতি" বইটির "চুল্লী" কবিতার লাইনটি যেখানে বলা হচ্ছে -"মা সূর্য আজ ভোরে ক হাজার উনুন বিয়োলে গো...."

এই ভাষা, এই জগৎ, আমাদের চেনা নয় খুব। কেউ কেউ কাছে যেতে পারেন এইসব জগতের তাঁদের মধ্যে শুধু জনাকয়েক অনুবাদ করেন এইসব আমাদের মতো মর পাঠকদের জন্য। কবিতার শরীরে একটা সময়ের ছাপ দেওয়া, কয়েকটা চিহ্ন, যাতে সেই জগতের ভাষা, বুঝতে, জানতে ইচ্ছা বাড়তে থাকে। তার একটি থাক।

ম্যাজিক বোতাম / ২৫ মিনিট

শান্তনু রায় (পড় শুধু স্মৃতি)

ঘড়িটা খেয়ে ফেলার পর থেকেই এসব দেখছি....
সেদিন একটা ডিক্সনারী মাথায় দিয়ে শুতেই সারারাত
উপাদেয় ফরাসী স্বপ্ন দেখলাম টেলিফোন তুলতেই
ওপাশ থেকে হাউ মাউ শুধু কান্না শুধু কান্না
মদ্যপ বেড়ালদের রোজ রাতে অসম্ভব হুল্লোড়
আকাশময় তারাদের ব্রাউনিয়ান চোর চোর খেলা
দলে দলে মারমেইডরা সৈকতে উঠে আসছে....
পাখীরাও মেঘের কোটর ছেড়ে সরকারী স্যানিটোরিয়ামে

এইতো সৃষ্টি হল তেলভিত্তিক প্রাণ
মেঝের মসৃণতা আক্রমণ করে একঝাঁক জ্যান্ত মার্বেল
তারপর আমার কোনো স্মৃতি থাকলোনা
সেই ছেলেবেলা থেকে অজস্র মার্বেল কুড়িয়েছি
হারিয়েছি ভাগবাঁটোয়ারা করে সব বন্ধুবান্ধব
এ শহরে সৈন্যরা ফুটপাথে ছাউনি ফেলেছে
মাইক হাতে রিক্সায় একটা লোক সকলকে ডেকে বলছে
ভাইসব আর ঠিক পঁচিশ মিনিট পর সূর্য অস্ত যাবে
আপনারা সাবধান হোন অমরা দুজন এই
অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িটাতে দুজনকে খুঁজে চলি
থমথমে ঘরগুলোয় আবছা আলোর পর্দা কোনো একটা
সিঁড়ির কাছে গিটার বাজাচ্ছে কেউ রেডিওতে ভারী স্বর
রাস্তায় সে লোকটা একটানা ডেকে যায়
তেইশ মিনিট আর মাত্র তেইশ মিনিট
"আদিম আগুন জ্বেলে ওরা আজও সারারাত জাগে;
গুহামানবের দল, পাশেই সাজানো তাস, অবিশ্বাস, জুয়ো।....."

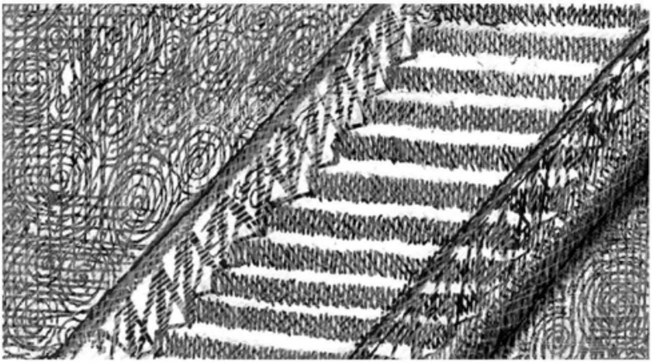

কবিতা শুরু হয় এইভাবে? অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে নাটক শুরু হচ্ছে? নাকি পাঠক পাতা উলটে এই দু'লাইনে আটকে ভাবছে এ কবিতা কোথায় নিয়ে যাবে তাকে- কতদূর? আচমকা হাত ছেড়ে অন্ধকারে রেখে দূরে গিয়ে হা হা শব্দে হেসে উঠবে না তো? এই সংশয় তৈরি হয় কবি হিন্দোল ভট্টাচার্যের "লেখো আলো লেখো অন্ধকার" বইটির পাঠে। কবি নিজে বলছেন "এর মধ্যেই আমাদের দিনযাপন আর সেই সব টুকরো টুকরো অপ্রত্যাশিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া।"

বই থেকে "উৎসব" কবিতাটি থাক এই কবিতার উৎসবে।

উৎসব

হিন্দোল ভট্টাচার্য (লেখো আলো, লেখো অন্ধকার)

চুপিচুপি আমি সব কাঠখড় পোড়াই নিজের
বড় ধোঁয়া ওঠে, আমি ঢাকা পড়ে যেতে যেতে ভাবি
কেন শ্বাসকষ্ট তবু হল না এখনও?
তুমি কি জলের কাছে বলেছিলে আমার নাম করে?
তোমার গোপন স্বপ্ন? যেন তা না সত্যি হতে পারে
এমন করেই? ভুয়ো গল্পগুলো আসলে লিখিত
হতে হতে সত্যি হয়ে যায়, তাই চুপ করে থাকো।
আম্মি সব কষ্টগুলো জলে ভাসিয়েছি তাই
আমি জানি কত ধানে কত দুঃখ আছে।
এক মাঠ শস্য নিয়ে কৃষকের আলপথে

কয়েকবছর থাকে লাঙলের শ্রম যেরকম।
যদিও লাঙল নয়, ফসলেই খিদে মেটে নবান্নে তোমার।

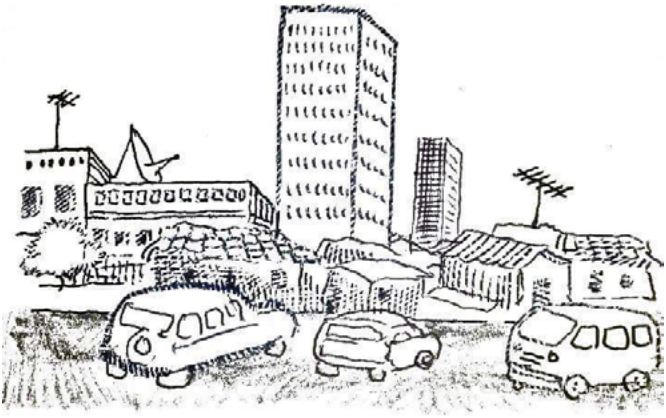

"উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বান্ধবীকে" বইটির সম্পর্কে কবি প্রসূন ভৌমিক জানান কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৯৫। এও বলছেন "সামান্য কাটাকুটি করলাম। ছন্দ, বাক্যগঠন খুব একটা পরিবর্তন করিনি। আজ লেখা অনেক বদলে গেছে, যেমন বদলে গেছে জীবনও। কিন্তু কুঁড়িবেলার লেখাগুলি অস্বীকার করার উপায় তো নেই! ধরা পড়ে গেলাম।"

সহজ এই স্বীকারোক্তি খুব একটা সহজ নয় কিন্তু। আজকের দিনে এটা যে কতটা, তা পাঠক জানবেন। আমরা এক মানুষের ড্রইং রুমে গিয়েছি, দেখছি - "আলমারির থাকে থাকে বই, / তার কিছু পৃষ্ঠা থেকে উঁকি মারে / গোলাপজামের ধাঁচে হস্তাক্ষর, চিঠির ইশারা / সারাদিন দেবদারু পাতা বেয়ে নেমেছে জলের ধারা" - এই ক'টি লাইনের ইশারায় আলো আঁধারিতে এক পাহাড়ি শহরে পাঠক খুঁজে পান নিজেকে। সারাদিন বৃষ্টির জন্য তার যেখানে যাওয়ার কথা ছিল যেতে পারলেন না। কারোর একটা ড্রইংরুম, সে কোথায়, জানা যাচ্ছে না। শুধু একটা আলমারি, যাতে নির্ঘাত গুপ্তধন আছে।

এই জগৎ, নির্ভেজাল সৎ কবিতার জগৎ। তারপর সেই কবিতায় কি হয়েছিল তা উৎসুক পাঠক খুঁজে নিন। "অর্ধনমিত চাঁদের কাছে সব ফাঁস করে দেব" শীর্ষক (নামহীন) কবিতাটি এইখানে থাক তার মায়াজাল বুনে।

প্রসূন ভৌমিক (উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা বান্ধবীকে)

অর্ধনমিত চাঁদের কাছে সব ফাঁস করে দেব,
বহুদিন সহ্য করেছি!
আমাকে ভয় দেখিও না

জানা আছে জিপসির কাছে শেখা অসম্ভব প্রেম...

তবু ভয় হয়।
ভয় হয় নিজেকে নিয়েই, আমি আবোলতাবোল নদী
মাটির বুকে জল কেটে স্বেচ্ছাচারী,
ভয় হয় তুমি পাড় দিয়ে ছুটে ছুটে ক্লান্ত
কখন যেন কলাগাছের ভেলা হয়ে বুকের ওপর
তারপর হাঁসফাঁস শক্ত ভূমির জন্য ফের
ফের তুমি পাড়ের জন্য ছটফট, প্রবাসিনী

ভয় হয়,
তোমায় জাপটে আমি শুধু বয়ে যাব
তোমাকে সমুদ্রের গল্প অনিচ্ছাসত্ত্বেও...

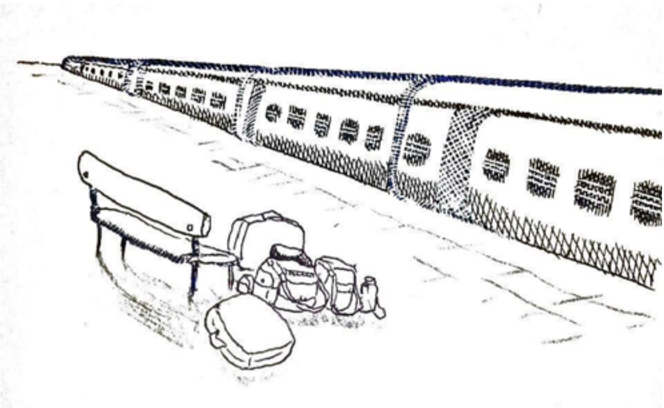

"হারানো জুতোর পাটি" তে আটকে রাখেন কবি শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। "যে বয়েস হরিণের নয়" বইটিতে যেখানে বলছেন-

"রেখেছি সযত্নে আজো একপাটি জুতো

না-থাকা অধিক লাগে যে আছে তাহার থেকে"।

মনে পড়ে একপাটি জুতোগুলি ব্যবহৃত না হ'তে হ'তে ধুলো পড়ে, ক্রমে শক্ত হয়ে যায়, শুকিয়ে। তখনই দেখি পরের লাইনগুলি আসে -

"আমি কি বিলিয়ে দেব?

অঘ্রাণে, তোমার গায়ের থেকে হালকা শীতের রাতে টেনে নেব সুতির চাদর?"

কবি এইভাবে পাঠকের হাতে হাত রাখেন, তাকে বেড়াতে নিয়ে যান নিজস্ব যাপন জগতে। নাম কবিতাটি স্থান পায় বইয়ের শেষ পাতায়। পাঠক আস্বাদ নিন "যে বয়েস হরিণের নয়", তার।

যে বয়েস হরিণের নয়

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

যে বয়েস হরিণের নয় আমি তার দিকে চেয়ে থাকি
যে বয়েস বাঘেদের নয়

জঙ্গলে পাতায় পাতায় আলো ও আঁধারে মাখা
ভিজে পায়ে হেঁটে যায় জলপান সেরে

আপাত নিরীহ কেউ
বিশ্রাম কালে

যে বয়েস পোকা ও মাকড়ের , যে বয়েস পাতার আড়ালে গান
অবিশ্রাম মাথা ভরে থাকা সুর , কেবলি বৃষ্টির মত প্রিয়
ঝমঝম হেটে যায়

ভিজে চুলের ডগায় ফোঁটা ফোঁটা আলো ঝরে
আলো ঝরে চোখের পাতায়

"পাখিয়াল" এর কবি সায়ন বলছেন "এখানে পাখির কোনও গল্প নেই।" তা নেই, তবে পাঠক খুঁজে পান পাখিটি, ছটফটে কৈশোর যার কাটে শহরের উপকণ্ঠে, আগরতলায়। পাখি সেই শহরতলী হয়ে কলকাতা, তারপর নদীপথে গোমতী, বুড়া লুঙ্গ হুগলি হাডসনে উড়তে উড়তে থাকেন। সেই উড়ন্ত কবি পাখি খুঁটে খুঁটে শব্দ তুলে এনে বাসাটি বাঁধলেন তার এই প্রথম বইটিতে।

"কীইবা এমন গরল ছিল তোমার দেশে
সাঁতরে বেড়াও মিথ্যে পাহাড় শহর নদী
মধ্যরাতে এদিক ওদিক অস্তগামী
নষ্ট ঘুমে আঁকড়ে থাকো কূল কিনারা"।

আমরা তার নতুন বাঁধা ঈষৎ অপুষ্ট বাসায় শীতে আচমকা ঘুম ভেঙে ওঠা পাখিটিকে দেখি মন খারাপ করতে আর নিজের ফেলে আসা শহর হু হু করে তেড়ে আসে। এই কবি সহজে নিস্তার দেন না। "আগরতলার পদ্য" কবিতাটি থাকুক এইখানে।

আগরতলার পদ্য

সায়ন করভৌমিক

লোহার গেটটা তেমনি আছে, বন্ধ।
বালিকাশোভন লাল সাইকেল
দরমা বেড়ায় হেলান দেওয়া দুপুরবেলা
গ্রীষ্মপ্রধান শহরতলির উপকণ্ঠে।

একপা দু'পা তিনপা করে ধানের ক্ষেতে
রৌদ্র ছায়া একটু যদি উত্তরে যাও
পুল পেরিয়ে; খরস্রোতা এমন তো নয়
নিতান্তই খালের ওপর, সেচের খালটি
রাজ আমলের শহর ঘিরে খুব ম্রিয়মান
তখনও ছিল।

এইতো আবার উল্টোপাল্টা ঘুরতে থাকো
পোস্টাপিসের কাছেপিঠে কেউ যদি ফের
চেনা বেরোয় তবেই গেরো। এখন দুপুর
লোহার গেটটা বন্ধ আছে।
লেকের জলে মানস থেকে পাখি আসে
সেসব জানে অনেক লোকই, যারা তখন
বাস করেছে বনের ধারে শহরতলির উপকণ্ঠে
যারা তখন মহানগর চিনতো না আর
চিঠি লিখতো ডাকবিভাগের নানান ছুতোয়
কিন্তু সেসব থাকুক; লেক তো অন্যদিকে।
আর কতবার সাইকেলে চেন পড়বে শেষে
পাড়ার দাদা ঘাপটি মেরে তারও নজর
গ্রীষ্মপ্রধান এই শহরে দুপুরবেলা সে যাই বলো
লোহার গেটটা আপদ বিশেষ।
যেমন আপদ স্কুলের ছুটি গ্রীষ্ম কিংবা
পুজোর সময় কি প্রয়োজন সিরিয়ালের
স্কুলগুলোতে সবাই কেমন বেড়াতে যায়
আবার যেমন অনেক লোকের টেলিফোনও

ডাক দিয়ে যায় সুযোগমত কিন্তু সেসব
কলকাতাতে হয়তো আছে।
বিকেল হলে অফিস ফেরৎ বাড়ি ফিরবে
সব লোকেরা এই শহরে সবাই সবার
চেনা বেরোয়, কলকাতাতে হয়তো সেসব
অন্যরকম। লোহার গেটটা বন্ধ থাকে।
লোহার গেটটা বন্ধ থাকে, লাল সাইকেল
হেলান দেওয়া দরমা বেড়ায়। এইরকমই
তুচ্ছ মতন কাব্য থাকে এই শহরে
একটু যদি পশ্চিমে যাও জাতীয় সড়ক
অনেক রাত্রে ভোঁ শোনা যায় রেলের বাঁশি।
মহানগর হয়তো অনেক অন্যরকম।
লোহার গেটটা তেমনি আছে, বন্ধ।

কবি সার্থক রায়চৌধুরী জানালেন তাঁর "পেশা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার। নেশা শিক্ষকতা। দায় বর্তায়। স্বপ্ন তৈরি করে নেন। স্বেচ্ছানির্বাসিত স্বঘোষিত দার্শনিক।" এই পরিচয়টুকু না থাকলেও কিছু আসত যেত না হয়ত কবিতা রসিক পাঠকের। কিন্তু কথাগুলি আমাকে কবিতার নির্মাণপ্রক্রিয়া বোঝানয় সাহায্য করবে ভেবেও দেখি শেষ অবধি লাভ খুব একটা হয় নি। কবিতার যতটুকু নিজে ধরা দেয় ততটুকুতেই বুঁদ পরিচিতিটুকুর পরেও।

"যারা কিছু করে না,..... খালি রোদ্দুর হেসে ওঠে।
একটা গানের কথা ভেবে যারা গুনগুন করে ওঠে সুর,....

শুধু, তাদের জন্য এই নিরালা দুপুর।....."

বইয়ের নামকবিতাটি থাকুক আপাতত। সার্থক হোক "আত্মার আশ্চর্য সেলফি"।

আত্মার আশ্চর্য সেলফি

সার্থক রায়চৌধুরী

অসম্ভব শব্দ করে একটা ভারী মেশিন চলছে,...তার শব্দ ছাপিয়ে কেউ গান গেয়ে চলেছে নিরন্তর... ওদিকে পাগলা ডাক্তার মৃতদেহের দু'দিকে হৃদযন্ত্র চালু করার মেশিন লাগিয়ে ক্রমাগত চিৎকার করছে - 'চার্জ, চার্জ,... চার্জ...' - কেঁপে উঠছে ঘরবাড়ি, ঝনঝন করে ঝরে পড়ছে গৃহস্থের বাসন-কোসন আর অন্ধ আকবর বস্তাবন্দি রক্তাক্ত দেহ হাতড়ে হাতড়ে - 'আল্লা,.... আল্লা' বলে কাঁদছে....

কাল সারারাত বৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। কাল সারাদিন ছিল রোদ্দুরের সম্ভাবনা, ... কাল ছিল সম্ভাবনাময় প্রস্তাবের দিন, তাই যারা নদীর ধারে ক্যাম্প করেছিল তাদের সমস্ত গামবুট চুরি করে ছেলেরা জঙ্গলে পিকনিক করতে গ্যাছে আর যে ছেলেটা সকাল থেকে মুরগি কাটছিল আমি তাকে পাখির বিষয়ে কিছু বলতে বলেছিলাম....

একজন খুনি আমার রুম-মেট ছিল,... একজন ক্লাউনের সাথে দু'বছর কাটিয়েছি আমি,... এক সুমহান নিম্ফোমেনিয়্যাক রাত্রির সাথে,.... এক নার্সিসিস্ট আকাশের সঙ্গে,.... একটা মেগালোম্যানিয়্যাক পেনের সঙ্গে প্রায় একটা জীবন,....তাই জানি-সঙ্গমের শেষে যে - ঈশ্বর, তার পায়ের চিহ্ন পড়ে না । সঙ্গমের শুরুতে যে - ভগবান, - তার রক্তের কোনো দাগ নেই,... ফলে,... আস্তাবলে কারা আগুন লাগিয়েছিল? যখন কেশরে আগুন নিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল ঘোড়াদের দল,.... তখন -'জল জল' চিৎকার না করে কে বসে আঁকছিল ছবি?.... কে তখন রজনীগন্ধার বাগানে ছড়াচ্ছিল তেল ও ফলিডল?... কেন সেই আত্মার আশ্চর্য সেলফি, ... তার বাঁ হাতে করবীর ট্যাটু কেউ লক্ষ্য করল না....

নিজের বাড়িতে আমি সাতবার হারিয়ে গেছিলাম। নিজের ঘরে আমি তিনবার পাগলের মতো দরজা খুঁজেছি। অক্ষরের গন্ধ শুঁকে শুঁকে আমি একবার বেথেলহেম চলে গিয়েছিলাম,.... একবার কার্দোবায়... কয়েকটা হারানো পেনসিলের খোঁজে কাঁটাতার টপকে উপদ্রুত এলাকায় বিস্ফোরণে জ্ঞান হারিয়েছিলাম...

'আগুন যখন লাগে, যখন ব্লাস্ট-টা হয়, - তখন কোথায় ছিলেন? কী হল? যখন ব্লাস্ট-টা হয়...' টানা ইন্টারোগেশন,...

পর পর ট্রেন চলে যাওয়ার শব্দ, যদি কাল থেকে হাওয়া না বয় ! কাল থেকে যদি ফিকে হয়ে আসে সমস্ত কুয়াশা ! ... যদি কাল থেকে পৃথিবীর সমস্ত টেলিফোন ক্রমাগত বেজে যেতে থাকে !... আমি শিউরে উঠেছি !...

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য স্পষ্ট। উচ্চারিত। যদিও কবিতা লেখাকে বলেছেন “অতৎপর ও গ্লানিময়”। তাঁর কবিতা তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত “সরুচাকলি” বইটিতে। চন্দ্রিলের চেনা স্বতস্ফুর্ততা, উইট এবং নিতান্ত সহজ উচ্চারণের ভঙ্গীতে শক্ত কথাগুলো বলে দেওয়া থাকে কবিতায়। বড় সহজ হয়ত চটুল লাগে কিছু কিছু জায়গা, যেন উত্তপ্ত চাটুর কয়েকটা জায়গা যেখানে রুটি পুড়ে যায়। কিন্তু তাপ আছে। তাপ থাকে। তার কবিতায়, লেখা হয় -

“এ জীবন সংকেতবহুল
এ যৌবন পথিমধ্যে গিনি।
এ হৃদয় বালিকার চুল
এ শরীর নিখাদ স্বৈরিণী।”

এই সংকলনে রাখা থাকুক “মেঘে মেঘে” কবিতাটি।

মেঘে মেঘে

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য

মেঘে মেঘে আজ রাঁধে আকাশের উদাত্ত নীলিমা
এমন রবীন্দ্রদিনে বামচক্ষু মেরে তো দিলি, মা,
এখন কী করে তোকে তুলি বল, এ রোগা শরীরে
আধোয়া পৃথিবী বহে, বিজ্ঞাপনে রূপদক্ষ যুবা
দাড়ি চাঁছে, ঢ্যাঙা মন্দ সিরিয়াস, ক্রুশবিদ্ধ কুবা,
রবাহূত ব্রজবুড়ো পাঞ্জাবির ন্যাজে মেরে গিঁট

মিসফিট বাঁশি ছাড়ে, খাঁজ পেলে অমোঘ রিপিট
আমি পুনঃ বাসে ধাঁ! তবু ব্যাঙচাটা হৃদি ঘিরে
জাগিল প্রণয়-কাগা। কী পাউট! সচিত্র কামট!
ব্লার্ব বলে: ওরে ধ্যাবড়া, রেললাইন খোয়া ধরে ছোট!
উগ্র-চাটু ছ্যাঁকা খাই তেলচপ্পা চাউমিন সেন্টারে
ডিটিপি-কোচিং ধারে জড়াজাপ্টি সাংঘাতিক বাড়ে
ডিং মেরে দেখি, তুই গোল্লা-মারা কেন্নোকে ক্যারমে
ভালই সাইড করলি, তাহার পত্নীকে পমেটমে
নখকুনি মৃদু গুনি, কলতলাময় সিসিটিভি
টাঙায়ে পসার তুললে তুই কি ক্লাসিক খিস্তি দিবি
হলুদ ক্যান্টিন যাই, কচুরির শিরার ডিটেলে
ঝুঁকে দেখি সরু পথে তুই যাস পূর্ণ দুলেহেলে
হাঁটাফাঁটা স্মার্ট আছে, অধরেও স্টেশনের আলো
গলিটা টার্ন নিতেই কে প্রাচীন রেডিও বাজাল

পুজোর ছবি – ঋতুপর্ণ বসু

পদ্য – ফরিদা

মশলা বাটা কুটনো কোটা কাজের নেইকো ফাঁক
পুজো বাড়ির কথার মধ্যে বেজে উঠছে ঢাক।
একদিকে বেশ তর্কাতর্কি অন্যদিকে তাড়া
ভরা পেটে ঘুমোয় বেড়াল পাখিদের আশকারা।

পাচ্ছে হাসন নাচন কোঁদন মত্ত নরনারী
সিদ্ধির গ্লাস চুমুক, ঠকাস যাচ্ছে গড়াগড়ি
কেউ বা গায়ক মহানায়ক কার যেন চোখ লাল
কয়েকটা গ্লাস হচ্ছে খালাস কে ধরে কার হাল?

বোতল চড়ে গানের সুরটি দরজায় নাড়ে কড়া
উৎসব দিনে অসময় তাও শিউলিরা দুর্গারা
আসছে বারান্দায়
বিশে মাতাল কিশোরকণ্ঠী, এমনিতে বেশ ফাজিল
মদ গিললেই ভাঙতে থাকে অন্ধকারের পাঁচিল
প্যাণ্ডেল দেখা যায়।

বাজছিল ঢাক নিজের ছন্দে - উৎসব শেষ, তখন সন্ধে
যাচ্ছে ঠাকুর ভাসান
উৎসব দিন ফিরে যাওয়ার - সব্বাইকে শুভ বিজয়ার
মিষ্টিমুখেই হাসান।

পুজোর ছুটি পাওয়া তল্পিতল্পা লটবহরের
পশ্চিমেতেই যাওয়া
রেলগাড়িতে চড়ে জনা এগারোর ছোট পরিবার
দিল্লি দেখবে ঘুরে
সঙ্গে একটি টিয়া কাচালঙ্কাও নেওয়া হয়েছে
ব্র্যাণ্ড ক্যালিফোর্ণিয়া।

পুজোতে বেড়াতে যান মিস্টার রায়
এবারও সপরিবার শুধু হিমালয়
ম্যালে ঘোরাঘুরি সেরে
নেহাৎ কপালফেরে
হোটেলে ছ্যাঁচড়া বস, দেখা হয়ে যায়।

সূচীপত্র

লেটলতিফ

পুজো

ইস্পিশালের বাড়তি কোচ

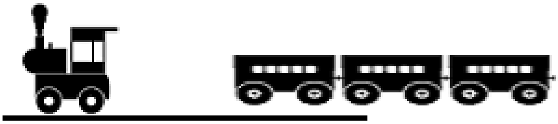

প্রায় হারিয়ে যাওয়া পুরোনো কিছু লেখা আর নতুন কিছু দমকা হাওয়া উঠে এল এখানে।

কিছু থাকল, বাদও পড়ে গেল কতকিছু।

পোড়া ক্যাম্পাস

সুমন্ত

পুজো আর পূজা এক নয়। এইটা শুরুতে কিলিয়ার করে দিই। পূজা ছিলো দুজন। আরো ছিলো, কিন্তু তারা সিনেমা-সিরিয়ালে, আমাদের পড়ার ব্যাচে না। কিন্তু পুজো, অনেক। ফ্যামিলি নিয়ে দুগ্গা, ফ্যামিলি ছাড়া সরস্বতী- এই দুটো-ই ছিলো সবচে গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কেউ বলতো ইম্পোটেন্ট। সেসব অন্য কথা। তখন ক্যাপ পিস্তল ফাটাতাম না, বুড়িমা থাকতো পকেটে। প্যান্ট কাচার সময় পকেটে দেশলাই পেলেও মা কিছু বলতো না। এই নিয়েও একটা গপ্পো আছে। আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন ষোলো। অঙ্ক পড়তে গেছি। হঠাৎ কারেন্ট অফ। স্যার ল্যাম্প-হ্যারিকেন নিয়ে এলেন, কিন্তু দেশলাই নেই। তো, স্যার বল্লেন, তোদের কাছে তো আছে জানি, একটু বের করে দে না, ভয় নেই, এখন অন্ধকার, কে দিচ্ছিস দেখতে পাবো না। তো, স্যারের টেবিলে দেশলাই পড়লো। স্যার আলো জ্বালালেন। তখন দেখা গেলো সব মিলিয়ে খান সাতেক দেশলাই জমা হয়েছে টেবিলে। তাপ্পর, স্যার বলেন, আর তো দরকার নেই, এবার যার যার জিনিস নিয়ে নে। তখনই কেলো। অন্ধকারে দেওয়া হয়েছে, ফেরৎ তো নিতে হবে আলোতে! কেউ আর হাত বাড়ায় না। অনেক সাহস করে শেষমেষ একজন বল্লো, স্যার, আপনি আলোটা একবার না নেভালে কি করে দেশলাইগুলো নেবো! যাই হোক, পুজোর কদিন গুছিয়ে মেয়ে দেখতাম। পাড়ার মেয়েরা তো গলদা চিংড়ির মতো। পাড়ায় খাবে, পাড়ার ফাংশানে গান গেয়ে, ঘুরে ঘুরে নেচে সব্বার ব্যথা ধরাবে, তাপ্পর বেপাড়ার হ্যান্ডু ছেলের সাথে বোঁ করে চলে যাবে। মাইরি বলছি, এটা আমার কথা না, আমার পাড়ায় খুব ভালো ছেলে বলে ইমেজ ছিলো কি

না! সেটাও অন্য কথা। আসল কথাটা হলো, এখন আর এসব কিসুই নাই। ধ্যুস্!

স্কুল পেরিয়ে যদুপুর। সেই পোত্থোম বার পুজোটা বোরিং হয়ে গেলো। পাড়ার যারা খ্রীশ্চান কলেজ আর সম্মিলনী কলেজে ভত্তি হয়েছিলো অনার্স আর পাস নিয়ে, তাদের গল্প আর আমার গল্প আলাদা হয়ে গ্যালো :(বাংলার শ্রীলেখা কে আমি দেখিনি, আর আর্কিটেকচারের দেয়ালীকে ওরা। আমি ইংরেজি পাসের ক্লাসে প্রক্সি দিই নি, আর ওয়ার্কশপের ভাইভায় চাট খায় নি ওরা। পথ বেঁকে গ্যালো। বাঁকতেই লাগলো। ওদিকে, শহরের যারা আমার সাথেই পড়তো, তারা আবার সব মাধ্যমিক-এইচএসের পর টিভিতে ছবি বেরোনো ছেলে। যদিও তারাও বদলালো মেস এ থাকতে থাকতে, কিন্তু তদ্দিনে আমি হোস্টেলে চলে এসেছি। কিন্তু, শুধু যদুপুর না, শিবপুর-জলু-কল্যাণী থেকে টেকনো-হেরিটেজ হয়ে হলদিয়া-মল্লভূম, যারাই ইঞ্জিনিয়ার হতে গেছলো, তারা আবার আড্ডা মারার জন্য পানু, ক্যাম্পাসিং আর প্রোজেক্ট আইডিয়া ছাড়া অন্য কোনো কথা পায় না। আমি সেখানেও অচল। বাকি রইলো হবু ডাক্তারেরা। ঐ ঠেকটাই বেঁচে রইলো। একটু মিস্ফিট হলেও, চলে যাচ্ছিলো। তাই, পুজোর ছুটিতে পড়ব বলে চারটে বই তুলে এনেছিলাম লাইব্রেরী থেকে, সেগুলো ব্যাগ থেকে বেরোলো না। ফিরে এলাম অন্য ব্যাগ নিয়ে। পরেরবার বাড়ি গিয়ে বই এনে জমা দিলাম, ফাইন হলো তিরিশ টাকা। ফাইন জমা দেওয়ার দিন ছিলো সোম, বুধ আর বেস্পতি। সোম আর বুধ ল্যাব থাকে, তাই এ হপ্তায় দেবো, পরের হপ্তায় দেবো করতে করতে ক্লাস টেস্ট এসে গ্যালো। ঐ বইটা তোলা ছিলো না, কিচ্ছুটি না পড়ে পরীক্ষা দিলাম, পঁচিশে তিন। অধ:পতনের শুরু আর কি! পরেরবার থেকেই পুজোর ছুটিটা বড্ডো লম্বা মনে হতে লাগলো।

বেসিক্যালি, রোজ ক্যাম্পাসে গিয়ে আশীর্বাদে এক ভাঁড় চা না খেলে কিরম যেন লাগতো একটা। বাড়িতে কে আর আধঘন্টা পরপর চায়ের যোগান দেবে :(সেই দু:খ কাটাতে বেরিয়ে

পড়তাম। ডিজিক্যাম কিনেছিলাম একটা। সঙ্গেই থাকত, বেরত কম। পুজোর ছুটির কটা দিন সাইকেলে করে বেশ কয়েকটা গ্রামে গেছিলাম সেবার। নদীর এপারে বাঁশি, ওপারে আড়বাঁশি। এই কম্বোটা গোলা লেগেছিলো। কিন্তু পুজোর সিগনিফিক্যান্সটা মরে গেছলো সেবার থেকেই। সন্ধ্যেবেলায় একবার পাড়ার পুজোয় যেতাম, কিন্তু থাকতে ইচ্ছে করতো না। হাঁফিয়ে উঠতাম। তো, তখন টিভিতে কি সব যেন হতো, পুজোর সেরা সুন্দরী না কি বেশ নাম ছিলো সেটার। একদিন খুব দু:খু দু:খু মন নিয়ে (মানে যেরম হলে রাবড়ি খেতে ইচ্ছে করে আর কি!) টিভির রিমোটটা নিয়ে একবার মৌলিক সংখ্যার (পাঠক, লক্ষ্য করুন, প্রাইম নম্বর নয় কিন্তু, এ থেকে বোঝা যায় কবি বাংলা বয়েজ স্কুলের) নম্বরওলা চ্যানেলগুলো দেখছি, একবার যৌগিক, হঠাৎ দেখি কোন একটা চ্যানেলে ঐ প্রোগ্রামটা হচ্ছে। কি কান্ড! কম্প্যারাটিভ লিটারেচারের (পাক্কা যদুবংশীয়রা বলে "কম্প্ লিট') সেই খুকি! উরিত্তারা!

এইখানে একটা ফ্ল্যাশব্যাক লাগবে। ফার্স্ট ইয়ারে একবার কম্প্লিটের ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসে গেছি কি নিয়ে বেশ একটা ক্যাম্পেন করতে (খুব সিরিয়াস কিছু একটা হবে, তা নয়তো আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আর্টসে যেতাম না)। তার আগে সিনিয়ার ক্লাসগুলো কভার করে ফেলেছি, ভালো রেসপন্স। পোচুর কনফি নিয়ে ঐ ক্লাসটায় ঢুকে বলতে শুরু করলাম, কিছুক্ষণ পরে দেখি সেকেন্ড না থার্ড বেঞ্চে বসে দুটো মেয়ে খুব মন দিয়ে নেলপালিশ লাগাচ্ছে! বলতে নেই, দুজনেই বেশ ইসে টাইপের সুন্দরী। সব কিছু ঘেঁটে গ্যালো। আমি আর ক্যাম্পেন চালাতে পারি নি, হৃদয়ে পোচুর চোট খেয়েছিলাম। ও, আরেকটা কেস আছে, আর্টসে যাতায়াত হওয়ার আগে আমার ধারণা ছিলো কেবলমাত্র জন্তুদের লেজ থাকে, বা কেউ কেউ কলেজে ঢুকলে তাদের লেজ গজায়, কিন্তু গোটা ইংরেজি ডিপার্টমেন্টটারই যে একটা লেজ থাকতে পারে, সেটা যেদিন জানলাম, সেদিন ছোটোবেলার বিশ্বাস ভেঙ্গে যাওয়ায় খুব দু:খ পেয়েছিলাম, কিন্তু অবাক হই নি। তার আগেই

জেনে গেছিলাম ছোটোবেলায় আমরা যা যা শিখি, তার অনেকটাই অতিসরলীকৃত, ফলে ভুল। যেমন ছোটোবেলায় জানতাম আলো সোজা যায়, পরে জানলাম সেটা ঠিক না। এইরকম আর কি। যাই হোক, সেই "ইংলিশের লেজ'-এ একদিন বসেছিলাম, বিশ্বাস করুন, এমনিই; সেই খুকিটি এসে সিগারেট চেয়েছিলেন, এবং হায়! আমার প্রেমিকার কাছ থেকে সিগারেটের কাউন্টার নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। সিগারেট না খাওয়ার জন্য এর চেয়ে বেশী অনুতাপ আর কক্ষণো হয়নি, গুরুচন্ডা৯র দিব্যি!

যাই হোক, এসব মনে পড়লেই সর্বিট্রেট লাগে। ওসব থাক। তাচ্চেয়ে পুজোর সেরা সুন্দরীর কথা বলি। সেই দেখতে শুরু কল্লাম। সেই খুকি কি ছড়ু কি ছড়ু! কি কি সব করেছিলেন মনে নেই, তবে হুল্লাট ছড়িয়ে সেই দিনই ইম্প্রেশনের গুষ্টি উদ্ধার করে দিয়েছিলেন এটুকু মনে পড়ে। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই ঐ প্রোগ্রামটা দেখি, আর মা ষষ্ঠীর কৃপায় ভালো খোরাকও জোটে। পুজোটা এইসব করেই কেটে যায় আর কি। এর ওপর আছে শারদীয়াগুলো। দহন পড়ে ঝিনুকের প্রেমে পড়ে গেছলাম। কিন্তু সে বেশীদিন টেকেনি। গপ্পের বইয়ের কথায় মনে পড়লো, আমি সমরেশবাবুর সাতকাহন পড়েছিলাম কোনো এক পুজোর ছুটিতে। সেই হ্যালু অনেকদিন ছিলো। তার আগেই উত্তরাধিকার-কালবেলা-কালপুরুষ আর গর্ভধারিনী পড়ে ফেলেছি। ফলে একাধারে নারীবাদী আর নকশাল হয়ে উঠছিলাম। (ভাগ্যিস গৌতমবাবু বাকিগুলো নিয়ে সিনেমা বানান নি!) কিন্তু আমার কালবেলা সিনেমাটা নিয়ে আবার একটা কথা মনে পড়ে গ্যালো। উফ্! কি মুস্কিল বলুন তো! লিখতে হবে পুজো নিয়ে, আর খালি অফসাইডে চলে যাচ্ছি! ঠিকাছে, এটাই শেষ। সত্যি বলছি। কালবেলা বেরোনোর পর মার্কেটে খুব উৎসাহ। সত্যি বলতে কি, এই মরা সময়েও বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি করতে যারা আসে, তাদের বেশীরভাগেরই মোটিভেশনের একটা বড়ো জায়গা জুড়ে থাকে সমরেশ মজুমদারের ঐ ট্রিলজি। তো, সিনেমাটা দেখতে যাওয়া হবে দলবেঁধে, নন্দন, ফার্স্ট ডে, সেকেন্ড শো। হলে শুধু

"আমরা' আর "ওরা'। সিনেমাটা এগোতে দেখা গ্যালো আমাদের মনোমত না ব্যাপারটা, স্টোরিলাইনের সাথে গল্পের মিল কোথায় সেটা ক্যুইজের পোশ্নো হতে পারে। "আমরা' উশখুস করছি, কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারছি না। শেষপর্যন্ত আর সহ্য করা গ্যালো না। "আমাদের' এক অত্যুৎসাহী কমরেড আর না থাকতে পেরে চেঁচিয়ে উঠলেন "নন্দীগ্রাম জিন্দাবাদ'! তাপ্পর প্রায় জনা পঁচিশেক মিলে লাইন দিয়ে বেরিয়ে এলাম হল থেকে!

এবার অন্য একটা এপিসোড। বেড়াতে যাওয়ার। বাকি গল্প পরে কখনো হবে, একটা ট্রেলার দিয়ে রাখি। আমাদের এক বন্ধুর দাদা ছুটি পড়লেই বেড়াতে যায়, আর বেরোনোর দিন যাদবপুর স্টেশন থেকে খানকতক পানু বই স্টক করে নেয়। প্রত্যেকবার। তার প্রতিদিন খুব ভোরে ওঠার ওভ্যেস। বেড়াতে গিয়েও সেটা ছাড়ে না। ভোরে উঠে চান-টান করে ব্রাহ্মমুহূর্তে এক গেলাস মদ নিয়ে বসে। তারপর, "উদাত্তকণ্ঠে', পানুগুলো "পাঠ করে'। তো, তার কাছ থেকে শোনা একটা পানুর স্টোরিলাইন শোনাই। এক যুবক,বিয়ের পর, ফুলশয্যার রাতে তার বৌয়ের সাথে নিজের পুরনো অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিচ্ছে। এই জাতীয় গল্পগুলোয় সাধারণত যা হয়, পরিবারের বিভিন্ন লোকেদের মধ্যে পার্মুটেশন-কম্বিনেশন করে নানা সম্পর্ক তৈরি হয়। তো, সেই গল্পটায় আমাদের নায়ক তাঁর স্ত্রীকে শোনান কিভাবে তার মাসি তাকে বিভিন্নকিছু শিখিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। সব শুনে, সেই সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী বলেন "এসব শুনে তোমার মাসির ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গ্যালো!' সেই গল্পেই, এই মাসির কথা যখন অন্য কোনো এক কম্বিনেশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের নায়কের বাবা জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন "যাক! আমার শালী অ্যাতোদিনে একটা কাজের কাজ করলো'! বললে হবে, এসব গপ্পো লিখতে খচ্চা আছে :) যাবতীয় বুর্জোয়া মূল্যবোধকে তছনছ করে প্রবল পরাক্রান্ত বিপ্লবীয়ানার এমন এক মূর্ত রূপ শেষ পাওয়া গেছলো চারুবাবুর দলিলগুলোতে।

পুজোর ছুটি পড়ার ঠিক আগে আরেকটা জিনিস হতো,

ইনএভিটেবলি। পড়াতে যাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যেতো। রোজই ভাবতাম, আজ যদি টাকাটা দিয়ে দেয়, তালে কালীপুজোর আগে আর আসছি না। এই করতে করতে পঞ্চমী পেরিয়ে যেতো। কখনো হাতে খাম নিয়ে, আবার কখনো বা খাম না পেয়ে ফিরে আসতাম। সেই পড়ানোর কথাই যখন উঠলো, একজনের কথা বলি। ছেলেটি ক্লাস ইলেভেন তখন। আসলে সেই বছরই এইচএস দেওয়ার কথা ছিলো, কিন্তু প্রিপারেশন ভালো হয় নি বলে ড্রপ দিয়েছে। ভালো কথা। ফিজিক্স পড়াতে গেছি। প্রথম এনকাউন্টারটাই সুপারহিট। ম্যায় হুঁ না-তে শারুখের এন্টিরি সীনের মতন। আমি জিগ্যেস করলাম, "কতদূর ওব্দি পড়া আছে, মানে, কোত্থেকে শুরু করবো?' সে বলে, "দাদা, আমি তো এইট থেকে কিছুই পড়িনি, তুমি ওখান থেকেই শুরু করতে পারো'! ব্যোমকে গেলাম পুউরো! আগে থেকে শোনা ছিলো যে ছেলেটা এইরকমই, তা নয়তো ভাবতাম খুব ঝাঁ* বুঝি! যাই হোক, প্রাথমিক ধাক্কা সামলে শুরু করলাম পড়াতে, প্রথম চ্যাপ্টার, বেগ-দ্রুতি এইসব। খুব এন্তু নিয়ে বোঝাচ্ছি, অ্যারিস্টটলের মডেল আর নিউটনের মডেলের পার্থক্য, রেফারেন্স ফ্রেম ব্যাপারটা কি এইসব হাবিজাবি। প্রায় ঘন্টাখানেক বোঝালাম, ছেলেটিও খুব উৎসাহ নিয়ে বুঝলো। তারপর অঙ্ক করতে দিলাম, সি আর ডি জি-র। প্রথম অঙ্ক, "একটি বস্তু পাঁচ মিনিটে একশো মিটার যায়, বস্তুটির গতিবেগ কতো?' বোঝালাম কি করে করতে হবে, তাপ্পর ছেলেটি নিজে করতে শুরু করলো। লিখলো খাতায়

"বস্তুটি ৫ মিনিটে যায় ১০০ মিটার

১ " " ....

বসে আছে। আমি বল্লাম, "কি, এক মিনিটে বেশিদূর যাবে, না কম যাবে? কম যাবে, তাই তো?' সে বল্লো, "ও, কম যাবে?' বলে উত্তর লিখলো ১০০-৫= ৯৫ মিটার। নিজের অ-পদার্থতায় খুব লজ্জা পেয়ে আমি আবার শুরু থেকে সব বোঝালাম, ঐকিক নিয়ম শুদ্ধু। সে প্রথম অঙ্কটা ঠিকঠাক করেও ফেল্লো। পরের অঙ্ক। "একটি বস্তু চার মিনিটে আশি মিটার যায়, বস্তুটির

গতিবেগ কতো?' আবার সাহায্য করলাম, বললাম "এটা তো আগেরটার মতনই'। সে উত্তর বের করলো ১০০/৫= ২০ মিটার/মিনিট! বিশ্বাস করুন, একটুও বাড়িয়ে বলছি না! এই ছেলেটিকে আমি শেষপর্যন্ত পড়িয়েও ছিলাম। মাঝে মাঝেই তাকে পড়িয়ে বের হতাম যখন, প্রবল ইচ্ছে করতো দেওয়ালে নিজের মাথাটা ঠুকতে। কিরকম পাগল পাগল অবস্থায় হোস্টেলে ফিরতাম :(

আপনাদের পাড়ায় পুজোয় খাওয়া-দাওয়ার কোনো ফান্ডা আছে? হুঁ হুঁ, আমাদের আছে! দ্বাদশীর দিন। খিচুড়ি, আলুরদম, চাটনি, মিষ্টি। একদম বাংলা খাবার। পুজোমন্ডপের মধ্যেই লাইন দিয়ে বসে খাওয়া। কিন্তু, নিয়মটা হলো, ওখানে খেতে গেলে হয় খালি পায়ে যেতে হয়, কিম্বা, পুরনো চটি পরে। সত্যি কথা বলতে কি, কি পরে যাবেন, সেটা নিয়ে কড়াকড়ি নেই, কি পরে ফিরবেন, সেটা নিয়ে আছে :) আপনি নতুন চটি পরে যেতেই পারেন, কিন্তু ফিরবেন খালি পায়ে, বা পুরনো চটি পরে। পুজোমন্ডপে খাওয়ার ব্যবস্থা হয় বলে চটি খুলে উঠতে হয়, আর ওখানেই সেই ম্যাজিকটা হয়ে যায়! খুব ট্র্যাজিক একটা ঘটনা বলি, কোন বছরের মনে নেই। আমরা তখন নিজেরাই নিজেদের বেশ কেউকেটা ভাবতে শুরু করেছি, খুব কনফি, আমাদের জুতো আবার কে নেবে! তবুও একটু লুকিয়েই রেখেছিলাম নতুন কেনা চামড়ার পাদুকা। খাওয়ার পর একটা পাঁচিলে বসে বসে আড্ডা মারছি, দেখছি খেয়ে ফিরছে যারা, তাদের অনেকেই জুতোসংক্রান্ত নিয়মটা অনেকেই জানে না। মজাসে লোকজনকে আওয়াজ দিচ্ছি। কেউ কেউ দেখছি নিজের পায়ের থেকে দু-ইঞ্চি ছোটো চটি পরে ফিরছেন। দেখে খুব মস্তি নিচ্ছি আমরা। এবং বাড়ি ফেরার সময় দেখলাম,যা হওয়ার ছিলো, তাই! আমার জুতো ভ্যানিশ! হেব্বি খচে গিয়ে খুঁজতে শুরু করলাম আমার পায়ের মাপে ভালো কোনটা আছে। আমাদের মধ্যে একজন পছন্দ করে দিলো একটা,একদম নতুন; বল্লো, তার দাদা সেবার ঐরকমই একটা কিনেছে, পরে খুব আরাম ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তো

সেটা পরেই ফিরলাম। বিকেলে খেলতে বেরোলাম, জানলাম, আমি যেটা পরে ফিরেছি, সেটা ওর দাদারই, মানে, ওর দাদারও দুর্গামন্ডপ থেকেই জুতো হারিয়েছে :(সেই জুতো ফেরৎ দিয়ে, খালি পায়ে ফিরে এলাম।

পুজোসংখ্যাগুলোর কথায় ফিরে আসি। (এপ্রসঙ্গ-ওপ্রসঙ্গ লাফিয়ে বেড়াচ্ছি বলে তাল রাখতে পারছেন না? পাঠক, ধিক আপনাকে!) ছোটোবেলায় পুজো শুরু হতো হাপিয়ার্লি শেষ হলে। তার আগে কিচ্ছুটি না। শেষ পরীক্ষার দিন বাড়ি ফিরে দেখতাম টেবিলের ওপর আনন্দমেলা, শুকতারা বা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান নামানো আছে। আমার মর্ণিং স্কুল ছিলো সিক্স অবধি, তাই দিদিদের থেকে আগেই আমার পরীক্ষা শেষ হতো সাধারণত, আমি শেষ না করে ছাড়তাম না বইগুলো। তাই নিয়ে দিদিদের সাথে যে সব বড়ো বড়ো যুদ্ধ হয়ে গেছে, সেসব ইতিহাসের সিলেবাসে থাকলে আপনাদের আর মাধ্যমিক পেরিয়ে করে খেতে হতো না, এখনো ক্লাস এইটের লাস্ট বেঞ্চেই থেকে পোস্ট বানানে একটা টি হবে না দুটো তা নিয়ে টেনিদার সাথে তর্কাতর্কি কত্তেন! শুকতারার একটা বড়ো আকর্ষন ছিলো বাবু-রাজা-মিউরা। আর আনন্দমেলায় একদিকে বাবলু, অন্যদিকে সন্তু। ওরা যেখানেই যেতো, সেখানেই কিছু না কিছু হতো! আমি কোথাও গেলেই কিছু হয় না! এমন কি, আমার কতদিনের শখ ছিলো বৈদিক ভিলেজের মতো জায়গাগুলোয় ফ্যাতাড়ুবৃত্তি করে আসার, সেও আমাকে না নিয়েই করে দিলো! এপ্পর কোনোদিন দেখবো সাউথ সিটিতেও কিছু একটা করে ফেলবে আমাকে না নিয়েই :(

(এইখানে একটাবিধিসম্মত সতর্কীকরণ আছে, এই লেখাটা স্রেফ ভ্যাড়ভেড়িয়ে লেখা পাচ্ছে বলে লিখেছি, কোনো কোনো জায়গায় আপনার আপত্তি থাকতে পারে, পলিটিক্যাল কারেক্টনেসের অভাব তো আছেই! কিন্তু আপনার বক্তব্য আমি শুনতে পাবো না, কারণ, এই লেখাটা যখন বেরোবে (যদি আদৌ বেরোয়) তখন আমি বাড়িতে বসে সিনেমা দেখছি,(হীরের আংটি সিনেমাটা ডাউনলোডালাম সেজন্যই, সেই কত্তোদিন আগে ডিডি

সেভেনের (ডিডি মানে দূরদর্শন, কোনো কিচাইন কর্বেন না) ছুটি ছুটিতে দেখেছিলাম)

এবার শেষ করি। পাই দিদি বলেছিলো ছোট্টো করে লিখতে, শেষ না করলে কেলিয়েই দেবে। গতবছর মহালয়ায় ক্লাস হয়েছিলো রাত দশটা ওব্দি, পরীক্ষা চলেছিলো ষষ্ঠী ওব্দি। এবার সিচুয়েশন অনেক ভালো। মহালয়ার পরেই ছুটি পড়ে গেছে ধরা যায়। ছুটি না, ডিপি হলিডেজ। কাশফুল ফুটেছে, এমনকি, এই পোড়া ক্যাম্পাসেও। প্যান্ডেল হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। খবরের কাগজে থিমের খবর, কম্পিটিশনে নাম লেখানোর তাগাদা। কিন্তু পুজো নেই। হারিয়ে গেছে। কোথায় গেছে আমি অন্তত জানি না। পুজোটাকে আবার পেলেও খুব খুশী হতাম কি? জানি না। পুজোটা যদি হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যায় সুন্দরবনে, লালগড়ে, সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে, খেজুরিতে, এনায়েৎপুরে, গোর্খাল্যান্ডে, মঙ্গলকোটে, নতুন জুতোয় ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে বলে একটু দাঁড়িয়ে যায় ওখানে, সেটাই বোধয় ভালো।

ঢাকের দিনে ঢুকুঢুকু

ঋতেন মিত্র

পুজোর গন্ধ, নাকে ভক করে লাগত, এক রক্তচক্ষু জ্যাঠার আগমন বার্তা হয়ে। হাতের ভাঁড়ে কষা মাংস। তখন হ্যান্ড ক্রিকেট বয়স , তাই মা-মা-মা (মা মাটি মানুষ নহে) র মা একটা- এই ধারনাই ছিল। এসোশিয়েসন সূত্রে শিশুমন গন্ধটিকে আমুল ভ্যানিলার সঙ্গে মনবাক্সের একটা কুঠুরিতে রেখে দিয়েই নিশ্চিন্ত । পরে সপ্তমীর দিন বাড়ির বহুদিনের কাজের লোক রামকাকা সাট্টার বার্ষিক অধিবেশন থেকে ফিরে রান্নাঘরে খুব ডাইলিউট প্রেপারেশান বানিয়ে রাখতেন। খেতাম । এরও পরে ১১, ১২ জমানায় ট্যাক্সি করে ম্যাডক্স যাত্রাকালে হাতে হাতে কোকের বোতল ধরিয়ে দেয়া হল,কিন্ত বোতলের ভেতর ভূতটি খুব চেনা। তখন নেশার মাঠে অন্য টিম ও রমরমিয়ে নামছে, মনবাক্সর খাপখোপ ঘেটে ঘুটে গুবলেট,চিনচিনে ব্যথা মস্তির সদর রাস্তা খুড়ে চলে গেছে যতদূর "লাল ফিতে সাদা মোজা' দের দেখা যায় । তখন উনি জাঁকিয়ে বসলেন আরো।

তার আগে প্রপার মজলিশ বলতে একটাই। যখন নর্থবেঙ্গল বেড়াতে গেলাম বাবা ও তার বন্ধুদের সাথে। শিলিগুড়িতে আমাদের থাকার জায়গা সোমেনদার শ্বশুরবাড়ী। বাবার বাল্যবন্ধু বিনয়দার জড়ানো গলায় ঘোষণা, "আজ ডুমস ডে ,আজ বিনয় দাই আউট।' বাড়ি ঢোকার মুখে হঠাৎ সোমেনদা অ্যাবাউট টার্ন নিয়ে ফিশফিশ করে বললেন, "এখন, এখন সবাই স্টেডি।' ৫০- উর্ধ্ব বাবা ও তার বন্ধুরদল টিন-এজ গিল্ট আক্রান্ত ভাব এনে সন্তর্পনে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছেন, টিন-এজারটি মহা আনন্দে টিমটির সামনে সামনে। উদ্দেশ্য কোনরকমে বারান্দা

পেরিয়ে দোতলায় চলে যাওয়া। সে হল নি। বাড়িতে তখন জ্যেঠি কাকি বউদি একটা ঘরে রবি ঠাকুরের গানের আসর নামিয়েছেন, বাবারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ঢুকে পড়লো। প্রথমে শ্রোতা হয়ে, তারপর সারা রাত ধরে সকলে মিলে গান- অবাক হয়ে বাবাকে প্রথম গাইতে দেখলাম আর কখন যে বিনয়দার মুখ থেকে রুমাল (গন্ধ প্রতিরোধকারী) সরে গেল, খেয়াল করিনি।

কলেজে পড়তে পুজোর দিনে হোস্টেলের ছাদে। বা দোতলার সেই বিখ্যাত টেরাসটাতে। দুদিকে খোলামালা ইস্ট উইং ,ওয়েস্ট উইং আর মাঝের টিভি লাউঞ্জ থেকে টেরাস পেট বার করে সামনের পুকুর পাড়ে ছায়া দিত খানিকটা। তালগাছ। ফুরফুরে হাওয়া। ওলিপাব, ম্যাগস, ছোঃ। এরকম অ্যাম্বি থাকতে বিকল্প অবস্থান ভাবা যায় ? জমিদারদের বাগানবাড়ি ছিল , আমাদের ছিল হোস্টেলটি । এধার ওধার থেকে ধার করে কোনরকমে দু একটা ওল্ড মঙ্ক এর খাম্বা দাঁড় হত বা তিন চার পাইট। সোর্স উল্টোদিকের ভাটি, সেখানেও অহেতুক রোমাঞ্চ জোগাতেন মালিক। খুব রহস্য করে চাপা গলায় প্রশ্ন আসত "কি চাই' । (মুখে রুমাল থাকলেও আশ্চর্য হতাম না) তারপর চোখের ইশারায় একটা কর্মচারীকে বলা হত, সে স্যাট করে হাতে ধরিয়ে দিত।) রাত্তিরবেলা ভাটি বন্ধ থাকলে বি টি রোডের নিঃশব্দ রাস্তা (হু হা ট্রাকের শব্দ বাদে) ধরে রিকশা করে দক্ষিণেশ্বর । একটাই ঠেক খোলা থাকত। টিম টিম আলো। তারপর দারোয়ান আর প্রফ কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়, নিপ হলে শার্ট এর পেটের বোতাম খুলে গুঁজে দেওয়া, তারপর শার্ট থেকে বের করে টেরাসে অপেক্ষারত সিনিয়রদের সামনে থপ করে রাখা। আর সর্বান্তে দাঁত কেলিয়ে সগর্ব ঘোষণা , "এনেছি'।

বিদেশ থেকে সিনিয়ররা এলে দামি হুইস্কি বা ওয়াইন চাখা হত। আর গোয়া ট্যুরের বছরে ছিল ফেনি। মন্দার বাজারে (মেস বিল ডিউ, উদার দাদাদের স্টাইপেন্ড কাট, ইত্যাদি) "পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক... ' স্ট্যাম্প মারা সাদা বোতলই ছিল ভরসা।

থার্ড ইয়ারে থেকে আমার কেমন করে একটা নতুন নাম হল। "সভাপতি'। তবে তখন থেকে মাল-পার্টিগুলোকে একটা স্ট্রাকচার দেওয়ার চেষ্টা করতাম। প্রথমে একটা উদ্বোধনী স্পিচ । তারপর এনাউন্সমেন্ট হত আধঘণ্টা অন্তর। "এবারে পানু পাঠ করে শোনাবেন' এই রকম আর কি। বাইরে সিকিউরিটি বসার পর আমার রুমে ভেন্যু শিফট হল, সিগগি ফেলার জন্য আলাদা ট্রাশের দরকার হত না, কারন গোটা রুমটাই ছিল মোটামুটি তাই। আর ছিল আমার একখান স্পেশাল লাল ব্যাগ । কাঁধে ঝোলানো। এই ব্যাগটা করে নোংরা জামা কাপড় নিয়ে শনিবার বাড়ি ফিরতাম আর বাড়ি থেকে কাচা জামা নিয়ে আসতাম। ঐ ব্যাগ নিয়েই বেরোতাম মাল কিনতে। ঐ ব্যাগটাও কেমন করে জানি লেজেণ্ড, একরকমের প্রতীক হয়ে গেল। ঐ লাল দেখলেই মাল পাড়ায় উত্তেজনার সঞ্চার। দিগ্বিদিকে খুশির ছোয়া। "আজকে হচ্ছে নাকি, আমাদের তো আজকাল ডাকিস না' । একটা বিশ্বস্ত অ্যাসিস্টান্ট ছিল, যার অ্যাসাইন্ড জব ছিল সোডা ও চাট জোগাড় করে রাখা । রাত্তিরের সঙ্গে, সভাসদদের গানের গলাও তুঙ্গে উঠত। কখনো কখনো পেছনের বস্তি থেকে বৌদিদের চিল আর্তনাদ ভেসে আসত "রাত দুটোয় কিশোর কুমার হয়েছে সব...****' । স্বাভাবিক রিএকশান। ঐ ডেসিবেলে। একদিন ইঁট ছোঁড়া শুরু হল। লাইট নিবিয়ে টিবিয়ে আমরা ডাক করে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর অন্যরুম। অন্যপ্রান্তে । আবার জানলা বেয়ে ইঁট। শেষ আশ্রয় টিভি ঘরে।

বাবার সঙ্গে একটা কোডেড কমিউনিকেশান চালু ছিল। "সামনে পরীক্ষা আসছে, এই পুজোর কদিন শরীরের একটু যত্ন নিস, ধকল নিস না' । সেমি আউট বিধ্বস্ত অবস্থাই বাড়ি ফিরলে বলা হত " প্রচুর ধকল গেল এই সপ্তাহে তাই না, পরের সপ্তাহে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসিস' ।

মালপার্টির চরিত্রদের নিয়ে বলতে গেলে হামেশাই যাদের ভুলে যাওয়া হয়, তাদেরকেও একটু স্মৃতিতে আনা যাক- সেই নিরাসক্ত পাব্লিক,একাধারে ব্যাকস্টেজ ও দর্শক, যাবতীয় কান্ডকারখানা

দেখতে কোক নিয়ে বসে থাকতো আর কনসিস্টেন্টলি নিরলস ভাবে এক এক করে জনতা কে ঘরে পৌঁছে দিতো। কারণ রুম তো ভুল হত আকছার। (রিসার্চ স্কলার মামু যেমন ঠিক গুটি গুটি পায়ে একতলার "১৭' নম্বর রুমে গিয়ে খাটে সটান গা এলিয়ে দিলেন, যেমন ৫ বছর ধরে করে এসেছেন, শুধু "১৭' কেন এখন কোন রুমই আর মামুর নয়, এটি বেমালুম ভুলে মেরে।)

কবিতার মতই প্রতিটা মাল পার্টির একটা নিজস্ব রিদম থাকত। বা বলা যায় প্রত্যেক মাল গ্রুপের। বন্ধুদের অন্য কলেজের বন্ধুরা এলে যেটা টের পাওয়া যেত। এমনকি একই হোস্টেলেই দুটো এক্সট্রিম। ফার্স্ট-সেকেন্ড ইয়ারে মুখ্য খেলোয়াড়রা বলত কম। শম্বুক গতিতে সিগারেটের খোলে গাঁজা ঠুসতে ঠুসতে বড়জোর দুটো একটা কমেন্ট। আবার অনেকক্ষণ চুপ। ভালই লাগত। আবার পরের দিকে হুপ-হাপও, (এক ডেবুটেন্ট তো গোটা ছাদ ডিগবাজি খেয়ে হোস্টেল শুদ্ধু সবাইকে স্যালুট করতে করতে নির্বস্ত্র হলেন,আবার আর একজন মাল খেলেই চূড়ান্ত উল্লাসে প্রত্যেক কথার জবাব পিঠে অ্যায়সা চাপড় মেরে দিতেন, যে ব্যাগ নিয়ে বেরনোর সময় তাকে এনগেজ করে রাখা হত, যাতে দেখতে না পায়) মন্দ লাগত না। কান্নাকাটি, লাঠালাঠি, হঠাৎ প্রেমিকা দূরে চলে যাচ্ছে ঠাউরে রাত দুটোয় তাকে ফোন করে তুলে হাই পিচ বেদনার্তি শোনানো যা তাকে শ্যামবাজারের পি জি থেকে ট্যাক্সি করে নিয়ে আসে বরানগরে। আবার পড়া বোঝার জন্য আউট হওয়া বন্ধুকে ইন কি করে করতে হবে ভেবে না পেয়ে সরাসরি বন্ধুর বাবাকে ফোন করে "কাকু, বিকি আউট হয়ে গেছে, ওকে কি খাওয়াব বলুন তো'। কাকু আবার ওদিক থেকে স্টেপ বাই স্টেপ ইন্সট্রাকশান দিলেন। হ্যাঁ, কনফিউশান ছিল। অভিমানও ছিল পোচ্চুর। সভাপতি হয়ে যাদেরকে ডাকতে ভুলে যেতাম। লালব্যাগ নিয়ে ডানলপে দেখা হ'লে একটা ম্লান হাসি ঠেকাত শুধু। অথচ ব্রাত্য ছিল না কেউই।

একবার দশমীর দিন ফেরার কথা। কিন্তু সকাল থেকে ঘুম। স্বপ্ন কি ছিল মনে নেই, তবে একটা মেগাস্কেল বিস্ফোরণ ছিল

শেষে। ঘুম থেকে উঠে বুঝলাম দরজা ধাক্কাচ্ছে। খুলে দেখি বাবা। সকালবেলা পিসিদের আসার কথা, বাড়িতে, আমারো। হোস্টেল ভর্তি মাতাল বমি ও বোতল, এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে । চাটুদা (যার আবার শুনেছিলাম সেদিনই নাকি শ্বশুরমশায় এসেছিলেন) "কি রে ঠিক আছিস' বলে স্খলিত চরণে রুমে ঢুকে একটা স্বর্গীয় হাসি ছেড়েই ছুটে বাথরুমে।

বাবা ট্যাক্সি করে যেতে আস্তে আস্তে বললেন, "জানি খুব ধকল গেল কালকে।'

আমিঃ "হ্যাঁ এই,সারারাত ঘোরা'।

পুজোর সময় হোস্টেল দিনগুলিতে এরমই পাকস্থলী বেয়ে সন্ধ্যে নামত। আর ব্রেনের বিশেষ বিশেষ জায়গায় জমাট করে ছায়া ঘনাত। ডিসকন্টিনুয়াস এবড়ো খেবড়ো কার্ভের মাঝে একটা স্মুথ ইনফ্লেকশান পয়েন্ট। দিনটাকে কুচি কুচি করে কেটে কাঁটা চামচ সহকারে খেয়ে নিতাম সকলে, আর তার অশ্লীল ঢেঁকুর ধ্বনি সারা রাত। সাইন্যাপটিক জাংশানে ট্রাফিক জ্যামের মন্থরতা, আর নিউরনগুলোর চাইমসের মত টুং টাং টুং টাং।

এভাবেই নিজেদের ভেতরেই জগৎ তৈরি হত।

ভাগ হত।

সেই সময় মনে হত আজীবন কার্নিভাল ।

দু-প্যান্ডেলের মাঝখানটায়

সোমনাথ রায়

দুটো পুজোর মাঝখানে এক অনিবার্য নির্জনতা থাকে। রাত্তিরে যেখানে এক প্যান্ডেলের আলো শেষ হয় আর, আরেকটার আলোর রেশ বেশ খানিকটা দূর থেকে দ্যাখা যাচ্ছে, পাড়ার সেই অংশটায় স্বাভাবিকভাবেই অন্ধকার জমাট বেঁধে ওঠে, সেখানকার দোকানগুলোয় অষ্টমীর সন্ধ্যেতেও একটাকা চারআনায় চার্মিনার পাওয়া যায়, টিমটিম করে হলদে বাল্ব জ্বলে, বুড়ো দোকানদারের সঙ্গে ভাবলেশহীনমুখে দু চারজন রাজ্যের ভবিষ্যত নিয়ে ব্যাজার আড্ডা মারে। রাস্তার পাশে কোনও একটা বাড়ি থেকে চলতি মেগা সিরিয়ালের গান ভেসে আসে। এমনকি খুব নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ঐ বাড়ির ক্লাস সেভেনের কন্যাটি সেই সন্ধ্যেতেও গঙ্গানদীর উৎপত্তি বা ছোটনাগপুরে অ্যালুমিনিয়াম খনির নাম মুখস্থ করছে। আর এক পাড়া থেকে আরেক পাড়ার প্যান্ডেলে যাওয়ার মুখে পাব্লিক খুব দ্রুতপদে রাস্তার এই অংশটা পেরিয়ে যাচ্ছে। অথবা একটু আড়াল খুঁজে নিয়ে দেখবো একজন দুজন দেশলাই-এর পিছন দিয়ে সিগারেটের তামাক খুঁচিয়ে গাঁজার পাতা ভরছে, অথবা কোথাও চাপাস্বরে ঝগড়া চলছেঃ পুজোর মার্কেটে গ্রুপের অন্যকেউ যথাযোগ্য সম্মান না দেওয়ায় বছরের বাকি দিনগুলো কীভাবে তাকে দেখে নেওয়া হবে সেই সংক্রান্ত আস্ফালন। আবার ওরকম-ই একটা রাস্তায় সন্তু মিন্তি ও মিন্তির বোনের পিছন পিছন হাঁটছে; কিম্বা মিন্তির বোন নেই, সন্তু খুব ভয়দুরুদুরু বক্ষে অবশেষে বলেই ফেলছে- মিন্তি, তোর সঙ্গে একটা দরকারি কথা ছিলো। আধঘন্টা পরেই বাপী আর টুবলূ এই রাস্তা দিয়ে বলতে বলতে ফিরবে, সন্তুতো লুটে গ্যালো রে, মিন্তির নতুন শিকার জুটলো।

আবার, মফস্বল ছেড়ে শহর কলকাতায় ঢুকলে এইসব জায়গায় কোনও বেচারি হোমগার্ড-কে ডিউটি দিতে দেখবেন, যে চ্যাংড়াটা এক্ষুণি জিগেস করে গ্যালো মামা, জগুবাজারের অটো কোনখান থেকে পাবো? তার উদ্দেশ্যে দাঁতে দাঁত চেপে বলছে আমি তোর মায়ের ভাই হই এই গ্যারান্টী কোদ্দিয় পেলি শুয়ারকা। একথা সবাই জানে ঐ ভদ্রলোকের কাছে খৈনি আছে এবং অটো কোন রাস্তায় যায়, তা তিনি জানেন না। তবে অনুরূপা এবং তার গার্লস কলেজ দলটা ওনাকে দেখে বড়ো ভরসা পেয়েছে, এসব রাস্তায় পুজোর দিন হলেও কেমন গা ছমছম করে কিনা, স্পেশালি কয়েকটা হোস্টেল কাটিং ছেলে পদ্মপুকুরের লাইন থেকেই যে ভাবে অ্যাটেম্পট নিচ্ছিলো। আপাতত বোধিস্বত্ত্ব এইখান দিয়ে হনহনিয়ে, রাদার বলা ভালো দৌড়েই যাচ্ছে, ম্যাডক্সে লোকজন গোল হয়ে বসবে, অলরেডি একঘন্টা লেট, সুদীপ্তা কার সঙ্গে গপ্পো জুড়ে দিলো কে জানে, আর উলটো দিক থেকে তুমুল ঝগড়া করতে করতে সৌমিতা-রাণা হেঁটে আসছে; সৌমিতা হয় এই শেষ কথা বললাম বলে তুমুল চেঁচাচ্ছে (হোমগার্ড সাহেব বেশ আমোদ পাচ্ছেন এতে) অথবা জাস্ট কোনও কথাই বলছে না, রাণা-কে তো বলেই দিয়েছে, আমি আলাদা আর তুই আলাদা ঘুরছি, এর পর আর কথা বলারও কিছু নেই। আর প্রথম নাইট আউট করবে বলে অনির্বাণরা পথে বেড়িয়েছে, সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সন্দীপন অলরেডি দুপেগ মেরে দিয়েছে, বোতলটা দিব্যেন্দুর ব্যাগে, এখন কিছুতেই বের করা যাবেনা, ভোররাতের দিকে একটা পার্কমতন জায়গা দেখে উল্লাস করতে হবে কিনা! কিছু মামণি, যাদের দেখে এই পাড়ার-ই মনে হলো, ঝলমলে শাড়ী পরে হেঁটে যাচ্ছে, বিভাস বুঝে উঠতে পারলোনা এদের ডেডিকেট করে দু লাইন গান গাওয়া রিস্কি হয়ে যাবে কিনা! এসবের মধ্যে দেখবেন একটা প্রাইভেট কার বিশ্রী হর্ণ বাজিয়ে বেমক্কা জোরে বেরিয়ে গ্যালোঃ কাকু কাকিমা ভাই-বোনদের নিয়ে সারারাত ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছেন। জ্যাম এড়ানোর জন্যে ড্রাইভার এই রাস্তায় ঢুকলো এবং ওয়ান ওয়ে দেখে আবার

বেরিয়ে যাচ্ছে- কাকিমা চেঁচিয়ে গাড়ি দাঁড় করালেন, মিনারেল ওয়াটার কিনবেন। পুজোর দিনগুলোয় যেহেতু নিয়মিত বৃষ্টি হয়ে থাকে আর এইসব রাস্তা খানাখন্দে জলসঞ্চয় করতে অভ্যস্ত, এই সব স্যান্টো বা ইন্ডিকার থেকে একটু দূরে থাকাই ভালো; নইলে দশাটা হবে দেশপ্রিয় পার্কে ঢোকার সময়ে শর্মিষ্ঠার নীলচে চুড়িদারে কালচে কাদার ছোপ-ছোপ। আর কিছু আরবিট মাল আছে, যাদের পুজোর সময় ঘোরার লোকজন নেই, এদিকে বাড়ি বসে থাকা বা ভীড়ের প্যান্ডেলে ঢোকার ধকও নেই, তারা এইসব নির্জনতায় যশষংভশফ ঢ়বঁড়নরপ করতে থাকে, এদের সঙ্গে এই সময়ে পাড়ার পাগল-পাগলিদের আচরণগত মিল পাওয়া যায় যদিও পোষাকের ফারাক সহস্র যোজন। সুতরাং এইসব রাস্তাকে আমি আপনিও বিশেষ পাত্তা দিই না, মাছের কাঁটার মতো সযত্নে অতিক্রম করে যাচ্ছি।

যদি উত্তর কলকাতার দিকের এই ফোঁকরগুলোতে ঢুকে পড়ি, সেখানকার নির্জনতা আবার অন্যরকম, জীবিকার সন্ধানে ছায়ামূর্তি আর দেহাত থেকে আসা কূর্মাবতারের কাছে পুজোটুজোর সেরকম মানে নেই হয়তো। ফলে দুটো পুজোর মাঝখান বলে আপনি যেটাকে দেখবেন সেটা বছরের বাকি ৩৬০ দিন ঐরূপেই থাকে, পার্থক্যটা হলো সম্ভবতঃ ঐসব গলিপথে সেইদিনগুলোয় এই রাতদুপুরে আপনি হাঁটেন না। শুধু আজকের দিনটায় এক প্যান্ডেলে ফসিলস আর আরেক প্যান্ডেল থেকে স্বর্ণযুগের গান এই মাঝখানের খাঁজটায় এসে সাইকোডেলিকালি মিলে যাচ্ছে, তাই আমার-আপনার ও হঠাৎ প্রতিমা এবং জ্যান্ত দুর্গা দ্যাখার বাসনাগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে, নির্জনতাটা চেপে বসছে মাথার ভেতর, নেশার মতন, আর এই ঠাকুর দ্যাখার দল থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে গঙ্গার পারের দিকে হাঁটা লাগাতে ইচ্ছে করছে। যদিও আপনার সামনে উৎসবময়ী কলকাতা এই মুহূর্তে বাস্তবতার আদল নিয়ে নিয়েছে এই পুজোর মাঝখানের নির্জনতায় যে বাকি বছরটা কাটাতেই হবে, সেই ভেবে স্বস্তি বোধ করছেন না?

মাকোন্দোয় দুর্গাপূজা

ইন্দ্রনীল ঘোষদস্তিদার

দুগ্গাপূজা নিয়ে অত বলাবলির বা কি আছে, অত আনন্দেরই বা কি আছে।

শুধু ছোটবেলায় একবার লাল জামা কিনে দেওয়া হয় নি বলে গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁদেছিলাম। নালেঝোলে মেখে, মাটি চেটে , মেঝের শানে ঠাঁই ঠাঁই করে মাথা ঠুকে গুগলু বানিয়ে তবে ক্ষান্ত দিইছি। আর ক্যাপ ফোটানোর একটা ব্যাপার ছিল। ক্যাটকেটে কালো পিস্তলগুলো সব, নারকেল তেলের গন্ধমাখা। তায় আবার রোল ক্যাপগুলো কিছুতেই ফাটতে চাইত না। আর সেবার কে যেন একটা ঝিনচ্যাক রূপোলী পিস্তল কিনে দিল। দেবদূত-ফেবদূত কিছু একটা ভেবেছিলাম, লোকটাকে।

গুল মারলাম বোধ হয়। দেবদূত কি, তখন কি বুঝতাম কিছু? মরুকগে। কিন্তু লোকটার নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না। আমার বাবাও হতে পারে।

পিস্তল এলে যুদ্ধ তো আসবেই। মারণাস্ত্র বলে কথা। স্বয়ং দুগ্গা ঠাকুর যুদ্ধু কচ্ছেন। একবার বেপাড়ার কিছু বাচ্চার দলের সঙ্গে ভয়ানক মারপিট হল আমাদের। গুলি ফুরিয়ে গেলে ঘুষি-লাথি। কুং ফু স্টাইল। রক্ত মেখে , ঘেমে বাড়ি ফিরলাম। সব মিছিমিছি। কিছুদিন আগেই পদ্মা হলে "রিটার্ণ দ্য ড্রাগন' এসে ফিরে গেছে।

দাঁড়াও, আরো মনে করি। আর একবার পাড়ার ঠাকুরের ছবি আঁকতে বসেছিলাম কাগজ-পেন্সিল-বোর্ড-বোর্ড ক্লিপ নিয়ে। লাইন ড্রয়িং, শ্যালদা স্টেশনে করতে দেখেছি আঁকার কলেজের

সূচীপত্র

মেয়ে-ছেলেদের। সবাই গোল হয়ে ঘিরে দেখছে, বিজ্ঞ খোকা বলে এমনিতেই বহুত সম্ভ্রম করত। আমারো বেশ বেলুন-বেলুন ভাব,অল্প লজ্জা। ওদিকে দুগ্গার মুন্ডিটা শরীরের তুলনায় বড় হয়ে যাচ্ছে, কাত্তিকের মৌরের ন্যাজ কাগজ ছাড়িয়ে দু ইঞ্চি বেরিয়ে গেল। ভিড় দেখে পাড়ার জ্ঞানদা বুড়ো এসে স্নেহভরে জ্ঞান দিতে বসে গেল। ""কমার্শিয়াল আর্ট কাকে বলে জানো?'' কাগজ-পেন্সিল টেনে নিয়ে বুড়ো তিনটে আঁকিবুকি কেটে দিতে দিতে বলছে-"" এই যে কত কম লাইনে একটা হাঁস এঁকে দিলাম। এইরকম। কমার্শিয়াল আর্ট।''

এরকম কেলেঙ্কারি আর একটা মনে আছে, ছোটমাপের। ফি সন অষ্টমীতে যাদবপুর বিজয়গড় যেতাম বাড়িশুদ্ধ সবাই, মেজোপিসির বাড়ি; ওটা রিচ্যুয়াল ছিল। বিজয়গড়ে ভারতমাতার একটা পূজো হয়, জানো বোধহয়। পূজোটা নমো নমো করে, কিন্তু বিকেল হলেই বিরাট ফাংশন। আমি তো শিশুকাল থেকেই বিশাল পেছনপাকা, গম্ভীরভাবে বলেছিলাম-একদম শব্দ বাই শব্দ মনে আছে-"" লক্ষ্যটাকে উপলক্ষ্য যে কতদূর ছাড়িয়ে যেতে পারে !'' কেলাশ ফোর-ফাইভে পড়ি তখন। পিসতুতো দাদা-দিদিরা হেসে খুন। বাজে খোরাক হয়েছিলাম।

এছাড়া বাদবাকি সব গতের। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শিউলিফুল, সতীশ পালের ঠাকুর। আরেকটু বড় হলে লাল শালুতে মোড়া বইয়ের স্টল, তাতে "কমিউনিস্ট ইস্তেহার', "কি করিতে হইবে' , "রাষ্ট্র ও বিপ্লব'-এর পাশাপাশি " চলো সোভিয়েত দেশ বেড়িয়ে আসি',"ইস্পাত', "জয়া-শুরার কথা'। মাঝখানে ""মেঘে ঢাকা তারা''-র আগমনী গান ঢুকে পড়ে একটু ঘেঁটে দিল। ""আয় লো উমা কোলে লই''। মন খারাপের একটা ফ্যাক্টর চলে এল। সন্ধ্যেয় ছাতিম ফুল ফুটলে গা গুলোনো বিষাদ ছড়াত।

এসবই কমনপ্লেস। আমি খুব সুশীল আমজনতার মত নিয়ম মেনে দুগ্গাপূজা দেখি। বাবা-মা-বৌ নিয়ে কলকাতায় ঠাকুর দেখতে বেরো ই, এবার হয়তো ছেলেও যাবে। পাটের মন্ডপ, ছোলার

দড়ি, কুলো, হাত-পাখা, গাঁজার কল্কে, আয়নাভাঙ্গা-এসবের মন্ডপ দেখি। শালবনী, ময়ূরভঞ্জ, ঢেংকানল, গের্নিকার ঠাকুর। এশিয়ান পেন্টস এসে পূজোটাকে বদলে দিয়েছে। পূজোটা শীতকালে হলে ভালো হত।

গৎ চলছে, চলবে। আমি উত্তর কলকাতার ঘিঞ্জি সরু গলি দিয়ে বাগবাজার-আহিরীটোলার ঠাকুর দেখতে যাই; বিকাশ ভটচাজের ছবির বিষণ্ন বয়স্থা কুমারী মেয়েরা উত্তর কলকাতার বিষণ্ন ছাদে শুকনো কাপড় তুলতে যায় হয়তো, চিলেকোঠার ফোকড় দিয়ে রাস্তা দেখে নিশ্চয়ই। আমি তাদের দেখতে পাই না। জিনস-টিশার্ট পরা ঝলমলে মেয়েদের কপালে তিন নম্বর চোখ থাকে হয়তো মুদিয়ালি-শোভাবাজারে; আমি দেখি নি কখনো। একবার পূজোয় উল্টোদিকের ট্রেনে চেপে বসেছিলাম আমি আর সোনালী-ভোরবেলা। সোনালীর কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ, ও ফটোগ্রাফার। আমরা পছন্দসই কোনো একটা দূরের গেঁয়ো স্টেশনে নেমে পড়ব- সেখানে একটা না একটা রাজবাড়ী কিংবা জমিদারবাড়ি কি আর থাকবে না, যাদের উঁচু উঁচু সাদা সাদা থাম-খিলান আর কড়িবরগার নাটমন্দির-খুব ধূমধাম করে পারিবারিক দুর্গাপূজা হচ্ছে,পূজোর অ্যাডে যেমন দেখায়। সোনালী ছবি তুলবে। সন্ধিপূজার, কলাবৌ স্নান করানোর, সন্ধের আরতির, ধুনুচির আঁকাবাঁকা ধোঁয়ায় ব্লার্ড হয়ে যাওয়া প্রতিমার। ধুনুচিনাচিয়ের আঁকাবাঁকা শরীরের শিল্যুয়েট। হাসিমুখ অনাবাসী মানুষের চিকণ সাজগোজ, পাটভাঙা ধুতি-পাঞ্জাবি, গরদ-জামদানী। সিঁদুরখেলা। ঢাকীর তামাটে প্রোফাইল। ঢাকের বাহারী পালকের সাজ, টেলিতে।

গেলামও। গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর না কি যেন নাম, ভুলে গেছি। কিন্তু সেই নাটমন্দির আর খুঁজে পেলাম না।

আসলে আপাদমস্তক ঢপবাজি। আমরা কোনোদিনই ওরকম কোনো ভোরের ট্রেনে উঠে বসিনি। অথচ কতবার ভেবেছি, যাবো। যাবো ই। হয়তো খোঁজ নিলে দেখা যেত, ওরকম কোনো ভোরের

ট্রেনই ছাড়ে না, পূজোর কলকাতা শহর ছেড়ে। উল্টোদিকে।

গৎটা ফেটে গেল গতবার। এটা সত্যিকথা, ঢপ নয়। পূজোর সময় বার্নলে ছিলাম। পুরো শরৎকালটাই। আমরা কয়েকজন একটা ভাড়াবাড়িতে থাকতাম। আমরা ভারতের নানান জায়গা থেকে গিয়ে জুটেছি। আমাদের মেজাজ খুব খারাপ থাকত,একে অন্যের সঙ্গে তেড়ে ঝগড়া করতাম। আমাদের চাকরি হয় নি, পয়সা ফুরিয়ে আসছে হুড়মুড়িয়ে। ছাদ দিয়ে জল পড়ছে; কার্পেটে জমাট ময়লা। ব্যাঙ্গালোরের খচ্চর ছেলেটা ভোর হতে না হতেই তেড়েফুঁড়ে অসহ্য সব হিন্দি গান চালিয়ে দেয়।

রেগেমেগে আমি চাকরির দরখাস্তগুলি বগলে নিয়ে পোস্ট অফিসের দিকে হাঁটা দিই। পোস্ট অফিস দূরে, হেঁটে যেতে মিনিট কুড়ি লাগে। একটা জায়গায় সরু বনপথের মত আছে, দুপাশে অজস্র নাম-না-জানা ফুল। গুচ্ছ গুচ্ছ লাল-কালো-নীলচে বেরির মত ফল ধরে আছে। ঐ পথটা পেরোলে ঘাসফুলে ঢাকা একটা সবুজ মেডো। শালিখের মত দেখতে পাখিরা গলার শির ফুলিয়ে ঝগড়া করছে।

মেডোটা পুরো শেষ হওয়ার আগেই দেখতে পাই। লাল রংয়ের বাড়িটার পাশে মলিন সাদা অথবা ছাই ছাই রংয়ের অজস্র ফুল ফুটেছে। ঠিক কাশ নয়। কাশের মত।

""অরেলিয়ানো,''-কোনো এক অগাস্ট-বিকেলে টেলিগ্রাফের মাকোন্দো-প্রান্তে বসে বিষণ্ন কর্নেল গেরিনেল্ডো মার্কেজ মেসেজ পাঠাচ্ছিল-""মাকোন্দোয় এখন বৃষ্টি পড়ছে।''

আমরা সবাই যে যার নিজস্ব মাকোন্দো বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি আজীবন। যেখানে বারোমাস বৃষ্টি পড়ে। অথবা শিউলিফুল। কাশবন। সবুজ নালিঘাস।

মাকোন্দোর নিয়ম এইরকম।

ডিডির ডায়রি

দীপ্তেন

সপ্তমী

রাত বারোটা বেজে গ্যাছে,তবে এখন কি বলা যায় এটা অষ্টমীর সকাল ?

মোটকথা সপ্তমীর সন্ধ্যাও পার করে দিলাম। সারাদিন শুধু মেয়েদের সাজ গোজের ঝিন ঝিন আওয়াজ। আর ঠাকুর দেখতে যাওয়া।

রেষ্টুরেন্টে চ্যাংব্যাং খাওয়ানোর প্রলোভনে মত্ত পুরো ফেমিলি আর পাড়ার নানাবিধ অপগন্ড - এইসব নিয়ে বুঝি না বুঝি না করে দু পেগ হুইস্কি উড়িয়ে দিয়ে বাড়ীতে এসে শুদ্ধ চিত্তে তৃতীয় পেগ নিয়ে বসিচি।

কালকে মহাষ্টমী। ব্যাথা আছে। সকাল থেকে রাত পজ্জ্যোন্তো দৌড়।

এই আনন্দের বানভাসিতে আমি এক মুত্তিমান মার্জিনস্য মার্জিন। আমার ব্যাথা কে বোঝে ? কেউ বোঝে ?

অষ্টমী

যাক। অষ্টমীও কাটিয়ে দিলাম। সকাল থেকেই ঠাকুর দ্যাখার ধুম। আর সারাদিন সাজুগুজুর ঝনঝনা। কপাল গুনে এক প্যান্ডেলে খিচুড়ি ভোগ পেলাম এক ঘন্টা হাপিত্যেশ করে বসে থেকে বেলা তিনটের সময়ে লাস্ট ব্যাচে। সেলফোনে সেলফোনে বার্তা ছুটছে - খিচুড়ি সব প্যান্ডেলেই ফুরিয়ে গ্যাছে।

বিকেলে এট্টু বিশ্রাম করে আবার দৌড়। শংকরস্কোপ মানে সিনেমা,নাচ,পাপেট্রি মিলিয়ে একটা নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা দেখলাম। রাত এগারোটায় নিজামের ফ্র্যাঞ্চাইসির অসম্ভব বাজে রোল দিয়ে ডিনার। শেষ পাতে সামান্য রাম - এই বাড়ি এসে।

কাল দুপুরে একটা স-বিয়ার খ্যাঁট আছে - শুধু সন্ধ্যাবেলাটা কোনো প্যান্ডালে যেতে হবে। ব্যাস।

নবমী

পোহাইয়েছে! পোহাইয়েছে!! নবমীও পেরিয়ে এলাম। বাব্বাঃ। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো!!!!

কাল সকালের স-বিয়ার লাঞ্চ গড়াতে গড়াতে সেই সন্ধ্যে। তাও সন্ধ্যাবেলায় সাজুগুজু করে সপরিবারে সবান্ধবে আরো পোতিমা দর্শন। এগারোটায় বড় বড় হাই তুলে সবাই রণে ভঙ্গ দিলে আমি যৎপরোনাস্তি খুশি হলাম।

অন্ততঃ বছর খানেকের ছুটি। আর সেই কাশ ঘাস প্লাটিপাস, ঢাকীর নাচ,কলাগাছ,শিউলির ফুল বিউলির ডাল .... এদের হাত থেকে পরিত্রাণ।

আহা সৌদি আরব। পুজোর এ দিন কটা বড্ডো মিস করি তোমায়।

বিসজ্জন

শেষ হয়েও হলো না যে শেষ।

সেই মাস দেড়েক আগে থেকে সেই যে চলেছে পুজো পুজো পুজো। শেষ আর হয় না। নবমী পোহালো। দশমীও। সব ঠাকুর বিসজ্জন। ভাবলাম ল্যাঠা চুকেছে। তো কোথায় কি? শিকারী বিড়ালের মতন এলো লক্ষী পুজো। সন্ধ্যাবেলা আদ্যোপান্ত নিরামিষ খেয়ে এলাম এক বাড়িতে। ছি ছি। আমার আবার নিরামিষের ছোঁয়াতেই কেমন গা গুলায়।

আর বিজয়ার আদিখ্যেতা ও আর থামে না। শনি রবি হলে আর কথাই নেই। শুক্কুর বার রাতেও। তবে মিছে বোলবো না, খ্যাঁট ভালো ই জমে। পানীয়ও থাকে। এট্টু কোলাকুলি কত্তে হয় - এই যা।

আজ আমার বাড়িতে। রাঁধলাম স্টাফড ক্যাপসিকাম , পনীর পসন্দ, মুর্গ মুসল্লম আর কিমা আর কলিজার একটা লাবড়া।

আপনেদের বিজয়ার মোচ্ছোব কেমন চলছে ? রান্নাবান্না ঠিকঠাক তো?

ডিডির কিচাইন

বলছেন যখন তখন থাক একটা রেসিপি। এই বঙ্গভূমে একটি মিথ খুব প্রচলিত যে পুজোর সময় রান্না বান্নার পাতায় কয়েকটি অতি ইলাবোরেট রান্না দিতে হয়। সবাই দ্যায়। কেউ রাঁধে না। তাহলে রোল কে খাবে? চীনা থালি? ফুচকা? আরে, পুজোয় কেউ রেঁধে খায়? আপুনি কি এস্কিমো? না হটেনটট?

তাও দিচ্ছি। ঐ মুর্গ মসল্লমের ই। না হলে আবার ওয়াজেদ আলি রাগ করবেন।

মুর্গ মুসল্লম

১. চাই একটি পেট কাটা আস্তো মুর্গী।

২. তার পেটে দিন ঃ চিকেন কিমা/ অনেকটা অ্যামন্ড,অল্প পিস্তা/ কিসমিস/জায়েত্রীর গুঁড়ো/ক্রীম/আদা/রসুন/কাঁচা লংকা/ কনিআক। এগুলো মেখে পেস্ট করে দিন।

অ্যামন্ড ,পিস্তা বেটেও দিতে পারেন,গোটাও দিতে পারেন। কনিয়াক না পারেন তো পাতি রাম দিয়েন।

সেলাই করে ভাজুন। ভালো করেই ভাজুন। সরিয়ে রাখুন।

এইবার সস তৈরী হবেন। ঐ মুর্গী ভাজা তেলে ভাজুন প্যাঁজ, দিন আস্তো গরম মশল্লা, প্লাস গরম মশল্লা গুঁড়ো, পোস্তো বাটা

(বেশী), নার্কোল বাটা(অন্ততঃ এক কাপ), কাজু বাদামের পেস্ট। জিরে। আর অল্প মৌরি বাটা। দই। জায়ফল। গরম জল ঢেলে একটু ঝোল ঝোল করুন। বার বার বলছি, যতো পারেন ঢিমে আঁচে রাঁধবেন। মোটেই তাড়াহুরার রান্না নয়।

এইবার ই কঠিন কাজ। ঐ সসের উপর মুর্গীটা দিয়ে ঢাকনা চাপা দিয়ে খুব কম আঁচে রাধতে হবে। যতো মন দিয়ে (অন্ততঃ আধ ঘন্টা,পারলে আরো বেশী) ততৈ খেতে ভালো হবে।

নামাবার আগে দিন জাফরান আর এট্টু কেওরার জল।

টীকা ঃ ডাবুর কোম্পানী কেওড়ার জল বোতলে বিক্রী করে। দিব্বি।

আর দেখুন, যতো ই চেষ্টা করুন, মুর্গীর পেট সেলাইএর সুতো একটু আপনার পেটেও চলে যাবে, যাবেই।

না, বলছি না, তিন দিন ডেটলে কেচে শুকিয়ে তবে ব্যবহার করুন, কিন্তু এক তো গেস্টের সামনে চিৎকার করে বলবেন না "যাঃ, ঘেঁটে গ্যালো, অতো বড় সুতোটা কিরম মশল্লার সাথে মিশে গ্যালো।" আর দুই নম্বর একটু ভাজা সুতো খেতেও ততো কিছু খারাপ হয় না।

ব্যক্তিগত পুজো

সম্বিত বসু

আমার কোন পুজো নেই। দীর্ঘদিন দেশছাড়া। তাছাড়া এই কবছরে বয়েসও বেড়ে গেছে ঠিক ততবছরই। পুজোয় নতুন জামাকাপড় কেনা হয়না। দেওয়ারও কেউ নেই, কারুর থেকে পাওয়ারও নেই। মেয়েদের জন্যেও পুজো উপলক্ষে কিছু কিনিনা। অবশ্য ভাববেন না যেন তাতে কোন দু:খের মিশেল আছে। সারাবছরই তাদের নতুন জামা হচ্ছে।

আসলে উত্তেজনা-টুত্তেজনা সবই একধরনের ছোঁয়াচে রোগ। অন্যের থেকে ধীরে ধীরে চারিয়ে যায় নিজেদের মধ্যে। বাইরের আওয়াজ না এলে মন থুম মেরে থাকে ফাঁকা বাড়ির মতন। হাওয়ায় কাশফুলের দোলায় ঢাকিদের নাচ দেখতে পাওয়া; নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা দেখে মন উচাটন করা; অনুকূল সমীরণ বেয়ে পরবাসীর ঘরে চলে যাওয়ার ডাক মনের মধ্যে শুনতে পাওয়া - এ সবই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার খেলা। সোশাল কন্ডিশনিং। কাজেই যে সমাজে পুজো নেই, কাশফুল নেই, শরতে সাদা মেঘের ভেলা আছে কি নেই বোঝা যায়না - সেখানে সেই সোশাল কন্ডিশনিং-ও নেই। কিন্তু, তবুও তো প্যাঁচা জাগে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দেশে-বিদেশে বাঙালী হিন্দুর মন পুজো-পুজো করে। এই অমোঘ সত্যকে এড়িয়ে যেতে চাই নানারকম প্যাঁচপয়জার কষে। আজ ওবামার হেলথ কেয়ার ডিবেট তো কাল রেড সক্স। আজ বসের ধাঁতানি তো কাল আইপিওর নিশির ডাক। বুঝি। একগাছা দড়ি হাতে অশ্বত্থ গাছের দিকে গুটিগুটি যাওয়া ছাড়া আর কোনভাবেই এই অমোঘের হাত ছাড়ান অসম্ভব।

তা বলে ভাববেন না যেন যে এই প্রবাস ধুধু মরুভূমি।

পুজো-টুজোর নামগন্ধহীন এক অলীক বিদেশ, যেখানে শুধু সাহেব-মেমেরা ঘুরে বেড়ায়, গরু খায় ও গির্জায় যায়। কেস কিন্তু কমপ্লিটলি আলাদা। আমি যেখানে থাকি সেখানে কোনদিন রাস্তায় একপিস সাহেব বা মেম - সে কালো হোক কি ধলো - দেখা গেলে পরের দিন লোকাল কাগজে খবর বেরোয়। ভারতীয় ও চিনে-কোরিয়ান-ভিয়েতনামীরা নিজেদের মধ্যে হাহুতাশ করে সাহেব- মেম কমে যাচ্ছে বলে। পাড়ার হিন্দু মন্দিরে পুজোর সময়ে গাড়ির ভিড়ে এত ট্র্যাফিক জ্যাম হয় যে সিটি থেকে গেলবার শাটল বাসের ব্যবস্থা করেছে। কে বলে বাঙালী হীন? আমরা হেলায় রামচন্দ্রের দাদুর বাবার সঙ্গে ফাটাফাটি লড়াই দিইনি? (বাসের ব্যবস্থা শহরের থেকে করেছে কিনা জানিনা। বলে তো দিলাম। কারণ পয়েন্টটা জোরদার হয়। তবে ট্র্যাফিক জ্যাম এড়াতে শাটল বাসের ব্যবস্থা হয়েছে সেটা একেবারে নির্জলা সত্যি। আপন গড।) সেই মন্দির প্রাঙ্গণে ফুচকা-ঝালমুড়ির স্টল বসে। বাংলা গানের সিডি সাজিয়ে বসে থাকেন সজ্জন কল্পতরু। বাংলা ডিভিডি বেচে সুমন খান। বই-টইয়ের স্টলও থাকে। মহিলারা দামী-দামী শাড়ি পরে নিজেরাই নিজেদের চিত্তে চুলবুলি জাগান। পুরুষরা স্ট্রোলার ঠেলেন। যাঁদের সে পাট চুকেছে, তাঁরা হাই তোলেন আর অপেক্ষা করেন আদেশের জন্যে, "শুনছো, গাড়িটা একটু সামনে আনবে?' এমনি করে রাত্রি নাবে বন্দরে বন্দরে।

আর সেই ঘনায়মান রাত্রে পুরুষটি ভাবেন, এই মহিলার জন্যেই কি পঁচিশ বছর আগে বেপাড়ার ছেলেদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সপ্তমীর সন্ধ্যের উদ্দাম ঢাকের বোল বুকে তুলে অন্ধকারে আকাশমনি গাছের নিচে ল্যাল্যাকাত্তিকের মতন দাঁড়িয়ে ছিলেন, হ্যাঙ্গারে মাড়-দেওয়া পাঞ্জাবী হয়ে, একা! আর মহিলা ভাবেন এই ইনসেন্সিটিভ, আনকুথ লোকটার জন্যেই কি দিদির সঙ্গে ঝগড়া করে জীবনে প্রথমবার পুজোর সেরা শাড়িটা পরেছিলাম, সেফটিপিনের দোকান সেজে!

তা সত্বেও আমার পুজো হয় না। আমি প্রতিমা দেখতে

যাইনা। গেলেও নমোনমো করে একবার দায়সারা দেখে আসি। মার মুখের বদলে বেশি চোখে পড়ে ডাকের সাজ না শোলার সাজ। একচালা ঠাকুর না আলাদা আলাদা। ঠাকুরের সামনে বাচ্চারা ঢলঢলে নতুন প্যান্ট একহাতে ধরে ক্যাপ ফাটাতে ফাটাতে শত্রুদমনে ছুটোছুটি করে না। এখানে ডেকরেটরের চেয়ার জড়ো করে গোল হয়ে বসে ক্লাবের ছেলেদের গুলতানি নেই। এখানে দলবদ্ধ কিশোরীর আপাতকারণহীন হাসির হররায় ঘাড় ঘোরানোর মতন কিশোরকুলের অভাব। যেরকম অভাব কারণ অকারণে বেপাড়ার কিশোরদের সাইকেল চেপে প্যাণ্ডেলের আশেপাশে ঘুরঘুর। পঞ্চমীর দিন ঠাকুর আনতে যাবার উত্তেজনা নেই, দশমীর দিন ঠাকুর নাবানোর সময়ে ঠেলাঠেলির দমবন্ধ নেই। গাঁজা খেয়ে ভাসানের উত্তাল নাচ নেই, ঘাটে বিসর্জনের পরে সিদ্ধি মেশানো কুলপি বরফ খাওয়া নেই। ঘাট থেকে ফেরার পর পাড়ার মাসিমাদের মুখে রসগোল্লা তুলে দেওয়া নেই।

আসলে, আমার কোন পুজো নেই।

পুজোর আমি , আমার পুজো

পারমিতা চ্যাটার্জী

ষষ্ঠীর সন্ধ্যে -

মোহন কুমোর মায়ের মুখ আঁকতে ব্যাস্ত। কুচো-কাঁচাদের জন্যে কড়া আদেশ , খবরদার বাঁশের এদিকে কেউ আসবে না।আমাদের আসতে বয়েই গেছে। পুতুল দুগ্গা আর কে ভালোবাসে। দাদু তো বলেই দিয়েছেন মা দুগ্গার প্রাণ প্রতিষ্টা হয় সপ্তমীর সকালে।

আমরা প্যান্ডেলের এদিক ওদিক লুকোচুরি খেলি। ত্রিপল -বাঁশের জঙ্গলে হুড়মুড়িয়ে পড়ি আর হিহি হাসি। তারমধ্যে ঢেকোরাও এসে গেছে। ডাড্ডা ড্ডুম ডাড্ডা ডূডূম।এবার লুকোচুরি ছেড়ে আমরা ঢাকের তালে তালে দু হাত তুলে নাচি।এই রে জেঠু। হয়ে গেল সমস্ত আনন্দ মাটি। এর পর আবার বাড়িতে গিয়ে বাবার রামবকুনি "তুমি দুগ্গামেলায় ঢাকীদের সাথে নাচছিলে, লজ্জা করে না বাঁদর মেয়ে"। চুপ চুপ বাড়িতে ঢুকে দেখি বাবা মহা ব্যস্ত। ষষ্ঠী পুজোর কি যেন উপাচার পুরুতদাদু ফেলে এসেছে। এদিকে সময় বয়ে যায়।কাজেই নো বকুনি নাথিং।

ছোট ছোট।আমাদের তুলসিতলায় ষষ্টীপুজো। পাড়ার সময় মেয়ে-বৌ-বাচ্চারা উঠোনে গল্পে মশগুল। মা চায়ের ট্রে নিয়ে হাসি হাসি মুখে।এই সন্ধ্যেটা আমার খুব প্রিয়। পুজো হচ্চে সার্বজনীন, ষষ্ঠীপুজো কিন্তু শুধু আমাদের বাড়িতে। রুনু-মনিমালা-চুমি-সীমা কারোর বাড়িতে নয়। আমার এই নিয়ে খুব অহংকার। আমি সবাইকে ডেকে ডেকে বোঝাই "জানিস অনেক আগে মনোহরতলাতে কোনো পুজো ই ছিল না ,পাড়ার সবাই পুজো

দেখতে যেত নীলবাড়িতে তাই আমার দাদু নিজে খরচা করে পাড়ায় পুজো শুরু করেছিলেন , সেই জন্যেই তো ষষ্ঠীপুজো আমাদের বাড়িতে হয়"। রুনুদের দেখি গপ্প শোনার মন ই নেই , হাত ধরে টানে "চল চল , চোখ আঁকা দেখবি না"। সব যে হয়ে গেল।

দুগ্গামেলায় সব গালে হাত রেখে হাঁ করে তুলির টান দেখছি , এমন সময় বাবা পেছনে।"বাড়ি চল, পুজো বলে কি সাড়ে সাতটা পর্যন্ত রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে"।

ছলছল চোখে বাড়ি।

অবশ্য বাড়িতেও কি কম আনন্দ। সোনাপিসিরা এসে গেছে। ফুলপিসি এল বলে।বাড়ি জমজমট।এবরে তো দিদিও আসছে ভাগলপুর থেকে। মানে আরো তিনখানি জামা।হে ভগবান কেউ যেন একটা গোলাপী জামা আনে। মাকে এতবার বোললাম গোলাপী জমা কিনে দিতে মায়ের সেই এক কথা গোলাপী তো আছেই। আরো না হয় একটা হল। মা কিছুতেই বোঝেনা।

কাল আবার সপ্তমীর দোলা আনতে যাবো। সক্কাল বেলায়।এবারে আর পল্টুদাদার বাইকে চেপে নয়। রুনু-সীমাদের সাথে গল্প করতে করতে হাঁটবো সেই শালীনদী পর্যন্ত। ফেরার সময় শ্মশানকালীর মন্দির। উফ্‌ফ পুজো যে কেন প্রতি বছর দু-তিনবার হয় না।

সপ্তমীর সকাল -

ঘুম ভেঙ্গে গেছে কাকভোরে। পাশে দিদা অঘোর ঘুমে। দিদার গায়ে কি সুন্দর মিষ্টি পানের গন্ধ।দিদাকে আমি খুব ভালোবাসি।বাবা-মার চেয়েও বেশি।না না বোধহয় একই রকম। কে জানে। এক এক সময় এক এক কথা মনে হয়।

দিদাকে ওঠাই ঠেলে ঠেলে , দোলা আনতে সবাই চলে গেল যে। দিদার ঘুমন্ত ধমক "সাড়ে আটটায় দোলার সময় , এখন

ছটাও বাজে নি , ঘুমো আরো একটু"। আহা ঘুমো বললেই যেন ঘুম আসে। বাবা বাজার করে ফিরে আসার আগেই তো আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাবা দেখলেই যেতে দেবে না নদী পর্যন্ত।উফ্ফ আজই সবাই ঘুম থেকে উঠতে দেরী করছে।

বাবা চা খেয়ে বাজার বেরিয়ে যেতেই আমি সাদা ফ্রকটা গলিয়ে রুনুদের বাড়ি।রাস্তায় দেখা রানুদি-গোপাদি-বুড়িদি র সাথে। সব কেমন সুন্দর লাল পাড় সাদা শাড়ি পরেছে।সবার হাতে শাঁখ।আমি যে কবে শাড়ি পরাঅর মত বড় হব।

সাড়ে আটাটা কবেই বেজে গেছে। এখনো দোলা পাড়া থেকেই বেরয় নি।ওহ এই বেরল।কি সুন্দর যে লাগছে।সব দিদিরা লাল-সাদা শাড়িতে আর সব দাদারা সাদা পাঞ্জাবী আর ধুতি।মেয়েদের হাতে সব শাঁখ আর ফুলের টুকরি। তবে সব গল্পেই ব্যাস্ত , ফুল ছড়ানো ও নেই আর শাঁখ বাজানো ও নেই। জয়দা আর চুমিদি সবার পেছনে।মিটকি মিটকি হেসে এ ওর গায়ে ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে। ওদিকে তাকাতেই রুনুর কনুই দিয়ে ঠেলে বল "জানিস ওদের না ভাব আছে"।

ওমা ভাব যে আছে তাতো দেখাই যাচ্ছে। আড়ি থাকলে কেউ আমন হেসে হেসে একসাথে হাঁটে নাকি। রুনুটও যেমন বোকা। শুধুই কি অংকে কেবল ফেল করে।

শালী নদী পৌঁউছেই গেলাম। একটা বেঁটে পুলের তলা দিয়ে কুলকুল জল।প্রুতঠাকুর আর কজন দোলা নিয়ে সোজা জলের মধ্যে নেমে গিয়ে মন্ত্র পড়েই যাচ্চে।তলায় ধপধপে বালি।জ্জুতো-মোজা খুলে জলে সে দুপা নেমেছি ওমনি পিঠে পল্টুদাদার থাবা। উফ্ফ কেন যে আমার এত দাদা-দিদি।

জল থেকে উঠে গিয়ে উঁচু বালির চরে। পাড়ার দাদারা সব পটকা ফোটাচ্চে।সাগরদার খুব সাহস। চকলেট বোম হাতে জ্বালিয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিছে।ফাঁকা মাঠে সে কি আওয়াজ।আরো কত পাড়া থেকে এসেছে দোলা নিয়ে। কিন্তু

মনোহরতলা সবার সেরা। সবাই একরকম জামাকাপড়। সবাই শুধু আমাদেরকেই দেখছে।এর মধ্যে দেখি থানাগোড়ার পার্টির সাথে সাথীশ্রী এসেছে। দৌড়ে গিয়ে হাত ধরলাম।সাথী আসবে মনহর্তলার ঠাকুর দেখতে নবমীর সন্ধ্যেতে। ওর সবচেয়ে ভালো জামাটা পরে। আমিও সেদিন সিল্কের ফ্রকটা পরবো।ওমা এর মধ্যেই দেখি দোলা নিয়ে ঢেকোরা উঠে যাচ্চে রাস্তার দিকে। দৌড় দৌড়।গিয়ে রুনুর গায়ে এক ঠ্যালা। চলে যাচ্ছিলি যে।

পাড়ায় ঢোকার মুখেই দেখি বাবা দাঁড়িয়ে।দেখেই থমকে গেছি।দেখছি বাবার থমথমে মুখ। ও মা কাছে গিয়ে দেখি থম্থমে কোথায় বাবা বেশ হেসে হেসে রামজ্যঠাকে কি বলছে। আমি দৌড়ে গিয়ে হাত ধরতেই প্রশন" কি রে অদ্দুর হাঁটতে পারলি ? পায়ে ব্যাথা করে নি?" বাবাটা না আমাকে এখোনো ছোটো মেয়ে ভাবে।বাবার হাত ধরে একবার মন্ডপে গিয়ে মা দুগ্গাকে প্রণাম করে নিয়েই বাড়ি।

যা: পুজোর সবচেয়ে আনন্দের সময়টা শেষই হয়ে গেলা। এবার তো সেই আরতি আর ভোগ খাওয়া।অবশ্য আরো একটা মজার জিনিষ বাকি আছে। অষ্টমীর খ্যান।

অষ্টমীর দুপুর-

মন্ডপে দাঁড়িয়ে ঘনঘন রাস্তার দিকে তাকাই। মা তো এখনো এলই না। সবার মা রা মন্ডপে। আবার ডাকতে যেতে হবে। কতদিকে যে আমি সামলাই। ছুটে আবার বাড়ি। "সন্ধি পুজো যে শুরু হয়ে গেল। দাদু কি সুন্দর ধপ্ধপে সিল্কের ধুতি পরে আরতি করছে , দেখবে না। চল চল , সব তো শেষ হয়ে গেল। খ্যান ও চলে আসবে এখুনি"।মা তখোনো রান্নাঘর গোছাচ্চে। আমি যখন আনন্দ করি তখন মা কাজ করে একা একা। মায়ের নিশ্চয় খুব দু:খ।আমি ডাক্তার হয়ে মাকে কিছুতেই কাজ করতে দোবো না। মা ক মিনিটের মধ্যে একটা শাড়ি কোনোমতে গায়ে জড়িয়ে নিল। আরে দামের স্টিকার তো খোলো।মাটা এক্দম

পাগল। আমি আর মা দ্রুতপায়ে মন্ডপের দিকে। মায়ের নতুন শাড়িতে খসখ্‌স আওয়াজ, মায়ের ছোট্টো ফরসা কপালে লাল টুকটুকে টিপ , মায়ের বাঁশির মত নাকে ঘামের পুঁটকি , মায়ের গোল ফর্সা হাতে শাঁখা-পলা-বাউটির ঝুমঝুমি ।আমার মা একদম দুগ্গা ঠাকুরের মত দেখতে।

মায়ের হাত ধরে মন্ডপে এসে দাঁড়াই। সব বৌরা মাকে দেখে কাছে এসে দাঁড়ায় ।শুধু এই সন্‌দ্‌ধপুজোর সময়েই সবার মা রা মন্ডপে থাকে। নইলে শুধু দাদা-দিদিরা আর আমরা ছোটো রা। মন্ডপ ধোঁয়ায় ধোঁয়া , ধুপ-ধুনোর মিষ্টি গন্ধ , ঢাকের আওয়াজ এত জোরে হচ্চে যে মনে হয় যেন নিজের বুকের ভিতরেই ঢাক বাজছে।

সন্ধিপুজো শেষ ।মা প্রদীপের ওপরে হাত নিয়ে আমার মাথায় বুলিয়ে দেয়। দু চোখ বন্ধ। ঠোঁটে বিড়বিড়।

আমি টান দি মায়ের হাতে। চল জায়্গা দেখি, খ্যন আসবে এখুনি। পেছনে দাঁড়ালে দেখবো কি করে।

কাল রাতে খেতে খেতে বড়জেঠু আমাদের সব ভাইবোনকে ক্যানের গপ্প শুনিয়েছেন ।সবাই বোকার মত নাকি খ্যান বলে। আসল কথা নাকি ক্ষণ মানে মুহুর্ত। অপভ্রংশ হয়ে নাকি খ্যান হয়ে গেছে। অপভ্রংশ। কি সুন্দর কথাটা , কি জোরালো। জেঠ্যু তার মানেও বুঝিয়েছে। ভালো কথা নাকি বলে বলে মুখে মুখে খারাপ হয়ে অপভ্রংশ হয় ।সে শুনে আমি ভাইকে বলি " তোকে আমি অপভ্রংশ করে দেবো" ।ভাই বোনেরা সব শুনে হেসে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে আর জেঠু আমাকে মিছি মিছি গাঁট্টা মারে ।তবে আসল গল্পটা খুব মজার। অনেক আগে যখন সোনামুখী বিষ্নুপুরের মল্লরাজার ছিল তখন এক মল্লরাজা পুজোতে বলি দেওয়া মানা করে দিয়েছিল ।তাই বলির সময় শুরু হবার আগে নাকি সব পাড়ার কত্তারা সব বলির অস্ত্রশস্ত্র রাজার কাছে গিয়ে জমা করে দিত ।সেইটাই মনে রাখার জন্যে এখন সব পাড়ার লোকেরা অস্ত্র নিয়ে থানায় জমা দিয়ে আসে ।তাতে প্রচুর মজা হয়।

মায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালাম বুড়ুকাকীমাদের বারান্দার ওপরে। ঐ একটা খ্যান আসছে। রৈ রৈ করে ছুটে ছুটে।হাতে কারুর খাঁড়া , মরচে ধরা তরোয়াল। বেশিরভাগেরই গাছের ডাল। সব দলের সাথে একদল ঢাকী। কি নাচ কি নাচ। কটা মাতালও আছে দলে।ধুপধাপ পড়েই যাচ্চে কেবল।আমি হেসে আর কুল পাই না।

সবচেয়ে বড় দল আসে চৌধুরীপাড়ার। পোচুর লোক আর একশো আটটা ঢাক। দু হাত কানে চেপে আমি লাফাই।

সব পাড়া পেরিয়ে গেলে তবে আমাদের পাড়ার খ্যান। দাদা দেখি সবার আগে। কপালে সিন্দুর। চুপচাপ হাঁটচে।নাচানাচি নাই। সবাই বলে দাদা নকি খুব ভদ্র ছেলে। দাদার পেছনেই মস্ত তরোয়াল হাতে সাগরদা।ওমা সবাই দেখি ছক্কাদাকে নিয়েই পড়ে আছে। ছক্কাদার মাথায় লাল ফেটি আর হাতে একটা মস্ত ঝামা পাথর। আর গায়ে চেটানো একটা কাগজে বড় বড় করে লেখা "স্টোনম্যান"। "মা স্টোনম্যান কি মা"। মা বলে জানিস না কোলকাতার রাস্তায় একটা লোক পাথর দিয়ে সব লোকদের মেরে ফেলছে। পুলিশ ধরতেও পারছে না।ছক্কা তাই সেজেছে। " মা বাবাকে সাইট থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বলবে মা "। "ধুর বোকা মেয়ে , সোনামুখীতে ওসব হয় না"।

এক এক করে সব খ্যান চলে গেল। বাবা ওদিক থেকে ইশারা করে মাকে বলে খিদে পেয়েছে। আমরা গুটি গুটি বাড়ি ফিরি। বাবা অনেকটা আগে ভাই আর কপিলের হাত ধরে। মাঝে আমি লাফাতে লাফাতে। আর মা সবার পেছনে। এর ওর দরজায় দাঁড়িয়ে একটু করে গপ্প করে নিচ্ছে।হয়েই গেল পুজোর দুদিন।আর মাত্র একটা দিন। দশমীর সকালেই তো আবার দাদুভাই আর দিদুকে বিজয়ার প্রণাম করতে।

মামাবড়ি বেড়াতে চলে যাবো।

নবমীর সন্ধ্যা -

সূচীপত্র

নবমীর সারা দিনটা এমনিতে কেমন যেন বোরিং বোরিং। বাবা আবার বোরিং বললেই খুব রেগে যায় "বাচ্চাদের আবার বোরিং কি , তোদের তো সবেতেই আনন্দ পাওয়ার কথা"। হুঁ।যাগ্গে বাবা বল্লে তো আর তক্ক করা যায় না।মা হলে তবুও চলে।তবে নবমীর দুপুরটা কাটলো ভালো।এবারে সকাল থেকে মিছিমিছি কান্না কান্না ভাব করে ঘুরেছি , শেষে বাবা মেনেই নিল " যাও দেখো ঐ কাঁকড় দেওয়া খিচুড়ি খেয়ে কত মজা।ওসব ছোটো লোকেরা খায়, ভদ্র বাড়ির লোকজন ওভাবে রাস্তায় বসে খায় না , এই বার ই শেষ"। আহা কি কথা। রুনু-মনিমালারা সব যেন ছোটোলোক। " তাই তো , মনিমালার দাদা একটা চোর , সাইকেল চুরি করে ধরা পড়েছিল"।এইবার আমার এইসান রাগ হয়ে যায় বাবার ওপর।চুপচা রান্নাঘরে মায়ের কাছে।তাও শুনি বাবা লম্বাপিঁড়ে তে বসে গজগজাচ্ছে" পাড়ার বেরিয়েই মেয়েটা নষ্ট হয়ে যাবে। পড়াশোনার কোনো পরিবেশ আছে নাকি এখানে।রথতলাতে একটা বাড়ি করতেই হবে"।ওমা রথতলাতে আমরা কি করে বাড়ি করব।দাদু যে বলেন এইটাই আমাদের ভিটে।আর রথতালাতে আছেই বাকি। বাড়ি থেকে বেরোলেই শুধু রাস্তা আর অনেক দুরে দুরে একটা করে ছোট্টো বাড়ি।আমি তো কাউকেই চিনি না। খেলবো কার সাথে। আর লাইব্রেরী ই বা যাবো কি করে। গলার কাছে কেমন একটা কষ্টা হয় আমার।দুবার কেশেও ঠিক হয় না।রথতলায় গেলে বাবা একাই যাবে। আমি থাকবো দাদু-দিদা-জেঠু-বড়মার কাছে। এমনিতেও আমি দাদু-দিদা আর বাবা-মাকে সমান সমান ভালোবাসি।

নবমীর ভোগে আমার কি আনন্দটাই না হল। মনি-আমি-রুনু আর গোরা পাশাপাশি।গোরাটা একটা গুন্ডা।আমার খিচুড়ির সব বাদামগুলো তুলে নিল।খেয়েছেও দুম দুম করে পিঠে কিল। বাবা কি বাজে কথা বলে। কোথায় কাঁকড় , কিচ্ছু নেই। শুধু একটু পোড়া গন্ধ। সেটা এমন কি খারাপ।আবার খেতে বসে অনুজদা কি মজা করল , পাতে বাদাম দেখে চিৎকার করে বলে "করেছিস কি রে এ এ , খিচুড়িতে বাদাম যে রে এ এ"।হি

হি হি হি।ভেবেছিলুম খেয়ে পরে মনোহর্তলার মন্দিরের ভেতর ছোঁয়াছুঁয়ি খেলবো চারজন। হোলো না দুটো কারণে, দুটো ই ফালতু কারণ। এক- রুনু-মনি বললো ওদের বাড়ির জন্য কিছু খিচুড়ি নিয়ে যেতে হবে রাতে খাওয়ার জন্যে। সাথে বাটিও এনেছে দেখালো।

দুই-বাবা ঠিক ডাকতে চলে এসেছে দুপুরে ঘুমোনোর জন্যে। পুজোর সময়েও। ওফ্ফ ভগবান।

সন্ধ্যেবেলাতে বেরিয়েছি খুব সেজে। সাজ মানে ঐ আর কি। মানাপিসির দেওয়া সিল্কের ফ্রক আর ম্যাচিং রিবন চুলে।সাথে বেগুনীরঙ্গের পাম্প শু।মা কি বোকা। বলে মোজা পর। স্টাইল করতে হলে শুধু জুতো পরতে হয়।সোহিনী আমেরিকা থেকে যখন আসে তখন কি মোজা পরে নাকি।তারপর একটু সেন্ট মাখলাম আর হাল্কা করে মায়ের লিপস্টিক।বাবা ঠিক দেখতে পেয়েছে। "লিপস্টিক মুছে যেখানে যাবে যাও"।

আজ মনোহরতলায় কি ভীড় কি ভীড়। শেষ দিন না। কাল তো সবাই নিজেদের বাড়িতেই থাকে বিজয়া বলে। এবারে সব পিসিরা বলে মামাবাড়ি যাওয়াও পিছিয়ে দিয়েছে।পোশ্শু দিন মামাবাড়ি। ভালো ই হল। মামাবাড়িটা বড্ড গ্রাম।অনেক পুকুর আছে , সেটই যা মজার।কোলকাতা থেকে নুপুররা এলে আবার সোনামুখীকেও গ্রাম বলে। আমার প্রচন্ড রাগ হয় তাতে। তক্কে হেরে বাবাকে বলতেই বাবা শিখিয়েছিল " সোনামুখীর মিউনিসিপাল্টি আছে , কাজেই সোনামুখী শহরই। তবে মফস্সল বললেই ঠিক।" দৌড়ে গিয়ে বললুম নুপুরকে। হেরো হেরো। আর মুখে কথা নেই। হুঁ কোলকাতাই যেন একমাত্র শহর পৃথিবীতে।

আজ কত্ত বন্ধু এল মনোহরতলার ঠাকুর দেখতে।সব্বাই লিপস্টিক পরে আছে। কারুর বাবাই মুছতে বলে নি।মাঝখানে আবার দাদাকে বলে এক প্লেট ঘুগনি আর একটা কাঠি আইস্ক্রীম খেলাম।আটটা বাজলেই বাবা বলেছে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবে।

তেলট্যাংকের ওপর ভাই আর বাবার কোমর জড়িয়ে আমি পেছনে।একটা একটা ঠাকুর দেখছি, প্রণাম করছি আর একটা জিনিষই চাইছি" হে মা যেন এবার পরীক্ষায় সরলটা না ভুল করি।" প্রায় প্রতিবার আমি সরলটা ভুল করে আসি। যোগ কর্তে গিয়ে বিয়োগ না কি একটা করে দিই।বাবা ঠিক গোপালস্যারের বাড়িতে গিয়ে খাতা দেখে আসে আর ফিরে রামবকুনি। মাঝে মাঝে কানও মলে দেয় আচ্ছাসে। "অংকতে পঁচাশী?? এটা একটা নাম্বার হল। এখন যদি এই পাও তাহলে মাধ্যমিকে গোল্লা পাবে।থার্ড ডিভিশনও পাবে না। ডাক্তার হবে। ডাক্তার হতে গেলে অংকতে একশো পেতে হয়"।" হে মা এবার যেন আমি একশো পাই"।

বাবুপাড়ার ঠাকুর এবারে কি ভালো কি ভালো। কোলকাতার থেকে নাকি লোক এসে গড়েছে।সোনালী রঙ্গের দুগ্গা। আর মুখটাও কি মিষ্টি।মেলাও বসেছে। আমি একটা পুতুল, বাঁশী আর বেলুন কিনলাম। ভাই কিনলো দুটো গাড়ি , একটা পুলিশের জীপ আর একটা লাল টুকটুক মারুতি গাড়ি। ঠিক ছোটোমামার গাড়িটার মত।আমাদের অ্যাম্বাসাডরটা বাজে। বাবাকে বলতেই " ডাক্তার হলে কিনে দিবি"।"ও মা তুমিই যে বল আমি ডাক্তার হবই না"। বাবা এখন হাসে" সে তো রাগ করে বলি, তুই ভালো একটা কিছু হবিই হবি। আমি ঠিক জানি"।আমি বাবাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরি। বড় হয়ে বাবাকে আমি মারুতি গাড়ি কিনে দোবো ই দোবো।

ঠাকুর দেখে সোজা বাড়িতে খাওয়া। নবমীর দিন স্পেশাল মেনু। লুচি , ছোলার ডাল , মাংস, ছানার পায়েস।"রোজ এমনি রাঁদ্দতে পারো না।কোথাও পলং শাগ আর কোথায় এই"।

পিসিরা হাসে।"কুচুমনা আমার দাদার অত পয়্সা নাই বাবা"। আমিও হাসি। "তোমরা কচু জানো। বাবার অনেক পয়্সা।সব ব্যাংকে আছে।"খাওয়া হতেই ছুটে আবার মনোহরতলায়। ফাংশান আছে। আমি একটা কবিতা বলব। এই রে মোড়া

আনতে ভুলে গেছি। ভালো জামা পরে কি আর ধুলোতে বসে দেখা যায়। এক ছুটে বাড়ি থেকে একটা মোড়া এনে রুনুদের সাথে বোসলাম।প্রথমেই ছোটোদের গান , নাচ আর কবিতা। পাপু বলতে উঠে ভুলেই গেল। রামবোকা। আমি টক টক করে উঠে বেশ বলে এলুম সোনাপিসী যা শিখিয়ে দিয়েছিল "নমস্কার, আমার নাম পারমিতা চ্যাটার্জ্জী। আমি বলবো সুকান্ত ভট্টাচার্জের ভেজাল।

ভেজাল ভেজাল ভেজাল রে ভাই .... "

সব্বই কি হাততালি দিল।রুনু ও বলল আমারটাই নাকি সবার বেস্ট হয়েছে।আমার কিন্তু বেস্ট লাগলো বিলুদাদার কবিতা। কি সুন্দর করে বলল "কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই"। আমি ওটা বিলুদাদার কাছ থেকে ঠিক শিখে নেবো।এবার নাচ-গান-কবিতা শেষ। আসল জিনিষ এই শুরু হবে। নাটক। মাকেও দেখছি ভীড়ের মধ্যে , পিসীদের সাথে এসে বসেছে। এবারের নাটক শ্যামা। স্টেজের একপাশে ছোটোপিসী আর ছক্কাদা হারমোনিয়াম নিয়ে।প্রথমেই তাপসদা আর পরেশদা ঝকমকে পোশাকে।আর একদল কালো কোলো লোক।

তারপরেই শিখাদিরা এল স্টেজে। কি সুন্দর সেজেছে। আর ছোটোপিসী এবার একটা চেনা গান গাইছে

" থাক থাক নিজ মনে দুরেতে

আমি শুধু বাঁশরীরও সুরেতে

পরশ করিব ওর প্রাণমন

অকারণ .... "

রাত বেড়েই চলেছে। বাবা আমাদের ডাকতে এসেও দাঁড়িয়ে গেছে। আমরা সবাই দেখছি তাপসদা কখন তাপসদা থেকে বজ্রসেন হয়ে গেছে আর শিখাদি শ্যামা।

নবমীর রাতও শেষ হয়ে এল।

দশমীর সন্ধ্যে-

ঠিক যা ভেবেছি তাই।বাবাকিছুতেই যেতে দিল দোলা ভাসাতে।বলে "বোকা, দোলা আনতেই আনন্দ , ভাসাতে শুধু কষ্ট। দোলা ভাসানো মানেই তো পুজো শেষ"।তা ঠিকই বলেছে বাবা।দেখলাম ক-জন মিলে কলাবৌ ভাসাতে গেল সেই শালীনদী আবার। বেশি লোক নেই।সবায়ের বোধহয় পুজো শেষ বলে মনখারাপ।

দুপুরে আজ পিসিমনির বাড়িতে সবার নেমন্তন্ন।পিসিমনির বাড়িতে শিবদুর্গার পুজো।তাই সকাল থেকেই বাড়িতে খুব গল্প। মা-বড়মার আজ রান্না নেই। সকালের টিফিন করেই ছুটি। আয়েশ করে বড়ঘরের পিঁড়েতে বসে পিসীদের সাথে খোশ্‌গল্প হচ্ছে তাই। বাবাও যোগ দিয়েছে আজ। এমনিতে বাবা ইজিচেয়ারে বসে বসে সারাদিন শুধু কাগজই পড়ে।

দুপুরবেলা খেয়ে এসে আবার গল্প। এখন ওপরের হলঘরে। মাদুর পেতে সারি সারি দিয়ে সবাই শুয়ে। সবার মাথার চুপ বালিশের ওপর দিয়ে পেছন দিকে ছড়ানো।আমি সবার চুল নিয়ে খেলা করি।মায়ের চুল সবথেকে নরম ,রাঙ্গাপিসীর চুল সবচেয়ে লম্বা। আর সোনাপিসীর সবচেয়ে ভালো , কালো কোঁকড়ানো থোপা থোপা।

তিনটে বাজতে না বাজতেই সব দুপদাপ করে নীচে ছোটে। আজ বিজয়া না, বাড়িতে কত্ত লোক আসবে। রাঙ্গাপিসী হাঁক্‌ডাক করে "মিষ্টিগুলো এখোনো আনাও নি , চার রকম মিষ্টির অর্ডার দেওয়া আছে , যা রাজু ছুটে যা"।

জেঠু নিয়ে এল এক ঝুড়ি সিঁড়ির নাড়ু। আগে বড়মাই বানাতো। এইবার বাইরে থেকে আনানো হচ্চে।

মা সোনাপিসী নিমকি ভাজছে আর ঘুগনি সেদ্ধ হল কিনা মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছে।ছোটোপিসীর ইচ্ছে ছিল মাংসর ঘুগনি হোক, আমাদের সব ছোটোদেরও।দাদু শুনেই এমন চিৎকার করল

"এসব পয়সা খরচ করে মেয়েকে শান্তিনিকেতনে গান শেখাতে পাঠাবার ফল। এখনো এম-মিউজ পাশ হল না এদিকে মুখে ডিম মাখা , ঘুগনিতে মাংস দেওয়া এসব শেখা হচ্ছে"।ছোটোপিসী দালানকুঠুরীর ভেতরে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে। আমিও।

লোকজন আসতে শুরু করে দিয়েছে এক এক করে। দাদু বসে আছে ইজি চেয়ারে আর দিদা পাশের বেতের মোড়াতে।আমি প্রণাম করতে এসে দাদুকে দেখি। দাদুকে প্রণাম করি।দাদু দু হাত দিয়ে আমার মুখ ধরে কপালে চুমু খায়।জড়িয়ে ধরি দাদুকে। দাদুর গায়ের গন্ধ নিই।বুক ভরে নিই, মন ভরে নিই।

তারপর বাড়ি ঘুরে ঘুরে সব্বইকে প্রণাম করি আমি, ভাই , কপিল, টুটুদিদি। সবাইকে।

এর মধ্যেই আসতে থাকে পিলপিল করে একগাদা ছোটো ছোটো ছেলে। বাউরীপাড়া , ডমপাড়া থেকে। হাতে তাদের প্লাস্টিকের প্যাকেট। প্যাকেট ভরে মিষ্টি নেয় সবার বাড়ি থেকে। ওরা আবার প্লাস্টিক বলে না, বলে "ঝিঝির"।আমি পিসীদের কাছে গিয়ে ওদের নকল করি " ও গো বিজোয়ার দুটো মিষ্টি দাও গো , আরো দুটো দাও গো , ঝিঝিরটা যে আদ্দেকটাও ভরে নাই"। সবাই হেসে খুন। বড়মা শুধু এসে বলে "অমন বলতে নেই মা আমার , ওদের বড় কষ্ট"। আমার মা ওদের ঝিঝির ভর্তি করে মিষ্টি দেয়।

এদিকে বাড়িতে লোক আসা বেড়েই চলেছে।সব্বইকে দিদা মিষ্টি খাওয়াতে চায়। "থাক মাসীমা কত মিষ্টি আর খাবো , আপনাদের আশীর্ব্বদ পেলেই হচ্ছে।দিদা ছাড়ে না "বছরকার দিনে কি আর শুকনো মুখে যেতে হয় বাব ঠিক আছে মিষ্টি খেতে হবে না , নোনতা খাও , এক প্লেট ঘুগনি বা নিমকি"।

এর মধ্যেই দেখি পাঁচু গুন্ডা ঢোকে আমাদের বাড়িতে। সবসময়ের গেন্‌জী আর জীন্স নয়। বেশ গুছিয়ে ধুতি আর পান্‌জাবী পরে।আমি ছুটি বাবার কাছে , এক নি:শ্বাসে খবরটা

দিই "বাড়িতে গুন্ডা এসেছে বাবা, তাড়াতাড়ি চলো , ঠ্যাং ভেঙ্গে দাও মেরে"। বাবা মাথায় হাত দেয় আমার "চুপ চুপ , বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছে বোধহয়।জানো না বিজয়ার দিনে শত্রু-মিত্র সব এক হয়ে যায়,সব রাগ-ঝগ্ড়া-দ্বেষ ভুলে যেতে হয়।" "দ্বেষ মানে কি বাবা"। বাবার আর উত্তর দেওয়ার সময় হয় না। পাঁচু এসে প্রনাম করে বাবাকে।বাবাও দেখি বেশ হেসে হেসে কথা বলে। কেমন আছে , বাচ্চাটার শরীর কেমন। আমি একধারে দাঁড়িয়ে শিখে নিই , বিজয়ার দিনে সবাইকে ভালোবাসতে হয়, সব রাগ-ঝগড়া ভুলে যেতে হয়।

রাত দশটা পর্যন্ত লোক আসতেই থাকে। মাঝখানে মা আমাকে আর দিদিদের প্রণাম করতে পাঠায় সবার বাড়িতে।আমরা হিসেব করি কাদের বাড়িতে ঘুগনি হয়েছে , বেছে বেছে সেই বাড়িতে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে আসি। শুধু-মিষ্টি বাড়িগুলো সব কাল হবে। মা বলে লক্ষীপুজো পর্যন্ত বিজয়া থাকে। একটু দেরী হলে দোষ নেই।

ঢাকের আওয়াজ শুনে বাড়ির সবাই সবাইকে ডাকে। মা দুগ্গাকে বিসর্জনের জন্য মন্ডপ থেকে বের করা হচ্ছে। চল সবাই , তাড়াতাড়ি।আমরা সবাই মিলে ছুটি। এক এক করে বের করা হচ্ছে সবাইকে ।প্রথমেই কার্তিক , গনেশ।হুড়োহুড়ি করে সব পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রণাম করে। মন্ডপে তো কেউ আর ঠাকুর ছুঁতে পায় না। আমিও করি। মা দুগ্গা আর সরস্বতীকে একটু বেশি করে প্রণাম করি আমি। মনে করিয়ে দিই অংকে একশো দেবার কথা , নিদেন্পক্ষে সরলটা যেন ঠিক হয়।

মা দেখি সিঁদুর খেলছে। সব বৌরা এক অপরকে সিঁদুর মাখায়। আমার মা হাসে। সারা মুখে সিঁদুর।মাকে আরো সুন্দর লাগে আমার। এর মধ্যেই রুনু এসে আমার কপালে সিঁদুর লাগিয়ে দেয়।আমি মুছতে গিয়েও থেমে যাই , মা বলে সিঁদুর নাকি মুছতে নেই।অমঙ্গল।

এবারে লোক বেড়ে যায়।আমি মদের গন্ধ পাই। দিদি আমাকে

মদের গন্ধ চিনিয়ে দিয়েছে। আমি ঠিক এখন বুঝতে পারি।

সবার আগে এক দল ঢেকো , তারপর মা দুগ্গাকে তোলা হয় , পরে লক্ষী আর কার্তিক। সবার শেষে গনেশ আর সরস্বতী।শেষে ব্যন্ডপার্টি আর পাড়ার সব লোকেরা। একটা ভ্যানে চাপানো হয়েছে একটা ভুটভুটে জেনারেটর।চারদিক আলোয় আলো। মা রা গলায় আঁচল দিয়ে জোড়হাতে মা দুগ্গার মুখের দিকে তাকিয়েই আছে। আমরা ব্যান্ডের বাজনার তালে তালে লাফাই।তুবড়ি জ্বলে ওঠে এধার ওধার। মা ইশারায় বলে সরে যেতে।বাজি ফাটতেই থাকে। হঠাৎ চোখ পড়ে যায় আটচালার মন্ডপে , ঝুপসি অন্ধকার। শুধু একটি প্রদীপ জ্বলছে একা একা।কাল ওখানে ছাগল-কুকুর ঘুরে বেড়াবে , যদ্দিন না পাঠশালা খোলে। আমার হঠাৎ কেমন কান্না পেয়ে যায়।পুজো শেষ , পুজো শেষ। মা এসে পেছন থেকে ঠ্যালা মারে আমায় " প্রণাম কর , প্রণাম কর , উল্টোদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছো কেন , মা দুগ্গা যে চলে যাচ্ছেন"। আমার এবার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে।আমি হাতজোড় করে দেখি সব আলো , সব ভীড় দুরে চলে যাচ্ছে। আমরা কজন দাঁড়িয়ে থাকি ল্যাম্পপোস্টের টিমটিমে আলোর তলায়। ভীড়ের আওয়াজ পাতলা হতে থাকে। তাও আমরা শুনতে পাই -

আআসছে বছ অ অর

আআবাআআর হবে এ এ।

অমি বড় হই , হতেই থাকি। কখন যেন কুচুমনা থেকে পারমিতা হয়ে যাই। পুজো কিন্তু ঠিক আসে। আমি হয়তো চেতনে - অবচেতনে অপেক্ষাও করে থাকি। মনের ভিতর ডুডুম ডুডুম বাদ্যিটা শুধু তেমন করে বাজে না। তবু পুজো আসে। আমার পুজো।

সপ্তমীর সকাল

এক দল ছেলেমেয়েরা সেজেগুজে যায় দোলা আনতে। আমি ঢাক আর শাঁখের আওয়াজ পেয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দেখি।

সূচীপত্র

আমি যাই না। ইচ্ছে করে না।

ভাই জোর করে বাইকে বসায়।ভাই শেষ পর্যন্ত নিয়েই যায় আমায়। নিজেকেও। শ্মশানকালীর মন্দির। আমার বাবাকে শেষ দেখেছি এখানেই। আমার সুন্দর বাবাকে।ঝিরঝিরে হাওয়াতে ঠান্ডা চাতালে বসেই পড়ি আমি।বাবা আমার হাতে রাখে হাত। আমি গল্প জুড়ি মনে মনে । আবোল তাবোল গল্প। আমার বাবার সাথে। গল্প শেষই হয় না।অনেক পরে আমরা দু ভাইবোনে বাড়ি ফিরি একসাথে।হাসতে হাসতে।আমাদের বাবার গল্প বলতে বলতে। হাজারবার শোনা গল্পগুলো। আমরা প্রতিবার নতুন করে বলি। আর হাসি।

অষ্টমীর দুপুর

যীষ্ণু হাত ধরে টানাটানি করে "ও মিষ্টিমাসী , সন্ধিপুজো যে শেষ হয়ে গেল।খ্যানও এসে গেল। কখন নিয়ে যাবে আমায়।চল চল"। আমি ওকে কোলে তুলে ধীরপায়ে যাই মন্ডপের দিকে । মাকে আর ডাকি না। বেরোবার সময় মা যীষ্ণুর গাল টিপে আদর করে। আমি মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি মায়ের মুখে কি যেন একটা হারিয়ে গেছে , নিভে গেছে। যীষ্ণু আমাকে তাড়া দিতেই থাকে।

মন্ডপ সেই ধোঁয়ায় ধোঁয়া। বুক ভরে ধুপধুনোর মিষ্টি গন্ধ নিই আমি। আরতির প্রদীপের ওপর হাত দিয়ে যীষ্ণুর মাথায় বুলিয়ে দিই।দেখি মা এসে কখন দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। মা হাসে। মায়ের চোট্ট ফরসা কপালে একটা কালো টিপ। আমি হাঁ করে মাকে দেখি। আমার মাকে কালো টিপেও কি চমৎকার লাগে। দুগ্গা ঠাকুরের মতন।মা চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কি যেন বলতেই থাকে।আমি মায়ের হাত ধরে টানি , চল খ্যান চলে এল যে। ঢাকের আওয়াজের তালে যীষ্ণু দু হাত তুলে নাচে।দেখে আমি মা হেসে উঠি।শব্দ করে , খোলা হাসি। ঢাকের আওয়াজ ছপিয়েও শোনা যায়।

নবমীর সন্ধ্যে -

আমি মাকে নিয়ে এসেছি ফাংশন দেখতে। প্রথমেই ছোটোদের গান-নাচ-কবিতা। বাদলকাকুর মেয়ে চকমকে ঘাগরা পরে নাচছে "দিলোয়ালো কি দিলকি করার লুটনে ...... "। আমি মার হত ধরে টানি "খিদে পেয়ে গেছে কখন থেকে "। ক-পা এগোতেই মাইকে একটা ছোট্টো মানুষের গলা। চেনা গলা , চেনা টান। "নমস্কার , আমার নাম .... আমি বলব সুকন্ত ভট্টচার্জের ভেজাল। ভেজাল ভেজাল ভেজাল রে ভাই। "আমি মাকে এগোতে বলে ছুটি স্টেজের দিকে। দিশাহারা হয়ে।কুচোটা স্টেজ থেকে নামতেই চটকে মটকে আদর করে দিই। কুচোর মা না পিসী কে যেন আমাকে অবাক হয়ে দেখে বলে "পারমিতা না , কতদিন দেখি নি তোমাকে , ভালো তো"। এক গাল হাসি আমি। ঠিকই তো। কতদিন দেখি নি আমি নিজেই নিজেকে। এই দেখা হয়ে গেল। ভালো।খুব ভালো আছি আমি। কুচোটার চুলগুলো ঘেঁটে দিয়ে আমি বাড়ি ফিরি। চপল পায়ে।

দশমীর সন্ধ্যে -

কপিলকে সকালে বাজারে পাঠিয়ে একগাদা বাজী কিনে আনিয়েছি। যীষ্ণুকে লুকিয়ে। ওর জন্যে সারপ্রাইজ। ওর আজ বাজিতে হাতেখড়ি হবে। মুড়িপটকা আর তারাচচ্চড়ি এনেছে বেশি বেশি।কটা তুবড়িও আছে।

এবারেও চাররকমের মিস্টির অর্ডার আগেই দেওয়া হয়ে গেছে। অমি তদারকি করি সবের। মা গুছিয়ে রাখে ভুজিয়া , চানাচুরের প্যাকেট। কেউ মিষ্টি না খেতে চাইলে দেওয়া হবে। সন্ধ্যে হতেই লোকজন আসতে শুরু করে। দিদা ধপধপে সাদা শাড়ি পরে বসে থাকে সোফাতে। আমি সবাইকে ডেকে বসাই। খবর নিই। খবর দিই।

ডোমপাড়া-বাউরীপাড়ার কুচোগুলো ও আসে। ঝিঝির হাতে। আমি ভাই হাসি। মিষ্টি চাইতেই ভাই প্রশ্ন করে

"মিষ্টি কেন রে"

"জানো না কি , আজ যে বিজোয়া"

"বিজোয়া যদি তো প্রণাম কর , তবেই তো মিষ্টি পাবি"

কুচোগুলো এবারে বিরক্ত।

" অত পোনাম-মোনাম করতে পারবো নাই। দুটো মিষ্টি দেবে তায় এত কথা। দিবে তো দাও নইলে পালাচ্চি"

আমি বসে বসে আর হাসতে পারি না। "ওরে দাঁড়া দাঁড়া , মিষ্টি আনছি।কোন মিষ্টিটা নিবি বল"

ওরা ঝিঝির ভরা মিষ্টি নিয়ে অন্য বাড়ি যায়।

এবার যীষ্ণু কে নিয়ে আমর সবাই দুগ্গামেলায়। ওদিকে লোকজন ঠাকুর বের করছে আর আমরা যীষ্ণুর হাতে দিয়ে যাচ্চি একটার পর একটা তারাচচ্চড়ি। নাম শুনে যীষ্ণু হেসেই কুটিপাটি। সিঁদুরখেলাও চলছে পুরোদমে। গোরার বৌ এসে বলে "তাড়াতাড়ি মাথা ফাটাও ,তোমাকেও একটু সিঁদুর মাখাই"।

মাথা ফাটাও ?

গোরার বৌ চলে যেতে যেতে বুড়ো আঙ্গুল নিজের সিঁথি বরাবর চালিয়ে হাসে।

চারিদিক আলোয় আলো। হ্যালোজেনের আলোয় দেখি আমার অনামিকার এনগেজমেন্ট রিংটা ঝকঝক করছে। আমি আলতো হাতে ছুঁয়ে নিই একবার। বুঝি একটু সিঁদুরের রং এসে লাগে আমার মুখেও। ভীড় দুরে সরে যেতে থাকে। আওয়াজও হালকা হতে থাকে। ল্যাম্পোস্টের টিউবের সাদা আলোয় আলোয় দেখি ভাই বাড়ি যাবার জন্যে ডাকতে এসে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে হয় ভাই ঠিক বাবার মত দেখতে হয়ে যাচ্ছে। সেই সুন্দর মুখ , সেই সুন্দর হাসি , সেই বাঁশির মত নাক। আমরা একসাথে বাড়ি ফিরি।ভাই , কপিল আগে গল্প করতে করতে। মাঝখানে

যীষ্ণু লাফাতে লাফাতে।সবশেষে আমি। সবার সাথে একটু গল্প করে নিচ্ছিলাম। সদর দরজার গেট খুলতে খুলতে আমি প্রথম লাইনটা বলি আর যীষ্ণু সুর ধরে

আসছে বছর ???

আআআঅবার হবে এ এ এ।।

আমার পুজোনামচা

জারিফা জাহান

ভোকাট্টা: নীল পাটভাঙা শাড়ি পরে, মিহি শিউলির সাদা টিপ কপালে, গায়ে কাশের গন্ধ নিয়ে সেই যে বিশ্বকর্মা পুজোর সাথে সাথে শরতের 'পুজো আসছে'র আইভরি আমেজ- সে আমার বর্ষা পরবর্তী চিরকালীন 'উৎসব অনুভূতি'র প্রাক নির্মলি।

এই ঋতুকালীন হুল্লোড়: কালো কালো মেঘের ছড়ি ঘোরানো হঠাৎ থেমে গিয়ে আকাশের নিঃশ্বাস ফেলার দু'দন্ড ফুরসৎ, পুকুরের জলের শাপলা-পদ্ম নিয়ে সবজেটে স্বপ্ন দেখার খুব ধুমধাম, রাস্তাঘাটে-পিচে জমা পুরু কাদার পরত ধুয়ে গিয়ে শ্যাওলাহীন মুখ বের করার খুশি মেহনত, খোলা মাঠে একগুচ্ছ কাশের ধীর লয়ে রোদে লুকোচুরি - এসবেই কোথাও পুজোর নৈবেদ্য, প্রসাদ, নতুন জামা, আরতি, ধুনুচি নাচ, ঢাকের বাদ্যির আগমন সমাচার, অদৃশ্য ফিতে কেটে দেয় যেন প্রকৃতি শারদাগমের।

'পথের পাঁচালী'র রেললাইনের ধারে কাশফুল কিংবা 'জয় বাবা ফেলুনাথ'এ "পরশু তো ষষ্ঠী, আপনার কাজ পরশুর মধ্যে শেষ হবে?" বাঙালির ল্যাজে সুড়সুড়ি-সেন্টুতে ফুক্কুড়ি কাটার বহু আগে থেকেই মা দুর্গা আমাদের ওপর বিশেষ প্রসন্ন, আমাদের ঘরের মেয়ে, তাই ভেজ-ননভেজের পিট্টু 'চু-কিৎ কিৎ' ফেলে এ পুজো 'পুজো'র রীতি ছড়িয়ে উৎসবের ডেফিনিশনকে নার্ভফেল করিয়ে ছেড়েছে এক ছক্কায়। অতএব জাতি হিসেবে এই 'পুজো-পুজো ইয়ে' ই আমাদের ধরাধামে ফুর্তি - হুল্লোড় জুড়তি।

তা এই আমাদের মধ্যেও ফুটাস্কোপ দিয়ে ছেঁকে পাওয়া 'আমরা', যারা বিশুদ্ধবাদি কচকচানিতে ধর্মের পরিসংখ্যান মেপে

'সংখ্যালঘু' আওতায় পড়ি, হ্যাঁ, তাদের কাছেও এটা উৎসব - ভিড়ে ঘামের গন্ধ হজমে - পায়ের ফোস্কা মলমে হাউমাউ প্রগালভতার আমুদে সেলিব্রেশন বচ্ছরকার এই চারটে দিন এবং তা আমি পুজো সংখ্যার বর্ষাকালীন টুকি মারারও বহু আগে থেকে আশায়-অপেক্ষায় আঙুল গুনি। যেহেতু লঘু-গুরুর প্রসঙ্গ হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে এসে থেবড়ে বসেই পড়ল, তখন বলেই ফেলি, অফিস- কাছারিতে একটা দিনও যে ঈদের জন্য বরাদ্দ নেই (ফ্লেক্সি আছে খালি) - এইটা সারারাত পুজোয় ঘুরে রোল-বিরিয়ানি-আইসক্রিম-চাউমিন-ফুচকা একসাথে হজম করার থেকেও সত্যি বেশ কষ্টকর। শুধু এটুকুই 'অভিযোগ' ভেবে যেসব চরমপন্থী হনুর আঁতে হওয়া ঘা'য়ে কয়েক চিমটে নুন পড়ে গেছে বলে রে-রে করতে আসবেন ভেবে আস্তিন গুটাচ্ছেন, তাদের বলি, বাংলাদেশে এই লঘু-গুরুর হিসেবটা এ বঙ্গদেশের মাপে এক্কেরে লুডোর গুটি - ছক্কা আর পুঁটের মাপজোখ: সেখানে পুজোর বদলে তাই ঈদসংখ্যা বেরোয়, তিনদিন ছুটি বরাদ্দ, সাথে টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান এবং 'দ্য কাউন্টডাউন বিগিন্স' জাস্ট লাইক বঙ্গদেশের পুজো। কিন্তু তবুও ঈদ, দুর্গাপুজোর মতো 'সার্বজনীন' হয়ে উঠতে পারেনি ধর্মীয় বেড়াজালে অক্সিজেন লেভেল কমিয়ে।

ঈদের সকালে বাড়ির ছেলেরাই শুধু নামাজ পড়তে যায় (কিছু 'প্রগতিশীল' ঈদগাহে মেয়েরা অবশ্যি হাল আমলে নামাজ পড়ে তবে ওই আর কী, 'পর্দা মেনে')। আব্বু মসজিদে রওনা হওয়ার আগে আম্মি মিষ্টিমুখ করাতে ভোর ভোর উঠেই (নামাজ মোটামুটি ৭-৮ টা নাগাদই শুরু হয়ে যায়) সিমাই-লাচ্ছা বানিয়ে রাখে। এরপর বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয় আসার পালা, সুতরাং একটু বিশ্রাম নিয়েই শুরু হয় বিরিয়ানি-চাপ বানানোর তোড়জোড়। আমরা ছেলেপুলেরা টুকটাক ফাই-ফরমাশ খেটে দিই আর ভাবি নতুন জামা কখন পরব। কিন্তু তারপর আর কতদূরই বা যাব, অগত্যা ফটোসেশন শেষ হলে দু'এক বাড়ি ঘুরে এসে বন্ধুদের সাথে আম্মির বানানো বিরিয়ানির ওপর হামলে পড়া আর ঢেঁকুর

তোলার ফাঁকেই ঈদ কেমন ফুরিয়ে যায়।

পুজোয় ঠাকুর দেখা - না দেখার প্ল্যান আপডেটেড হোক বা না হোক বাড়ির সবাই একদিন-বন্ধুরা একদিন- পাড়ায় আড্ডা একদিন-মিষ্টি নিয়ে আত্মীয়ের বাড়ি একদিন: এই অলিখিত গোলকধাঁধা, ম্যারাপ বাঁধার বহু আগে থেকেই শরতের খুশি খুশি রোদ্দুরপালকে আঁকা হয়ে যায় মরশুমি পীরিত।

কলকাতার ভিড়ভাট্টা থেকে যে বছর পালাতে মন চায়, পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যাই সুন্দরবনের কাছে কোনো এক গ্রামে। মেকমাইট্রিপে টেনশনকে মুড়ি-বাতাসা খাইয়ে জলপট্টি দেওয়ার রিস্ক কাটাতে নয়, শিমলা-মানালি-গোয়ার যে বহুচর্চিত 'ভ্রমণপিপাসু' সাইকেল, যেখানেই যাইবে বাঙালিই পাইবে - ধারণাকে এবেলা স্রেফ বেরসিক দশেরার তুবড়িবাজি থেকে কানে তুলো দিয়ে মনকে লেবুজল খাওয়াতেই বাংলায় থাকা। একটা ছোট্ট গ্রাম: হিন্দু-মুসলিম মিলে গুটিকয়েক বসত, সন্ধ্যে কাটে যেখানে চাঁদের আলোয়, পুজোর চারদিন ছেলেমেয়ে সব দল বেঁধে নতুন জামা পরে গ্রামের ছোট্ট বাঁশের প্যান্ডেলের সামনে জড়ো হচ্ছে, কিশোর কুমার এই হানি সিং এর গুঁতানো টপকে এ কলিকালেও দিব্যি গাইতে পারছেন 'শিং নেই তবু নাম তার সিংহ' - এই হল বাংলায় দুর্গা মায়ের মাহাত্ম্য।

বারাসতের মেয়ে, তাই পুজোপ্রসঙ্গে মা কালীকে না টানলে, অভিশাপে, কানে বিরাশি সিক্কার চড়ের জন্য এবার থেকে টেনিদা প্যালারামের বদলে আমাকে টার্গেট করতেই পারে, অতএব সে বিষয়ে বলি, বেশ ধুপধুনো - থিম - লাইটিং - গাজরমার্কা তুবড়ি - উৎসাহ ভিড়, আয়োজনে কোথাও এতটুকু কমতি না থাকলেও এটা আমার কাছে স্রেফ পুজো: ঠাকুর দেখা - ঘুরে বেড়ানো পুজো। দুর্গাপুজোর মতো এমন দিলদার ফুর্তি আঁচলে নিয়ে 'উৎসব' হয়ে ওঠেনি, উঠতে পারেনি, যেভাবে ঈদ সার্বজনীন উৎসব হয়ে উঠতে পারেনি আপামর বাংলায়।

উৎসব ফুরোলেই ইতিবৃত্তের শুরু। একই রুটিন, একই

একঘেয়েমি। বিসর্জনের আগে এত যে শিউলি, এত যে মুহূর্তের আনন্দমাখা, নবমীর রাত থেকেই সেসব কেমন বিষণ্ণ হতে শুরু করে - জ্যোৎস্নায় অন্ধকার ধুয়ে গেলেও যে মনোগত আঁধার ছোঁয়াচে লেগে থাকে চোখে: ঠিক তেমনি এক নিথর মনখারাপিয়া, বিষাদ- আহ্লাদী গুফতাগু বুকে নিয়ে শুরু হয় আরও এক অপেক্ষার; স্নিগ্ধ, বছরভর, প্রহর গোনা এক আগমনী উৎসবের।

হারামপূজা এবং মঞ্জুভাইয়েরা

মুহাম্মদ সাদেকুজ্জামান শরীফ

ছোটবেলায় হঠাৎ মাথায় প্রশ্ন আসছিল সব প্রতিমার মুখ দক্ষিণমুখী হয় কেন? সমবয়সী যাকে জিজ্ঞাস করেছিলাম সে উত্তর দিয়েছিল এটা নিয়ম, তোদের যেমন নামাজ পড়তে হয় পশ্চিমমুখী হয়ে এটাও তেমন। ওর জ্ঞান বিতরেণ শেষ হলো না, বলল খ্রিস্টানরা প্রার্থনা করে পুবমুখী হয়ে আর বৌদ্ধরা উত্তর। আমি মেনে গেছিলাম। ভাবছিলাম ঠিকই তো আছে, চার ধর্ম চারটা দিক। ছোটবেলাটা ভাল ছিল, আমার পশ্চিম দিক পেয়ে আমি খুশি ছিলাম আর অন্যরাও যে ঠিকঠিক একটা দিক পেয়ে গেছে তা ভেবেও স্বস্তি পেয়েছিলাম। বড় হলাম আর শিখলাম সব দিকই আমার, অন্যের জন্য কোন ছাড় নেই। আর সব ভুয়া আমরাই শুধু সঠিক। জানলাম দুর্গা পূজার সময় আমি যে আনন্দে মেতে উঠতাম তা না জায়েজ, বিলকুল হারাম। আমরা সাচ্চা মুসলমান হয়ে উঠলাম দিনে দিনে।

তবে ছোটবেলাটা আমাদের আসলেই রঙ্গিন ছিল। সপ্তাহখানেক স্কুল ছুটি তো আনন্দ বড়িয়ে দিতই। সঙ্গে ছিল মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে বেরানোর মজা। সারা শহর যেন মেলা বসে যেত পূজার সময়। ডুগডুগি টাইপ একটা গাড়ি পাওয়া যেত মেলায়। ডগ ডগ করে শব্দ হত গাড়ি টানলে।দুর্গা পূজার সাথে এই শব্দটাও কেমন যেন মিশে গেছে মনের মাঝে। দুর্গা পূজা গেছে আর আমরা এই গাড়ি কিনি নাই এমন মনে হয় হয় নাই কোন বার। আর চিনির হাতি ঘোড়া পাওয়া যেত পূজার মেলায়। আমরা বলতাম এগুলাকে সাজ। এই সাজ কেনা হত অনেক গুলো, তারপর সকাল বিকাল ফিনিশ করা শুধু। ঝলমলে আলোক সজ্জা আমাদের ছোট মাথা

ঘুরিয়ে দিত। কয়টা দিন আমাদের কেটে যেত স্বপ্নের মত। না, সেই সময় কেউ আমাদের বলে নাই এই শিরকি কাজ করা যাবে না। কেউ নিষেধ করেনি আমাদের পূজার আনন্দে মেতে উঠতে। আমার যে বোন এখন তার দুই বাচ্চা নিয়ে প্রতিটা মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে সে একদিন আমাদের নিয়েও ঘুরত। তখন আমাদের কে কেউ এই অপরাধে অপরাধী করেনি কিন্তু এখন করে। সমাজে আর যাই হোক, ধর্মীয় শিক্ষকের তো আর অভাব নেই!! অভাব তো শুধু মানুষের।

কোন পূজা মণ্ডপ কেমন, কাদের জৌলুস বেশি, কারা শুধু টাকাই খরচ করেছে শুধু কিন্তু সাজ সজ্জা ভাল হয়নি, কাদেরটা দারুণ হয়েছে, এই ধরনের মূল্যায়ন আমরা এই সেদিনও করতাম।পূজা শেষে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ থেকে ঘোষণাও করা হত কাদের মন্ডপ সব চেয়ে সুন্দর হয়েছে। আমরা মিলিয়ে নিতাম আমাদের হিসেবের সাথে। মিললে মিলল না মিললে বোঝার চেষ্টা করতাম কেন ওদের দিল, পার্থক্য কী ছিল। এই ঘোষণা আজও দেয়া হয়। বাংলাদেশের পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন পূজার শুরুতেও একটা ঘোষণা দেয়া হয়। আর এটা দেয় প্রশাসন থেকে। বলে দেওয়া হয় অমুক মণ্ডপ ঝুঁকি পূর্ণ, মণ্ডপের দায়িত্বে যারা আছে তাদেরকে ক'রে দেওয়া হয় সতর্ক।যাদের মণ্ডপ এই তালিকায় পড়ে যায় তাদের পূজা আর জমে উঠে না। সর্বক্ষণ উৎকণ্ঠা, একটু চ্যাঁচামেচি হলেও কলিজা কেঁপে উঠে তাদের আর প্রতিবার পুলিশি তল্লাশিতে মুখ থুবড়ে পরে আমার তৈরি বিশ্বাস নামক সেতু। কড়া পুলিশি তৎপরতায় কোথায় জানি হারিয়ে যায় চির চেনা সৌন্দর্য, আবহমান বাংলা আর বাংলার ঐতিহ্য।

আমাদের ছোট শহর। তাই প্রায় প্রতিটা পূজা কমিটিতে আমাদের বন্ধু বান্ধব, চেনা জানা মুখ। বন্ধুদের দেখি কী দারুণ ব্যস্ত একেক জন। সবাই কিছু না কিছু দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ঘুরছে। আগে কাছের বন্ধুদের সাথে মিশে যেতাম আমরা। খুব কাছের বন্ধুদের যে মন্ডব সেটা হয়ে যেত আমার মণ্ডপ। ব্যস্ততার জন্য

এখন আগের মত মণ্ডপে যাওয়া হয় না। গত বছর যখন সময় পেয়ে গেলাম আমার বন্ধু আমাকে দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে গেলো আর তারপরই বলল ওর না বলা কথা, ও বলল তুই আইছস, অথচ দেখ পূজা শেষ হয়ে যাইতাছে একটা পুলাপান আইলো না!! কারা আসে নাই আমি জানি, ওকেও নাম বলে বলতে হলো না। বুঝলাম দেশ এগিয়ে গেছে বহুদূর, খাদে পড়তে আর দেরি নাই।

দুর্গা পূজা দোরগোড়ায়। একটা উৎসব যে আসছে তা বোঝা যায় দুর্গা পূজার আগে আগে।উৎসবের যে আলাদা রঙ আছে তা দেখা যায় দুর্গা পূজায়। দারুণ রঙে সেজে উঠছে চারপাশ। কত কত বাতি লাগানো হচ্ছে। হাত লাগচ্ছে ছেলে বুড়ো। কেউ নিশ্চিন্তে বসে জ্ঞান ঝাড়ছে। কেউ সেই জ্ঞান গিলছে। চোখে চোখে ঠুকা ঠুকি হচ্ছে।নানান পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে পূজা ঘিরে। কাজের লোকরা কাজ করে যাচ্ছে ধর্ম কে হিসেবে না নিয়েই।যেমন ধরুন মঞ্জু ভাই। ডেকারেশনের কাজ করেন তিনি। এই মঞ্জু ভাইয়ের কাজ ছাড়া পূজা মণ্ডপ যেন তৈরিই হয় না। সবাই চায় মঞ্জু ভাই ওদের মণ্ডপে কাজ করুক। আর মঞ্জু ভাইয়ও হয়েছে একটা মানুষ, আটটা দশটা মণ্ডপের কাজ নিয়ে পূজার কয়টা দিন পাগলের মত ঘুরে। আমি একবার জিজ্ঞাস করেছিলাম, খুব কামাচ্ছেন? উনি হাসি দিয়ে বললেন, আরে নাহ, টাকার জন্য না, ধর্মীয় কাজে টাকার হিসাব করলে চলে!! পরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম, আসলেই তাই। যে মঞ্জু ভাই কে বিয়ের প্রোগ্রামের জন্য দেন দরবার করে পেতে হয় আমাদের সবার, সেই মঞ্জু ভাই অনায়াসে সকলের সাথেই আছে, টাকা পয়সাও যে যত যখন পারছে দিচ্ছে। মঞ্জু ভাইদের জন্যই এখনো দেশ নিয়ে আশা করতে পারি। খাদ থেকে হয়ত বেঁচেও যেতে পারি আমরা।

মৎস্য মারিব
খাইব সুখে

গোমাতা যদিবা হয়
গোপুত্র কখনো নয়

ছবি: শঙ্খ কর ভৌমিক

সূচীপত্র